সব হতে আপন

রাণী চন্দ

সব হতে আপন

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও
রানী চন্দ -রচিত

ঘরোয়া

জোড়াসাঁকোর ধারে

রানী চন্দ -রচিত

আলাপচারি · রবীন্দ্রনাথ

গুরুদেব

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ

পূর্ণকুম্ভ

হিমাদ্রি

আমার মা'র বাপের বাড়ি

উদীচী-গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানের চিত্র শ্রীশম্ভু সাহা -কর্তৃক গৃহীত।
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে গৃহীত চিত্র লেখিকার সংগ্রহ-ভুক্ত।

শান্তিনিকেতনে উদীচী-গৃহ-প্রবেশ অনুষ্ঠান

সব হতে আপন

রানী চন্দ

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৩৯১

প্রকাশক শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

মুদ্রক শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ। ১২ নরেন সেন স্কোয়ার। কলিকাতা ৯

আশ্রমের স্মৃতি-সৌরভে আমার দু'হাত ভরে
আমার স্বামী অনিলকুমার চন্দের উদ্দেশে
অঞ্জলি দিলাম।

রানী

'জিৎভূম'
শান্তিনিকেতন

সব হতে আপন

এবারে গুরুদেব আর ছেড়ে দিলেন না, আমাদের দু বোনকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন শান্তিনিকেতনে। বললেন, নাঃ, অনেকখানি সময় তোদের নষ্ট হয়েছে, আর নয়।

বাবা যখন মারা যান আমার বয়স তখন চার বছর। মার কাছে পরে শুনেছি গল্প, বড়দাকে বাবা বালক বয়সে দিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য-আশ্রমে পড়তে। আশ্রম সম্বন্ধে তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। এই উপলক্ষে গুরুদেবের সঙ্গে হয় তাঁর সৌহার্দ্য। বড়ো হয়ে দেখেছি গুরুদেব অনেক চিঠি লিখেছেন বাবাকে। প্রয়োজনীয় চিঠি, আশ্রমের খুঁটিনাটি চাহিদার চিঠি। এক চিঠিতে ছিল— ...পঁচাত্তরটি টাকা বিশেষ দরকার ইত্যাদি।

বাবা চলে গেলে গুরুদেব আমাদের জন্য চিন্তিত হলেন। বড়দা আমাদের পাঁচ ভাই-বোনের চেয়ে অনেক বড়ো। সেই সময়ে তিনি সরকারি বৃত্তি নিয়ে বিলেতে যাবেন ঠিক হয়ে আছে। আমরা তখন কলকাতায়, গুরুদেব বললেন, ঠিক আছে, আমি ভার নিলাম। মাকে বললেন, শান্তিনিকেতনে এসো ছেলে-মেয়েদের নিয়ে, কোনো ভয়-ভাবনা নেই।

গোঁড়া হিন্দু পরিবারের মা, শোকাবিষ্ট মা, কী বুঝলেন কী ভাবলেন— কেঁদে আকুল হলেন।

গুরুদেব বললেন, থাক্ তবে। বড়ো হয়ে এরা যখন বুঝে আসতে চাইবে তখনই আসবে।

গুরুদেবেরই ব্যবস্থায় মা আমাদের নিয়ে ঢাকা চলে এলেন। কিছুকাল পরে মেজদা সেজদা শান্তিনিকেতনে পড়তে এলেন। আমরা দু বোন আর ছোটো ভাই মার কাছে ঢাকাতেই রয়ে গেলাম। তার পর বেশ কয়েক বছর পরে কলকাতায় এলাম। বড়দাও অনেক বছর পরে দেশে ফিরে এলেন।

কলকাতায় গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল— তখন এর নাম আর্ট স্কুলই ছিল— এখন নাম হয়েছে আর্ট কলেজ ; বড়দা এই আর্ট স্কুলে প্রিন্সিপ্যালের পদ পেলেন। এর আগে ছিলেন এই আসনে পার্সি ব্রাউন, তার আগে ছিলেন হ্যাভেল সাহেব। চৌরঙ্গির উপরে জাদুঘরের পাশে বিরাট এক বাড়ি, পুরোনো আমলের বাড়ি সাহেবদের তৈরি ; বিরাট বিরাট সব করিডর, বারান্দা বাগান— আকারে আকৃতিতে

তাঁদের উপযুক্ত করেই করা। এই তেতলা আর্ট স্কুলের বাড়িতেই দোতলার আধখানা জুড়ে প্রিন্সিপ্যালের কোয়ার্টার। বড়দাও এই কোয়ার্টারে এসেই উঠলেন আমাদের নিয়ে। এই বাড়ির বাগানের পুব দিকে ছিল এক পুকুর— চৌরঙ্গির উপরে, যা নাকি ছিল অতি দুর্লভ। দোতলার পুব দিকের বারান্দার গা ঘেঁষে উঠে আছে দুটি সুউচ্চ স্বর্ণচাঁপা ফুলের গাছ, তাদের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ভরা পুষ্করিণীর জল। হাঁস ভেসে চলে জলে দাগ কেটে কেটে। রোদের নানা রঙ জলে খেলা করে। ফুল গাছের ছায়া পড়ে, পারের ঘাসগুলি মাথা ডুবিয়ে থাকে জলে। সাহেবদের পুকুর শোভাবর্ধনের পুকুর, পুকুর নোংরা করে না কেউ ভয়ে।

শুনে গুরুদেব এলেন থাকতে এখানে। জল দেখতে তিনি ভালোবাসেন— বড়ো খুশি হলেন দেখে। সকালে বিকেলে অনেকক্ষণ বারান্দায় থাকেন, লেখেন। বারান্দা-লাগাও প্রকাণ্ড যে ঘর তাতেও বসে লেখেন, ছবি আঁকেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দরজা— সেই দরজা খোলা থাকে, ঘর বারান্দা আলাদা মনে হয় না।

গুরুদেব লিখতে লিখতে মুখ তুলে তাকান— চোখ-বরাবর নীচের পুকুরের জল ঝিলমিল করে। ঘরে বসেও জল দেখার ব্যাঘাত ঘটে না কোনো। বারান্দা থেকে আসে স্বর্ণচাঁপার সৌরভ— হাত বাড়িয়ে ফুলও তুলি গাছ হতে, গুরুদেবের কাছাকাছি টেবিলের পাশে রেখে দিই। গুরুদেব খুশি হন। হাসেন। সেই হাসিটুকু ফিরে ফিরে পাবার জন্য আর কী করতে পারি ভেবে মরতাম। সারাদিন গুরুদেবের কাছে কাছে থাকতাম— তাঁর কাছছাড়া হতে পারতাম না। জীবনে যেন মস্ত একটা কিসের অভাব ছিল এতকাল, সেটা যেন গুরুদেবকে পেয়ে ভরে উঠেছে। গুরুদেব লিখছেন, তাঁর চেয়ার ছুঁয়ে নীরবে বসে থাকতাম পায়ের কাছে। ছবি যখন আঁকতেন তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতাম— কত সময়ে টেবিলে উপুড় হয়ে পড়ে তাঁর ছবি আঁকা দেখতাম। সারাদিন কত লোক আসতেন তাঁর কাছে— আমি কাছে কাছে থাকি।

সেবারে গুরুদেব ছিলেন না বেশি দিন। আমাদের দু বোনকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন। আমরাও মনের আনন্দে এলাম তাঁর সঙ্গে। মনটা এই রকমই লাগছিল। মনে হল যেন বাঁধন কাটল, শিকল ছিঁড়ল— যেন একটা মুক্তির ঝিলিক বাতাসে আমাকে হালকা করে উড়িয়ে দিল। বড়ো সুন্দর লাগল এই পৃথিবীর আলো, বড়ো মধুর লাগল— পথ গাছ মাটি মানুষ।

স্টেশন থেকে সোজা উত্তরায়ণে এলেন গুরুদেব। সঙ্গে আমরা। তখন বেলা

প্রায় তিনটে। উদয়ন তখনো হয় নি পুরোটা। রথীদা বোঠান ছিলেন না উদয়নে। বোধ হয় বিদেশে ছিলেন; কিংবা আর কোথাও। গুরুদেব আমাদের নিয়ে উদয়নের পশ্চিমের বারান্দা পেরিয়ে একটা ঘরের সামনে এসে খোলা দরজা দেখিয়ে বললেন, যা, আগে হাতমুখ ধুয়ে নে। এখানে জল সাবান সব আছে। বলে, তিনি চলে গেলেন। দেখি ঘরের আকারে মস্ত একটা বাথরুম এটা। একটু লম্বা ধরনের ঘর। ঘরের ঐ মাথায় টবে, গামলায় রাখা জল, সাবান তোয়ালে ছোটো-বড়ো জলচৌকি, পিতলের ঝকঝকে মগ, সব-কিছু সাজানো। এ মাথায় দেয়ালে মানুষ সমান লম্বা আয়না, পাশে চওড়া একটা বেঞ্চির উপরে তোষক সুজনী পাতা। বসা যায়, শোয়াও যায়। আমরা দু বোন বড়ো আয়নায় নিজ নিজ চেহারা দেখছি আর হেসে উঠছি। তখনকার দিনে ট্রেনে আসতে মুখে গায়ে ট্রেনের ধোঁয়ার কালি লাগত বড়ো বেশি। তা ছাড়া জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মুখে হাওয়া লাগানো— এ ছিল ট্রেনে চড়ার এক মজা আমাদের। চোখে কয়লার গুঁড়োও পড়ত বারে বারে। আঁচলের কোনা পাকিয়ে একে অন্যের চোখের কয়লার গুঁড়ো বের করে দিই— আবার মুখ বাড়াই বাইরে। তখন ট্রেনের জানালায় শিক থাকত না। আয়নায় দেখি কালিতে মুখ ছেয়ে গেছে— সামনের চুলগুলি দড়ি পাকিয়ে উঠেছে। দেখি আর দুজনে হেসে উঠি, আর লম্বা বেঞ্চিটায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়ি। আমি শুয়ে পড়লে দিদি আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে নিজে শোয়, দিদি শুলে আমি তাকে ঠেলে ফেলে দিই, আর হাসি, আর হাসি। হাসি যেন থামে না আমাদের কিছুতে। শুনি, গুরুদেব বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছেন— বললেন, কী হল তোদের? এত হাসছিস কেন? আয় তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে।

হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে এলাম। গুরুদেবের হাতমুখ ধোয়া অনেক ক্ষণ হয়ে গেছে – বসে বসে অপেক্ষা করছিলেন— আমাদের হাসি শুনে ব্যাপার কী দেখতে এসেছিলেন।

উদয়নে তখন আর কেউ ছিলেন না। কাজের লোক ছিল আর প্রতাপ তলাপাত্র ছিলেন — বাড়িঘর সব দেখাশোনা করতেন। গুরুদেব আমাদের নিয়ে খাবার ঘরে এলেন। গোল কি চৌকো কাঠের টেবিল ছিল মনে নেই। বোধ হয় চৌকোই ছিল, একটু লম্বাটে। গুরুদেব বসলেন এক মাথায়, বাঁ দিকে আমরা দু বোন। কলকাতা হতে সন্দেশ রুটি-মাখন আনা হয়েছিল। চা মিষ্টি নিমকি

শিঙাড়া— সব ঘরে-করা। প্রচুর খেলাম। গুরুদেব প্লেটে তুলে তুলে দিতে লাগলেন।

নিজে তিনি খেলেন একটি সন্দেশ আর রুটি-মাখন। টেবিলের মাঝখানে রাখা ছিল লালরঙের গোলাকার একটি বস্তু— মাঝে মাঝে গুরুদেব ছুরি দিয়ে তা হতে পাতলা স্লাইসের মতো কেটে নিয়ে রুটির উপরে দিয়ে দিয়ে খাচ্ছিলেন। মনে মনে ভাবছিলাম গুরুদেব সব-কিছু আমাদের নিজে তুলে তুলে খাওয়াচ্ছেন কিন্তু ঐ লাল জিনিসটা দিচ্ছেন না কেন খেতে? গুরুদেব কি করে বুঝলেন মনের সে কথাটা, বললেন, ওটা হল এক রকমের চীজ, পারবি না খেতে, গন্ধ লাগবে। প্রথমবার তো? পরে অবশ্যি খেতে খেতে অভ্যেস হয়ে যাবে।

চা খাবার পর গুরুদেব আমাদের নিয়ে বাগানে বেড়ালেন খানিক। বাগান বলতে তেমন কিছু ছিল না তখন। সব গাছেরই শিশু অবস্থা। কাঁকর-মাটিতে যে গাছ হয়— যা সহজে বাড়ে, সেই-সব গাছই লাগানো হয়েছে কিছু-কিছু এখানে ওখানে।

গুরুদেব আমাদের নিয়ে দোতলায় সামনের ছোটো ঘরখানায় এলেন। তিনি চেয়ারে বসলেন, আমরা দু বোন তাঁর দু দিকে পায়ের কাছে বসলাম। যেন আমাদের সঙ্গে আলোচনা করছেন গুরুদেব এ ভাবে বললেন, দেখ্, তোদের কথা আমি ভাবছি— ভেবে এক রকম ঠিকও করেছি। বুড়ি, তোর গানের গলা আছে —তুই গানের দিকে যা। আমার হাজার-দুয়েক গান আছে— এই গান শিখে নিতে পারলে আর ভাবনা থাকবে না। গানের ফাঁকে ফাঁকে সূচিশিল্পটাও আয়ত্তে এনে ফেল। আর রানী, তুই ছবি আঁকিস— ছবিতে উঠে পড়ে লেগে যা।

ঘাড় কাত করে গুরুদেবের মুখের দিকেই তাকিয়েছিলাম, বলে উঠলাম, গুরুদেব, আমার যে লেখাপড়া করবার ইচ্ছা।

গুরুদেব আমার মাথায় হাতখানি রেখে অতি স্নেহে বললেন, দেখ, যার যে-দিকটা আছে— তাকে সেটাই ফুটিয়ে তুলতে হবে। বৃথা আর সময় নষ্ট করবি কেন? লেগে যা ছবিতে।

ভবিষ্যৎ ঠিক হয়ে গেল দু বোনের। গুরুদেব শ্রীভবনে খবর পাঠিয়েছিলেন— হেমবালাদি এলেন, গুরুদেব তাঁর হাতে আমাদের সঁপে দিলেন। আমরা গুরুদেবকে প্রণাম করলাম। গুরুদেব বললেন, রোজ একবার করে এসে খবর বলে যাবি। চোখে জল এসে গিয়েছিল গুরুদেবকে ছাড়তে, এ-কথা শুনে মুখে হাসি এসে গেল।

রাত কাটল। এইটুকু সময়ের মধ্যেই জানা হয়ে গিয়েছিল শ্রীভবনের নিয়ম-কানুন। অন্ধকার থাকতে উঠে লণ্ঠনের আলোয় বিছানাপত্র ঝেড়ে, ঘর ঝাঁট দিয়ে একেবারে স্নান সেরে এলাম। চৌবাচ্চা ভরে জল দিয়ে রাখত সাঁওতাল মাঝি— সেই জলেই সারাদিন চলত— এমন-কি, এই সকালবেলার স্নানটাও। হিসেব করে জল খরচ করা হত— জলের বড়ো টানাটানি এখানে।

উপাসনার ঘণ্টা পড়ল, নিজ আসনখানা নিয়ে ঘরের এক কোনায় বসে পড়লাম। তখনো কিন্তু গুরুদেবের কথাই মনে পড়তে লাগল। আবার ঘণ্টা পড়ল— যে যার আসনখানা তুলে রেখে বাইরে বেরিয়ে এলাম, শ্রীভবনের সামনে একত্র ঘিরে দাঁড়ালাম— এইবার সমবেত প্রার্থনা : ওঁ পিতা নোঽসি··· আশ্রমপিতাকে প্রণাম করলাম, সূর্যোদয় হল।

ঘণ্টা পড়ল। শ্রীভবনের পাশেই রান্নাঘর, যে যার বাটি-গেলাস নিয়ে রান্নাঘরে এলাম— এদিক থেকে মেয়েরা, ওদিক থেকে ছোটো ছেলেরা এল, সেদিক থেকে বড়ো ছেলেরা এল। জলখাবার খেয়ে বাটি গেলাস ধুয়ে নিজ নিজ ঘরে রেখে এবারে ক্লাসের উদ্দেশে তৈরি হয়ে লাইব্রেরির সামনে সকলের সঙ্গে জমায়েত হলাম। গাইয়েরা লাইব্রেরির বারান্দায় উঠল— শিক্ষক-ছাত্র মিলে মিশে। বাকিরা বারান্দার সামনে ঘিরে দাঁড়াল। সকলে স্থির। বৈতালিক হল— একটি মাত্র গান। দিনের কাজ শুরু হবার আগে— গানের ভিতর দিয়ে একটি প্রার্থনা রোজ ওঠে সবার প্রাণে একসুরে। সেই সুর নিয়ে দিনের কাজ শুরু হয় সকলের। এক-একদিন এক-একটি গান হয়— মনে হয় এই গানটিই যেন আজকের জন্য ঠিক গানটি হল। এতকাল হয়ে গেছে— এখনো ঠিক তেমনই মনে হয়।

বৈতালিক শেষ হল। কোনো হৈ-হল্লা নয় — তখনো যেন লেগে থাকে গানের রেশ দেহে মনে— ধীর পায়ে যে যার ক্লাসের দিকে অগ্রসর হই।

ঝুরঝুর করে শাল ফুল ঝরে পড়ছে তলায়। নিম মহানিম ফুলের ঝরনা বইছে হাওয়ায়। পাকা শিরিষ ফলগুলি ফটফট করে ছিটকে পড়ছে মাটিতে। রাঙা পথের লাল ধুলোয় দু পা রাঙিয়ে চলে আসি কলাভবনে।

নন্দদা আমার আপনজন— খুবই আপনজন। সেই শৈশবে আমার বাবা মারা যাবার পরে নন্দদা আসতেন, আমাকে কোলে তুলে নিতেন— আদর করতেন— সব মনে আছে আমার। বড়ো হয়ে আবার যখন কলকাতায় এলাম— নন্দদা

আসতেন, আমি ছবি আঁকতাম— সংশোধন করে দিতেন, রঙ দেওয়া শেখাতেন। খাতার পাতায় কত ছবি এঁকে দিয়ে যেতেন। নন্দদাকে যে আমি জানি।

নন্দদা কলাভবনে একটা ঘরে বসে ছবি আঁকছিলেন— এইখানেই তাঁর আসন —রোজ এই জানালার ধারে বসেই ছবি আঁকেন। কলাভবনে ছোট্ট ছোট্ট বাড়ি খানকয়েক। মাঝের বাড়িটা একটু বড়ো— পাঁচখানা ঘর। এই বাড়ির ঠিক মাঝখানের ঘরখানা নন্দদার আঁকার ঘর। দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় খোলা জানালার ধারে নন্দদা বসে ছবি আঁকছেন।

তালপাতার একটা 'তালাই' পাতা মেঝেতে জোড়াসন করে বসেছেন নন্দদা, সামনে ছোটো একটা ডেস্ক, সেই ডেস্কে ড্রইং-বোর্ডে ছবির কাগজ মাউণ্ট করা। আমি প্রণাম করে পাশে বসলাম। টেম্পারা ছবি— বাটিতে বাটিতে গোলা রঙ— রঙ শুকিয়ে আসছে— আমি আঙুলের ডগায় জল নিয়ে রঙ গুলে দিতে লাগলাম— নন্দদা ছবি আঁকতে লাগলেন। স্নান করেছি সকালবেলায়, ভিজে চুল পিঠে খোলা। নন্দদা মুখ তুলে তাকালেন, বললেন, 'রানু'— এই নামেই ডাকতেন তিনি আমাকে, বললেন, এখানকার জল-হাওয়া অন্য রকম। যাবার সময়ে দুটি জিনিস তোমাকে গুরুদক্ষিণা দিয়ে যেতে হবে।

অর্থাৎ শান্তিনিকেতনের প্রখর রোদে রঙটি যাবে আর এখানকার জলে চুল উঠে যাওয়ারও সম্ভাবনা।

উত্তরে মুখে কিছু বলতে পারলাম না। সারা মন শুধু বলে উঠল— তাতেই রাজি।

এই নিবেদনের বীজমন্ত্র বুকে নিয়ে আশ্রমজীবন শুরু হল আমার।

নন্দদা আমাকে নিয়ে উঠলেন। কলাভবন তল্লাটে প্রথমেই 'নন্দন' বাড়ি— বারান্দার এক দিকে একটা ঢালের মতো গোল ঘণ্টা ঝোলানো। ঢাকা বারান্দার দুদিকে বসবার জায়গা— দেয়াল ফাঁকা। সেই পশ্চিমদিকের ফাঁকা চৌকো জায়গাটায় ঝুলছে ঘণ্টাটা, কোন্ ধাতুর কী জানি, কালো রঙ তার। ঘণ্টাটার জন্যই যেন এই ফাঁকা জায়গাটুকু। মা বলতেন যেখানে যা মানায়। এই ঘণ্টাটি দেখেও মনে হল— এখানে এইটিই মানায়।

নন্দদা হাত মুঠি করে ঘণ্টার মাঝখানটায় একটা কিল মারলেন— ঘণ্টা গ-ম্ করে উঠল— সেই ধীর গম্ভীর— সেই 'গ-ম্' শব্দ ক্ষীণ হতে হতে থামল যখন— অনেকখানি সময় লাগল। নন্দদা আবার একটা কিল মারলেন। এ ঘণ্টার

ধ্বনি যেন কোন্ অনন্তে গিয়ে মেশে। এ যেন মন্দিরের ঘণ্টা।

নন্দনে ঢুকে সোজা একটা করিডর, দু পাশে ঘর। কয়েকখানা বই নিয়ে লাইব্রেরি, দেশ-বিদেশ হতে গুরুদেবের কিছু সংগ্রহ নিয়ে মিউজিয়াম, কিছু ছবি, কাঠের বাক্সে অভিনয়ের সাজ-সরঞ্জাম কিছু। শেষ ঘরখানি হ্যাভেল সাহেবের নামে 'হ্যাভেল হল্'। মনে হল মস্ত 'হল্' এটি। নন্দনের ঘরগুলিতে জানালার ধারে ধারে কয়েকটি ছেলের 'সীট'— বসে ছবি আঁকে। নন্দনের পিছন দিকে নন্দদা যে বাড়িতে বসে ছবি আঁকেন সেই বাড়িটার দু দিকের চারটে ঘরও ছাত্রদের বসে ছবি আঁকার জন্য। এর পরে এ বাড়ির ডাইনে-বাঁয়ে প্রায় এক সারিতে তিনখানি অপেক্ষাকৃত ছোটো বাড়ি— তিনখানা করে ঘর। একটি ঘরে থাকেন বিনোদদা, মাসোজি; অন্য বাড়ি-দুটিতে ছাত্রীরা ছবি আঁকে। এক-একখানা ঘরে দু জন মেয়ে বসে। এরই একখানা জানালার ধারে আমার 'সীট' ঠিক হল, নন্দদাই বেছে দিলেন। সে ঘরে তখন একাই আমি।

প্রায় মেঝে হতে ওঠা জানালা— জানালার ধারে ডেস্কের ভিতর ছবি আঁকার সরঞ্জাম— রঙ তুলি কাগজ পেন্সিল রাখলাম। 'তালাই'য়ের উপরে বসলাম। ডান দিকে একটা কাঠের খুরোর উপরে মাটির গামলা ভরা জল। বোর্ডের উপরে ছবির কাগজ ড্রইং পিন দিয়ে আটকে ডেস্কের উপর রেখে গামলার জলে তুলিটা ভিজিয়ে কাগজের উপরে ঝুঁকে পড়লাম।

পটুয়া পট দেখাচ্ছে— একখানা ছবি শুরু করেছিলাম। নন্দদা বলে গেলেন এখানাই আগে শেষ কর্। ইন্দুদি মাঝের ঘরে বসে ছবি আঁকছিলেন, এসে বললেন, এবারে চল্, ওয়ার্নিং পড়েছে, খাবার ঘণ্টা পড়বে এখুনি। অণুদি, ইন্দুদিও শ্রীভবনেই থাকেন। স্নেহময়ী রূপ ইন্দুদির— সেই রূপ এখনো আছে। এই তো সেদিন এলেন, বললেন, জানিস এখন আমার বয়স কত হল? তিয়াত্তর বছর। দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম ইন্দুদিকে। একবারও মনে হল না যে, এ আমার সেই উনিশ-কুড়ি বছরের ইন্দুদি নয়।

শ্রীভবনে এসে ঘর হতে কাঁসার থালা বাটি গেলাস হাতে রান্নাবাড়ি এলাম। উঁচু নিচু লম্বা দুটো বেঞ্চি। নিচু বেঞ্চিটায় বসে উঁচুটায় থালা রেখে খেতে হয়। নিরামিষ রান্না— খিদে মিটিয়ে খেলাম। মেয়েরা মেয়েদের দিকে, ছেলেরা ছেলেদের দিকে পরিবেশন করল। বলল— তোমাদেরও পালা আসবে পরিবেশন করবার। দেখে রাখো ভালো করে কিভাবে কী করতে হয়।

খাবার পরে থালা বাটি গেলাস ধুয়ে আপন আপন খাটের নীচে রেখে দিলাম। আবার কলাভবনে এলাম— ছবি আঁকলাম। বেলা পড়ে আসছে। শ্রীভবনে ফিরে এসে জলখাবার খেয়ে হাতমুখ ধুয়ে তৈরি হলাম। সান্ধ্য-উপাসনার ঘণ্টা পড়ল। এ বেলা আর ঘরের কোনা নয়— আসন হাতে বেরিয়ে এলাম।

এখন অন্যমনস্কভাবে চলতে গিয়ে কেবলিই ধাক্কা খাচ্ছি— তারের বেড়ায়— লোহার ঘেরাও-এতে। তখন এ-সব কিছু ছিল না। আসনখানা হাতে নিয়ে সোজা সামনের মাঠটায় জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লাম। প্রকাণ্ড মাঠ— কয়টিই-বা মেয়ে— মনে হল আমি একাই বসেছি এই বিরাট আকাশের নীচে— এই তৃণাসনের উপরে। কেউ নেই— আমার ধারে-কাছে কেউ নেই— আমার জানা-অজানা কেউ নেই। কোথাও নেই।

সমবেত প্রার্থনার পর ঘরে এলাম। এ ঘরে ও ঘরে— কেউ সেতার বাজাচ্ছে কেউ এস্রাজ। কেউ গান করছে, কেউ কেউ করছে গল্প। সবই মৃদু স্বরে-সুরে। রাত্রের খাবার পর নুটুদি এসে দাঁড়ালেন শ্রীভবনের গেটের সামনে। মেয়েরা এল, ছেলেরা এল। নুটুদির সঙ্গে সবাই গান ধরল— 'আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন'। বৈতালিকের দল শ্রীভবনের সামনের লম্বা পথটি ঘুরে গুরুপল্লী হয়ে মাধবীবিতানের গেটের ভিতর দিয়ে পুরাতন গেস্ট-হাউস ডাইনে রেখে উত্তরায়ণ পরিক্রমা করে ছাতিমতলা দিয়ে এসে শ্রীভবনের সামনে থামল। বারে বারে ফিরে ফিরে এই একটি গানই গাইতে গাইতে গানটি সবার কণ্ঠে লেগে রইল। মেয়েরা শ্রীভবনের ভিতরে ঢুকল— নুটুদি বাড়ি ফিরে গেলেন —ছেলেরাও নিজ নিজ আবাসে চলে গেল।

রাত্রে শোবার ঘণ্টা পড়ল, বাতি নিবল। বিছানায় শুয়ে এই প্রথম মনে হল যে বলি কাউকে— বলি, আজ কিন্তু আমি দিন বৃথায় কাটাই নি।

২

কোনো বাধা বন্ধন নেই, ঘণ্টা-ধ্বনির হিসাব নেই— কলাভবনে ছাত্র-ছাত্রীরা যে যার জায়গায় বসে ছবি আঁকি। নন্দদা ঘুরে-ফিরেই আসেন, আমাদের বসার মাদুরের পাশেই বসেন, কী ছবি আঁকা হচ্ছে দেখেন, দরকারমত দেখিয়ে দেন। নন্দদা যখন কারও ছবিতে রঙ-তুলি দিয়ে এঁকে দেখাতে থাকেন তখন কাছাকাছি

আমরা সবাই সেখানে জড়ো হয়ে নন্দদাকে ঘিরে ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকি। চোখের সামনে যেন জাদু খেলে যায়, কি ছবি কি থেকে কী হয়ে ওঠে। এই রকম করে এঁকে দেখিয়েই নন্দদা আমাদের ছবি আঁকা শেখান, শুধু আঁকা নয়— ছবির ভিতরের রসটুকু ধরিয়ে দেন। ছবি এঁকে অপেক্ষা করতাম কখন নন্দদা একটু ছুঁয়ে দেবেন। নন্দদা ছুঁয়ে না দিলে ছবিখানা শেষ হত না যেন। এই অভ্যেসটা আমার বহুকাল অবধি ছিল। বিয়ে হয়ে গেল, অভিজিৎ জন্মাল, সে অনেকটা বড়ো হয়ে উঠল— তখন কোনার্কের একটা ঘর স্টুডিয়ো আমার, সেখানে বসেই ছবি আঁকি। মনে পড়ে একবার রাধার বিরহের ছবি আঁকছিলাম— ছয় ঋতুতে ছয়খানা। একখানা ছবি ছিল— রাধা শুকনো পাতা ঝরে পড়ার শব্দ শুনে ত্বরিতে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে— ঐ বুঝি সে এল, এ বুঝি তাঁরই পায়ের শব্দ। রাত্রের আকাশ, সামনে ছিল একটা গাছ; কিছুতেই আমি ছবির সেই গাছটিকে দূরে সরিয়ে দিতে পারছিলাম না। যতই ফিনিশ করি, গাছ এগিয়ে আসে। বড়ো ছবি, বড়ো একটা বোর্ডে কাগজ মাউণ্ট করে তাতে আঁকছি, নাড়াচাড়ার সুবিধে নেই। তখনকার দিনে রিক্সা বলে ছিল না কিছু যে, তাতে ছবি চড়িয়ে নিয়ে যাব কলাভবনে নন্দদার কাছে। কি করি, অভিজিতের হাত দিয়ে একটি চিঠি লিখে পাঠালাম নন্দদাকে, লিখলাম, একটা গাছ নিয়ে বড়ো বিপদে পড়েছি।

নন্দদা এলেন। ছবির সামনে বসলেন। খানিক ক্ষণ চেয়ে রইলেন ছবির দিকে, বললেন, এই এই রঙ-কয়টা গুলে দাও। রঙ গুলে দিলাম। নন্দদা তুলিতে রঙ নিয়ে গাছের সঙ্গে যেন ভাব জমিয়ে ফেললেন। গাছ যেন নড়েচড়ে উঠল। নন্দদা যেন এদের সব-কিছু জানেন, জানেন কেমন করে এদের সঙ্গে ভাব জমাতে হয়— এদের ভোলাতে হয়— এদের জাগিয়ে দিতে হয়।

নন্দদার শেখানোর পদ্ধতিই ছিল এই রকম। চোখ ফুটিয়ে দিতেন ছাত্র-ছাত্রীদের। নন্দদা কোনোদিন লেকচার দেন নি। ছোটোখাটো উপমা দিয়ে কত গভীর বস্তু সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন। কথাচ্ছলে সে-গভীরের সন্ধান দিতেন, মন্ত্রের মতো কাজ করত তাঁর এ-সব ইঙ্গিত আমাদের জীবনভর।

প্রয়োজন বুঝে আমাদের কাজের স্রোতের মুখ ঘুরিয়ে দিতেন নন্দদা। একদিন বললেন, জানো, তলোয়ারটায় সর্বদা ধার দিয়ে রাখতে হয়, মরচে যাতে না পড়ে। আমাদের হাতও তেমনি, মরচে পড়তে দিয়ো না।

নন্দদার কথা তো নয়, নির্দেশ। ছবি আঁকার সময়ে ছবি আঁকি, আর পথ চলতে, বেড়াতে স্কেচ করতে করতে চলি। যেখানেই যাই, গাছতলায় বসি, গল্প করতে করতে স্কেচ করি। বোধ হয় একটু বেশিই করছিলাম। একদিন পিকনিকে যাচ্ছি কলাভবনের সবাই, শান্তিনিকেতনের বাইরে মাঠ ঘাট পেরিয়ে রেললাইনের ধারে কোপাই নদীর ওপারে। কাঁধে আছে ঝোলা, স্কেচ করবার সরঞ্জাম ভরা। যথারীতি সেই ঝোলা থেকে সাদা কার্ড পেন্সিল হাতে নিয়ে স্কেচ করতে করতে চলেছি।

পিকনিকে যাওয়ার পথটুকু তো হেঁটে চলা নয়, যেন হাওয়ায় ভেসে চলেছি। শালপ্রাংশু মহাভুজ মাসোজি, তেমনি এক বিরাট আকারের এস্রাজ ছিল তাঁর। এ-সব উপলক্ষে বা বৈতালিকে এই এস্রাজটি থাকত তাঁর সঙ্গে। কোমরে আঁট করে একটা চাদর জড়াতেন মাসোজি, আর এস্রাজটার গায়ে থাকত শিক বাঁকানো একটা আংটার মতো— মাসোজির নিজেরই তৈরি। এস্রাজের এই আংটাটা গোঁজা থাকত কোমরে জড়ানো চাদরের খাঁজে। হাত দিয়ে এস্রাজ ধরে থাকবার দরকার থাকত না আর।

মাসোজি এস্রাজ বাজিয়ে চলতেন— কখনো মাউথ-অরগ্যান বাজাতেন। ছেলেমেয়ের দল গান করতে করতে আকাশ বাতাস ভরিয়ে দিয়ে পথ চলত। পাথর কাঁকর ঘাস জল আল মাঠ— সব এক হয়ে যেত। আমরা পিকনিকে চলতাম।

চলছি। বাঁ হাতে কার্ডের গোছা, ডান হাতে ক্রেয়ন, কালি। নন্দদা এসে আমার পাশে পাশে চলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ চলার পরে— যেন গল্পটা এমনিই মনে এল, বললেন, জানো, আমাদের গ্রামে একজন ব্যাধ ছিল। সে রোজ রাত্রে নাড়ুর মতো ছোটো ছোট্টো পাঁচটি বল বানিয়ে রান্নার পরে উনুনে ফেলে পুড়িয়ে রাখত। পাঁচটির বেশি সে কোনোদিন বানাত না। পরদিন ব্যাধ গুলতিতে ঐ পাঁচটি বল দিয়ে ঠিক পাঁচটি পাখি মেরে নিয়ে আসত। একটি বলও নষ্ট হত না।

বুঝলাম। এবারে আর তড়বড় করে স্কেচের পর স্কেচ নয়, যা করব পাঁচটি কার্ড তো পাঁচটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে।

কলাভবনের কথা শুরু করতে-না-করতেই কোথায় চলে এলাম। এই হয়, স্মৃতি থেকে লিখতে বসলে পরের ঘটনা হুড়মুড় করে আগে এসে পড়ে। আগু-পিছু

মানে না। ঠিক জায়গায় তাদের ঠিকমত ধরতে না পারলে আবার কোথায় কে তলিয়ে যাবে সেই ভয় হয়। তাই যে যখন আসে আসুক, যতটুকু যাকে ধরতে পারি ধরে রাখি। মালতী ফুটল, চামেলী জাগল ; মাদার কুরুচি ছাতিম পলাশ শিমুল শিরিষ— গাছে গাছে কত রঙ, কত সৌরভ। কালবৈশাখী শুকনো পাতা উড়িয়ে লাল ধুলো ছড়িয়ে সব একাকার করে দিল। আবার সবাইকে খুঁজে খুঁজে তবে পেতে হয়। তবে শুনতে পাই কোকিলের ডাক, বউ কথা কও-এর আকুতি, দোয়েলের গালভরা শিস। তখন সেই স্বল্পটুকুই হয় স্পষ্ট। বাকিটা থাকে থাক্ ধুলোয় মাখামাখি।

নন্দদা যখন কলাভবনে তাঁর নিজের জানালার ধারে আপন জায়গায় বসে ছবি আঁকেন, আমরাও গিয়ে কাছাকাছি বসে তাঁর আঁকা দেখি। দিনান্তে নন্দদা যখন আশ্রমে ঘুরে বেড়ান, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরি। নন্দদার সঙ্গই আমাদের শিক্ষা। চলতে ফিরতে নানা কথায় কত-কিছু শিখিয়ে চলেন।

নানা গাছের নানান ছন্দ। নিম গাছের পল্লবের ছন্দ যেদিন দেখালেন— সেদিন অবাক হলাম। যেদিন আঁকলেন সেদিন মুগ্ধ হলাম। এখনো নিমগাছকে নন্দদার সেই ছন্দে-ধরা রূপে দেখি, দেখে দেখে তার জালে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরা দিই। ছোটো ঘাসের ছন্দটিকে নিয়ে নন্দদাকে বিস্ময়াবিষ্ট হতে দেখেছি।

এ আরো অনেক পরের কথা, আমার আরো অনেকটা বয়েস হয়ে যাবার পরের কথা। তখন ভিজে বালির আস্তরের উপর ইটালিয়ান প্রসেসে ফ্রেস্কো হচ্ছে এখানে-ওখানে একটু-আধটু। কোনার্কে ঢুকতে বাইরের দিকের একটা দেয়ালে নন্দদা আঁকলেন নটীর পূজা— ইটালিয়ান ফ্রেস্কোর প্রসেসে। লাইন ড্রইং— কিন্তু প্রতিটি লাইনে ঘাসের ছন্দ। তুলির টান ঘাসের ছন্দে সরু মোটা সরু হয়ে উঠেছে বেঁকেছে। নটী নাচতে নাচতে প্রণাম করছে— সেই ভঙ্গিটি। রোদে জলে অনাদরে সেটি নষ্ট হয়ে গেছে— দেখলাম সেদিন। এই ছবিটি ঠিক এইভাবে কাগজেও এঁকে-ছিলেন নন্দদা— ঠিক এত বড়োই সাইজে। সাদা কাগজের উপরে কালো কালি দিয়ে লাইন ড্রইং। আছে হয়তো এটি যত্নে কোথাও। তারেরও একটা ছন্দ পেতেন নন্দদা, তুলির টানে সেই ছন্দও এঁকে দেখিয়েছিলেন।

একটুখানি কথা, ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া।

নন্দদা বলতেন, বাঁশ ও ঘাসের ছন্দ একই। কিন্তু এই ছন্দ চলবে শুধু আলপনার বেলায়। ছবিতে এ চলবে না। ছবিতে বস্তুর আকার চাই বইকি

খানিকটা। তবে মূল ছন্দটি ঠিক থাকা চাই। এই মূল ছন্দটিকে বেছে নিতে হবে। ছন্দ ছেড়ে যদি বাঁশ গাছটাই আঁক— তা হবে মেরুদণ্ডহীন লোকের মতো। হাড় থাকবে না, নুয়ে পড়বে, জোর তাতে কিছুই থাকবে না! আর যদি শুধু ছন্দটা নিয়েই কাজ কর তবে সেটাতে মাত্র জোরই থাকবে, রস থাকবে না।

মূল ছন্দটি ঠিক রেখে শিল্পী সবেতেই যেতে পারে। নন্দদা বলতেন, প্রকৃতিতে সব ছন্দই আছে।

এ আরো কিছুটা পরের কথা, আমার আরো কিছু বয়েস বেড়েছে। সেই রূপ, ছন্দ নিয়েই মনে প্রশ্ন জেগে থাকে। নন্দদার নিজের কথা জানতে ইচ্ছে করে। নন্দদা বলেন, আমার কথা বলছ? আমি বরাবরই যেন দোলাতে দোল খাচ্ছি। কখনো এদিকে কখনো ওদিকে। কিন্তু মূল ছন্দ আমার ঠিকই আছে। কাজেই কোনো দিকে যেতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। 'নিমাই-এর জন্ম' ছবিটির পাশেই আবার সাঁওতাল মেয়ে-ছেলের মিলন আঁকলাম। আবার সঙ্ঘমিত্রাও আরেক ধরনের। সাঁওতাল মেয়ে আলপনা দিচ্ছে, সেও অন্যরকম। কিন্তু যে-কেউ এ-কয়টা ছবি দেখেই বলে দিতে পারবে— এ একজনের আঁকা। হয়তো আমার একটা ব্যক্তিগত ছন্দ আছে, হয়তো আমার রঙের একটা সাধারণ রুচি আছে, হয়তো আমার ছবিতে প্রাণ দেবার একটা গতি আছে। যাই হোক, সত্যিকারের একটা জিনিস আমার ছবিতে মেরুদণ্ডের মতো সোজা আছে। তাতে যে ধরনেরই কিছু আঁকি-না কেন, নুয়ে পড়বে না। এমনি ভাবে নিজের কথা, নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেন ফাঁকে ফাঁকে। ভয় ভাঙিয়ে দেন।

এমনি ভাবেই নন্দদা আমার কাছে কলাভবনের মতোই আপন হয়ে গেলেন। তিনি যে গুরু এ দূরত্ব আর থাকল না।

তখন শ্রীভবনে থাকি। দিনের প্রথম উদ্দেশ্য : তৈরি হয়ে কলাভবনে ছুটে যাওয়া। দিনের আলো এক পলকও নষ্ট হয় — প্রাণ চাইত না। নিজের জায়গায় বসে বসে ছবি আঁকি। গাছপালা মানুষ জন্তু স্টাডি করবার দরকার হলে বেরিয়ে পড়ি। কাছেই সাঁওতাল গ্রাম, সারাদিন সেখানে ঘুরে ঘুরে স্টাডি করি। কারো 'সীট' খালি দেখলে ব্যস্ত হন না নন্দদা। জানেন, কোথায় গিয়েছি। 'ক্লাস' বলে বাঁধাবাঁধি ছিল না আমাদের, ফাঁকি বলেও ছিল না কিছু। কলাভবন ছিল বড়ো প্রিয় স্থান, ছিল আনন্দে ভরা মুহূর্তগুলি।

কলাভবনের চারি দিকের গাছগুলি বড়ো হয়ে উঠতে লেগেছে। ঝাউ

ইউক্যালিপটাসের ঝাড় সকলের ঊর্ধ্বে। বকুল বড়ো ধীরে ধীরে বাড়ে। প্রতিটি গাছের প্রতি নন্দদার অসীম মমতা, যেমন মমতা আমাদের প্রতি। একই ভাবে তিনি আমাদের লালন করে চলেছেন।

সংগীতভবন বলে ক্লাসঘর তেমন ছিল না তখন কিছু। পরে নেপাল রোড থেকে গুরুপল্লী যাবার পথে চৌরাস্তার মোড়ে পথের ধারে ছিল একটা হলুদ শিমুলের গাছ— ঠিক বাসন্তীহলুদ নয়— অনেকটা গেরুয়া রঙ ফুলের। সেই শিমুল গাছ-তলায় ছিল একটা কুটির— সেটিই ছিল সংগীতভবন।

নুটুদি গানের ক্লাস নিতেন, শ্রীভবনে এসে এ ঘর ও ঘর ঘুরে গাইয়ে মেয়ে-কয়টিকে ডেকে খুঁজে জোগাড় করে মেঝেতে বসে গান শিখিয়ে দিতেন। এক-একদিন কলাভবনেও চলে আসতেন, মিউজিয়ামের যে-কোনো একটা ঘরে মেয়ে-কয়টিকে জড়ো করে গান শিখিয়ে যেতেন। কখনো কখনো নন্দদা এসে বসেন গানের কাছে। আমরাও আসি। গান শেষে নন্দদা ওঠেন, আমরাও উঠি। যার যার স্থানে গিয়ে কাজ শুরু করি। কিন্তু যেদিন সাবিত্রী গান ধরে সেদিন সময়ের হিসাব থাকে না কারো মনে। গানের পর গান গেয়ে যেতে থাকে সাবিত্রী। বড়ো সুমধুর গলার অধিকারিণী সে। কলাভবনে সেও একটা সীট নিয়ে বসত, আঁকত। কোনো-কোনো দিন নন্দদা তার ছবি দেখতে এসে সেখানে বসে পড়তেন। সাবিত্রী বুঝত, সে গান ধরত। তার সেই সুরের টানে ছেলেমেয়ে আমরা সবাই যে যার কাজ ফেলে এসে মেঝে জুড়ে ঘিরে বসতাম। অপূর্ব সে গান।

দিনদা থাকতেন সুরপুরীতে, আশ্রমের উত্তর-পুব দিকে। তখন মনে হত বেশ একটু দূর। দলে দলে ছেলেমেয়েরা গান শিখতে আসে তাঁর কাছে। দল বলতে গুটি পাঁচ-ছয় জনের দল। লাল টালির বাড়ি সুরপুরী। সবুজ কয়েকটা গাছের ভিতর বড়ো সুন্দর দেখাত। তখনকার দিনে বেশ বড়ো বাড়ি বলেই মনে হত এটি। দিনদা বাড়িতেই ক্লাস নিতেন গানের। দিদিদের দলে না-গাইয়ের দলের একজন হয়ে আমি চলে আসতাম দিনদার ক্লাসে। গানের আকর্ষণ তো ছিলই কিন্তু বেশি করে টান ছিল দিনদার গল্পের। খুব মজার মজার গল্প বলতেন দিনদা। ঘরের ভিতরে একটা খাটের উপর জোড়াসন হয়ে বসে থাকতেন তিনি। বিরাট লম্বা-চওড়া মানুষ ছিলেন, বসে থাকতেন যে, তাও মনে হত— কী বিশাল এক মূর্তি। যেন ঘরটি ভরাট হয়ে থাকত।

ক্লাস শুরু হবার মুখে গল্প হত আগে খানিকটা। একেই তো দিনদার গুরু-

গম্ভীর স্বর, গল্প বলতে বলতে যখন গুবগুব করে হাসতেন, আমরাও হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়তাম। কবে এক আত্মীয়ের বিয়ের বাসরে জামাইকে গান গাইতে ধরেছে কনের সখীরা, হারমোনিয়ম বাজিয়ে জামাই গান ধরল, 'মনে কর শেষের সেদিন ভয়ংকর, অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।'

দিনদার ভাঁড়ারে কত কত গল্প, শেষ থাকত না তার। অর্ধেকটা সময় এই গল্প হাসিতে কাটত, তার পর দিনদা গান ধরতেন, এস্রাজ নয় তবলা নয়, কোনো বাজনা-বাদ্যি নয়, খালি গলায় গানটি তিনি দু-তিন বার গেয়ে যেতেন। কোলের উপরে রাখা ডান হাতখানি একটু উঠত নামত— আঙুলগুলি নড়ত। সেই নড়াতেই সুরের উঁচু নিচু গমক গিটকিরি সব ধরা থাকত। হাতের দিকে তাকিয়ে সবাই ঠিক ঠিক তালে লয়ে গান গেয়ে যেত।

গানের পরে কমল বোঠান কিছু-না-কিছু খেতে দিতেন, এক-একদিন পেট ভরে লুচি মাংসও খাইয়ে দিতেন। খাওয়াতে দিনদা কমল বোঠান দুজনেই খুব ভালোবাসতেন। খেয়ে আমরা চলে আসতাম, আর একদল গান শিখতে আসত। এই আসা-যাওয়া বড়ো সুখকর ছিল। কোনো ভার ছিল না কোথাও। সকল কাজেই যেন খুশির হাওয়ায় হালকা উড়ে চলার ভাব।

শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ তখন নলিনদা। প্রায়ই আমাদের ডেকে নিয়ে বসে গল্প করেন, নানা দেশের কথা বলেন। 'বিভাগ' বলে আলাদা কিছু কড়াকড়ি ছিল না। যে-কেউ যে-কোনো ক্লাসে যোগ দিতে পারত। আমাদের একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল ঠাকুরদার বাংলা ক্লাসের প্রতি। শুনি, একবার শারদোৎসবে ঠাকুরদার পার্ট নিয়েছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন মশায়। তার পর হতে তিনি সকলের কাছে সেই ঠাকুরদাই রয়ে গেলেন। ঠাকুরদার এই বাংলা ক্লাসের ঘণ্টা পড়লেই সকলে ছুটে যেতাম। রঙে রসে গল্পে এমন সরস ক্লাস আর কারো ছিল না।

লাইব্রেরির সামনে জয়পুরী ফ্রেস্কো হবে, সবাই শিখবে। এই ফ্রেস্কোর পদ্ধতিটা বড়োই নটখটির। জয়পুর থেকে মিস্ত্রি এল, ছোটো ছোটো 'টাইলে'র আকারে আগে আঁকার প্রসেসটা আয়ত্ত করা হল। গ্রাউণ্ড তৈরি করাটাই এর প্রধান কাজ। যতখানি গ্রাউণ্ড তৈরি হয়— ভিজে থাকতে থাকতেই রঙ দিয়ে ছবি এঁকে ফেলতে হবে। লাইব্রেরির দেয়াল জুড়ে নন্দদা আঁকবেন, আমরা মিস্ত্রির সঙ্গে সাহায্যে লাগলাম গ্রাউণ্ড তৈরি করতে। চুন-বালিতে হাত ক্ষয়ে

গেল— কার কতখানি স্কইল হাত উল্টে পাল্টে দেখি আর হাসি। যেন একটা মজার ব্যাপার এটা।

নন্দদা ছবি আঁকলেন দেয়ালে— 'নিমাই-এর জন্ম'। আগেই ছবি আঁকার কাগজে নিখুঁত করে এঁকে নিয়েছিলেন। জয়পুরী ফ্রেস্কোতে কারেকশনের অবকাশ নেই। আমরা দিনের পর দিন উৎসুক নয়নে দেখছি— আর রঙের বাটি হাতে তুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছি।

এই ফেস্কো যেন লাইব্রেরির শোভা খুলে ধরল। আজও তাই।

কলকাতা থেকে অবনীন্দ্রনাথ বলে পাঠালেন নন্দদাকে— দেশী রঙ তৈরি করো। ছবি আঁকবে, একটু রঙের জন্য কাগজের জন্য পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে? বিলিতি রঙ বাদ দাও। চীন জাপান কত কষ্ট করে বারে বারে পরীক্ষা করে, কাগজ কতখানি রঙ টেনে ধরতে পারবে দেখে, তবে ছবি আঁকার কাগজ তৈরি করে দিল শিল্পীদের জন্য। আমাদের দেশে একটু রঙ কাগজ তৈরি হল না আজ পর্যন্ত।

নন্দদা দেশী রঙ তৈরি করতে লেগে গেলেন। আমাদের নিয়ে খোয়াইতে যান, বর্ষার জলে ধোয়া থিতিয়ে যাওয়া লাল পলিমাটি তুলে আনি। ধান ক্ষেতের সাদা মাটি আনি। নদীর ধার হতে এলামাটি আনি। গামলা গামলা জলে গোলা হয় রঙ। নানা রঙের মাটি আলাদা আলাদা। রঙ গোলা হাল্‌কা জলটা একটা পাত্রে ধরি, সেই পাতলা জল থেকে মিহি রঙটুকু থিতিয়ে নীচে পড়ে, ভিজে কানি পাত্রের একপাশে ডুবিয়ে পাত্রটি কাত করে রাখি— সব জল চুইয়ে চুইয়ে গড়িয়ে পড়ে রাতভর দিনভর। তলায় রঙটুকু জমাট বেঁধে স্থির হয়ে থাকে। সেই রঙ বাটিতে বাটিতে তুলে রাখি। ভুসো কালি, গেরুয়া, হলুদ, সাদা সব রঙই হয়, কেবল সবুজটার জন্য পাথুরে রঙ তৈরি করে নিতে হয়; টেরাভাইটি রঙ, বড় স্নিগ্ধ শেড। পাথরের টুকরোগুলি বড়ো বড়ো শিলে জল দিয়ে ধীরে ধীরে ঘষে সেই রঙ গোলা জল থিতিয়ে নিয়ে রঙ তৈরি করতে হয়। এই পাথরের টুকরোগুলি আনাতে হয় জয়পুর হতে। তখনকার দিনে অনেক ছবিই আঁকা হয়েছিল এই রকম দেশী রঙ দিয়ে।

দেশী কাগজ তৈরি করবার সুযোগ তো আমাদের নেই, পরাধীন দেশ। কালিম্পঙে পাতলা নেপালি কাগজ পাওয়া যায়, সেই কাগজ আনিয়ে আমরা ছবি আঁকতাম তখন। এতে ওয়াশ চলে না। টেম্পারা ছবিই করতে হত।

তুলিটা আর করা গেল না, চেষ্টা করা হল নানা ভাবে, ঠিক হল না।

মুঠো মুঠো রঙ তৈরি করা হয়েছে, রঙের ভাবনা আর নেই। শিশুবিভাগের দেয়ালে এবারে ওয়ালপেন্টিং করতে হবে, ছোটোরা উঠতে বসতে চলতে শুতে ছবি দেখবে। নন্দদা মোঘল ও রাজপুত পেন্টিং থেকে জন্তু পাখি ফুল বেছে দিলেন। ছোটোদের ঘরে এই-সব ছবিই মানাবে ভালো। চোখের সামনে সারাক্ষণ দেখবে ছবি, নামকরা ছবিগুলিই বাছা হল। কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ঠিক করে দিলেন কে কোন্ ছবি আঁকবে।

ছোটো ছবিকে দেয়ালের খোপ-অনুযায়ী বড়ো করে আঁকতে হবে। কলা-ভবনের ঘরে ঘরে সবাই বসে গেলাম ছবি এন্‌লার্জ করতে। ব্রাউন পেপারের উপর ছবি এন্‌লার্জ করা হল। এবারে ছবির লাইনগুলি সূঁচ দিয়ে ফুটিয়ে রাখবার পালা। দেয়ালের গায়ে এই কাগজটি চেপে ধরে তার উপরে গুঁড়ো গেরিমাটির ছোটো পুঁটুলিটা ঘষে দিলেই ছবির আউটলাইনটি পড়ে যাবে দেয়ালের গায়ে। তার পর তার উপরে আঁকা চলতে থাকবে রঙে-রেখায়। সারা কলাভবন জুড়ে সে সময়টায় তখন একই শব্দ উঠতে লাগল পুট্‌পুট্‌— পুট্‌পুট্‌। ব্রাউন পেপার ফুটো করে চলেছে সূঁচ।

ড্রইংের ব্যাপার সারা হলে সব সরঞ্জাম নিয়ে চললাম শিশুবিভাগে। লম্বা একখানা ঘর, ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথা পর পর দু সারি খাট পাতা। কিছুদিনের জন্য খাট সরিয়ে বারান্দায় এখানে ওখানে শিশুবিভাগের ছেলেদের শোবার ব্যবস্থা করা হল। ঘরের দেয়াল ঘেঁষে বাঁশের মাচা তৈরি হয়েছে— সেই মাচায় উঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘষে ঘষে দেয়ালের চুনবালি তুলে সারফেস পরিষ্কার করতে লাগলাম সবাই। শুধু বালির আস্তরের উপর করতে হবে পেন্টিং। পুরাতন পলাস্তারা ভেঙে নতুন করে পলাস্তারা দেওয়ার কথা ভাবতেই পারা যায় না। সে টাকা কোথায়? পুরাতন দেয়ালের চুন গায়ে লেগে থাকলে ছবি আঁকা যাবে না— রঙ চটে যায়। শিরিস কাগজ দিয়ে ঘষে সব তুলে দিয়ে সারফেস তৈরি করে নিচ্ছি নিজেরাই। সময় লাগছে— কষ্টও হচ্ছে। মিস্ত্রি লাগিয়ে এ কাজ করাবার কথা তখন আশ্রমে আমরা ভাবতেও পারতাম না। মিস্ত্রির কাজ শিল্পীর কাজ— ঘর পরিষ্কার করতে ঝি-চাকরের কাজটুকুও আমরাই করে ফেলতাম। আনন্দের সঙ্গেই করতাম।

বেশ অনেকদিন লাগল দেয়ালের ছবি শেষ হতে। ডিম মিশিয়ে রঙ গোলা হত, একটা আঁশটে গন্ধ লেগে থাকত গায়ে। রোজ তাজা ডিমে নতুন করে রঙ

গোলা হত। রঙের ঘরে এক কোণে একগাদা ডিম থাকত, শুকনো পাতা জেলে ডিম ভাজা করে খেয়েও ফেলতাম রঙ গুলাতে বসে কখনো কখনো।

শিশুবিভাগের বারান্দায় তখন কলেজের বাংলার ক্লাস নিতেন ঠাকুরদা। এই ক্লাসের ঘণ্টা পড়লেই টুপটাপ আমরা মাচা হতে নেমে পড়তাম। এমন কি নন্দদা পর্যন্ত। বড়ো বড়ো খোলা জানালাগুলি নীচ হতে ওঠা। মাটিতে বসলে গলা অবধি দেখা যায় বাইরের থেকে। ঠাকুরদার ক্লাস বারান্দায়, আমরা ঘরে, একটুখানি মাত্র দেয়ালের ব্যবধান। আমরা দেয়াল ঘেঁষে ঘরের ভিতরেই বসে বসে বাংলা ক্লাস শুনতাম। নন্দদাও এক কোণে হাঁটু-মুড়ে গুটিসুটি হয়ে বসতেন। একদিন নন্দদার এভাবে বসার একটা স্কেচ করে ফেললাম নোট নেবার আমার ছোটো স্কেচ খাতাটিতে। নন্দদা খাতাটি নিয়ে তাঁর বসার পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা একটা খলে হুকো এঁকে দিলেন। দিয়ে হাসলেন। ভাবখানা— যেন এই বসার ভঙ্গিতে এটি না হলে মানায় না।

ভিতরে বাইরে শিক্ষা চলত আমাদের এই ভাবে।

এ-সবের উপরে ছিল ছুটে ছুটে আসা গুরুদেবের কাছে। দিন নেই, দুপুর নেই— সকল কথা ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁকে না বললে চলত না। ঝিকমিক আলো— ঠাণ্ডা রোদ্দুর— মাধবীবিতানের তলা দিয়ে গেস্ট-হাউসের ভিতর দিয়ে মন্দিরের সামনের আমলকী বীথির ছায়া ঘেঁষে আসে, শীতের হাওয়ায় ঝুরঝুর করে আমলকীর ঝিরিঝিরি পাতাগুলি পড়ে মুখে মাথায়— খোলা চুলে। কিছু আটকে থাকে চুলে, কাপড়ে— কিছু পড়ে যায় নীচে। তাই নিয়েই এসে প্রণাম করে দাঁড়াই গুরুদেবের সামনে। গুরুদেবের সস্নেহ হাসি আমলকী পাতাগুলির মতোই ঝরে পড়ে মাথায় চুলে। ধন্য হয়ে যাই।

৩

গুরুদেব কয়েকবারই এসে থেকেছিলেন চৌরঙ্গির আর্টস্কুলে প্রিন্সিপ্যালের ফ্ল্যাটে— বড়দার অধ্যক্ষরূপে থাকাকালীন। আমরা দু বোনও এসে থাকতাম সে সময়ে। শান্তিনিকেতনে ও জোড়াসাঁকোয় গুরুদেবের দেখাশোনা করতেন প্রতাপ তলাপাত্র বলে একজন। গুরুদেব চৌরঙ্গির বাড়িতে আসবার আগেই তাঁর ঘর বাথরুম আগে হতেই সাজিয়ে রাখা হত। গুরুদেবের নিত্য ব্যবহারের কিছু কিছু জিনিস—

যেমন কালো পাথরের থালা বাটি, রুপোর গেলাস, চীনা মাটির পেয়ালা ইত্যাদি প্রতাপ তলাপাত্র মশায় জোড়াসাঁকো থেকে নিয়ে আসতেন। চিকচিক করা মসৃণ সেই কালো বড়ো পাথরের থালা— তাতে যখন অন্ন-ব্যঞ্জনাদি বেড়ে গুরুদেবের সামনে রাখা হত, মনে হত যেন স্বর্গীয় সুস্বাদু ভোজ্যসামগ্রী সব। কালো পাথরের থালায় শ্বেতশুভ্র ভাতের দানা কয়টিরও যেন রূপ উছলে উঠত।

স্নানের ঘরের জন্য আসত মস্ত এক পিতলের গামলা আর একটা পিতলের মগ। সোনার মতো ঝকঝক করত সেই পিতলবর্ণ। নিত্য মাজা হত সেটি। গামলায় জল-ভরা থাকত গুরুদেবের স্নানের জন্য। জলচৌকি থাকত বসে স্নান করতে। এই জলচৌকিটাও আসত জোড়াসাঁকো হতে।

আর আসত গুরুদেবের রান্নার জন্য খাস বাবুর্চি সেইসঙ্গে। চৌরঙ্গিতে সাহেবি আমলের বাড়ি— নীচে বাগানের ভিতর ছিল বাবুর্চিখানা। সেখানে রান্না করত বাবুর্চি। কত রকমের রান্নাই করত সে। সব চেয়ে অবাক হতাম গুরুদেবের থালার পাশে সুতোর মতো মিহি একগোছা আলুভাজা দেখে। এই আলুভাজা রোজ থাকত থালায়। মনে হত যেন মুখে দিলেই মিলিয়ে যাবে। চিবোতে হয় না।

এখন নানা রকম মেশিন বেরিয়েছে, রকম বে-রকম কাটাকুটি করা যায় তা দিয়ে। মায়েদের ছিল তখন একমাত্র বঁটি-দা সম্বল— নারকেলের চিঁড়ে জিরে কাটা— কত কারিকুরিই করেছেন তা দিয়ে। আর বাবুর্চিদের ছিল লিকলিকে লম্বা এক ছুরি ভরসা। এই ছুরি দিয়ে কী করে এভাবে আলু কাটে, কী করেই বা ভাজে। একটার গায়ে আর-একটা লাগে না। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে বড়দাকে লুকিয়ে দু বোনে নীচে বাবুর্চিখানায় গিয়েছি, বাবুর্চিকে তোষামোদ করেছি— কী করে কাটো দেখাও তো একবার। বাবুর্চি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পটলের খোসা ছাড়ায়, বাঁধাকপি ছুরি দিয়ে দু ফাঁক করে, ডিম ভেঙে খটাখট কাঁটা দিয়ে ফেটায়— আলুভাজার আলু আর কাটে না আমাদের সামনে। মনের মধ্যে কী দুঃখ নিয়ে ফিরেছি।

গুরুদেবের জন্য আমরা দু বোনেও রান্না করতাম রোজ কিছু কিছু। বাঙাল দেশী রান্না। গুরুদেব পছন্দ করতেন এ রান্না, শুধু বলতেন— ঝাল দিস্ নে, লঙ্কাটা ছুঁবিই না।

দোতলায় ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাটের মাঝামাঝি লম্বা করিডর— দু দিকে বড়ো বড়ো

ঘর— শোবার বসবার খাবার— ছবি আঁকবার স্টুডিয়ো, ঢাকা বারান্দা। খাবার ঘরের পাশে প্যানট্রি। তারই এক ধারে বসে রান্না করি আমরা গুরুদেবের জন্য। গুরুদেব যে-ঘরে বসে লিখতেন তার থেকে দূরে ছিল না প্যানট্রিটা। রান্নার ছ্যাকছোঁক আওয়াজটা একটু-একটু শোনা যেত গুরুদেবের ঘর হতে।

গুরুদেব তো বলে দিলেন, 'লঙ্কা ছুঁবি না'। কিন্তু লঙ্কা ছাড়া রান্না হয় কী করে? দু বোনে ভেবে পাই না উপায়! রোজ এক-এক রকমের ডাল রাঁধি, ডালে শুকনো লঙ্কা ফোড়ন না দিলে ফোড়নের সেই সুগন্ধ আসবে কি করে? দিদি, আমি পরামর্শ করি— দিদিকে বলি, দেখ্, একটামাত্র শুকনো লঙ্কা দে, গরম তেলে লঙ্কাটা ভাজা হয়ে এলেই তুলে ফেলে দিবি। গুরুদেব টের পাবেন না কিছু। অথচ ভাজা লঙ্কার গন্ধটা থাকবে ভালো।

সেই মতোই করেন দিদি। ডালে ফোড়ন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাড়াতাড়ি গুরুদেবের ঘরে চলে আসি দেখতে, যে, লঙ্কা ভাজার গন্ধটা এসেছে কি না এই ঘরে। গুরুদেব হয়তো লিখছেন, কি, ছবি আঁকছেন, আমি ঘরে ঢুকেছি, আর কিজন্য ঢুকেছি বুঝতে পারতেন, মুখ না তুলেই বিশেষভাবে নাকটা কুঁচকে লম্বা একটা নিশ্বাস নিতেন। গুরুদেবের মুখে থাকত চাপা একটু হাসি। আমি দৌড়ে গিয়ে দিদিকে বলতাম, দিদিলো, টের পেয়ে গেছেন গুরুদেব। উপায়?

পদ্মাপারের ডাকার অভ্যাস যায় নি তখনো। আমি দিদিকে ডাকি, দিদিলো, দিদি আমাকে ডাকেন, রানীলো। এক-এক সময়ে গুরুদেবের সামনেই ডেকে বসি এই ডাকে। ডেকেই জিব কামড়ে মুখে হাত চাপা দিই। গুরুদেব হাসেন।

গুরুদেব কিন্তু এই ডাক পছন্দই করতেন। বলতেন, পূর্ববাংলায় এই 'লো' ডাকটি বড়ো মধুর। ওলো, দেখ্‌লো, বইনলো— এই 'লো' জুড়ে কথাগুলি বড়ো মিষ্টি শোনায়। আবার ঠাট্টাও করতেন মাঝে মাঝে, বিশেষ করে বাইরের কেউ থাকলে ডেকে বলতেন, ওলো শোন্‌লো— এই 'লো'র উপরে বিশেষভাবে টান দিয়ে দিয়ে বলতেন। সবাই হেসে উঠতেন। গুরুদেব যতই বলুন মিষ্টি ডাক, কিন্তু পদ্মাপারের ছাপ দেওয়া কথায় বড়োই অপ্রস্তুত বোধ করতাম। আর এই অপ্রস্তুত হওয়াটুকুকেই গুরুদেব কৌতুকের সঙ্গে উপভোগ করতেন।

সে সময়ে রোজ বিকেলে কলকাতার সুধীজন বিদ্বজ্জন অনেকেই আসতেন। অনেকে আবার নিয়মিত আসতেন, বেশ রাত অবধি থাকতেন। নানা আলোচনা পরামর্শ হত, সবই প্রায় বিশ্বভারতীর আর্থিক অনটনের অবস্থা নিয়ে। বিকেলের

বৈঠকে আসতেন বেলুদি, দেবেন্দ্রনাথ বসু, আকৃশিদি, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, রানীদি, প্রশান্ত মহলানাবিশ, অপূর্ব চন্দ, সুধীন দত্ত, ঠাকুরবাড়ির ওঁরা। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মশায়, সুরেন দাশগুপ্ত মশায়, এঁরা আসতেন সকালের দিকে। সারাদিন নানা মতে নানা ভাবে ভিড় থাকতই। তারই মধ্যে গুরুদেব লিখে যেতেন, ছবি আঁকতেন, গানে সুর দিতেন। এই সময়েই একদিন কা'র কি স্মরণ উপলক্ষে মনে নেই— অনুরোধ এসেছে একটা গানের, গুরুদেব গানটি আকৃশিদিদের গেয়ে গেয়ে শিখিয়ে দিলেন— আকৃশিদিরা গাইলেন— 'মরণসাগরপারে তোমরা অমর, তোমাদের স্মরি'। এই-ই বোধহয় প্রথম শুনলাম গুরুদেব গানে সুর দিয়ে গান শেখালেন। এর পর তো অনেক শুনেছি। নিজের মনেও কত গেয়েছেন। এই চৌরঙ্গির বাড়িতেই শুনেছি কত। গুরুদেবের গান শুনলে নিঃশব্দে এসে একধারে স্থির হয়ে বসে থাকতাম। একদিন মনে আছে, গুরুদেব গাইছেন— শুনতে পেলাম। তাড়াতাড়ি পা ফেলে এলাম। গুরুদেবের ঘরের সামনে পূর্ব দিক খোলা যে বড়ো বারান্দা— যার পাশ ঘেঁষে উঠে আছে ফুলন্ত সুবাসিত রাশি রাশি স্বর্ণচাঁপা নিয়ে চাঁপা গাছের শাখা, পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় পুকুরের আলোর ঝিকিমিকি— সেই বারান্দায় নিচু লম্বা একটা সোফায় আধশোয়া অবস্থায় গুরুদেব বাইরের দিকে তাকিয়ে একান্তে আপন মনে গাইছেন— 'বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে'। গুরুদেব যখন গান শেখান তখনকার ভাব আর এই-ভাব একেবারে আলাদা। দরজার পাশে নিজেকে আড়াল করে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলাম সেদিন— না জানি সে কতক্ষণ ?

একবার গুরুদেবের আঁকা অনেক ছবি জমে গেল, হু হু করে ছবি এঁকে চলেছেন। তখন আর্টস্কুলে এক দক্ষিণদেশীয় শিক্ষক ছিলেন, খুব ভালো এনগ্রেভিং করতে পারতেন। গুরুদেব কালি-কলমে আঁকলেন কয়েকটা ছবি, বড়দা সেই শিক্ষককে দিয়ে কাঠের উপরে খুদিয়ে প্রিন্ট করালেন। হ্যাণ্ড-প্রিন্ট বলা হত ওকে— ব্লকে কালি লাগিয়ে ঘষে ঘষে প্রিন্ট নেওয়া হত। যন্ত্রে ছাপার চেয়ে এর বৈশিষ্ট্য আলাদা।

গুরুদেব দেখে খুব খুশি হলেন।

সাদাকালোয় আঁকা ছবি উড্‌কাট প্রিন্ট হয়ে এল আর-এক শিক্ষকের হাত দিয়ে।

গুরুদেব নিজের আঁকা ছবির প্রিন্ট দেখে শিশুর মতো খুশিতে ভরে উঠলেন।

বড়দা তামার প্লেট এনে ধরলেন গুরুদেবের সামনে, হাতে দিলেন ডায়মণ্ড পয়েন্ট একটি, এচিং করবার যন্ত্র। গুরুদেব আঁকলেন ছবি— মকরবাহিনীর। বড়দার স্টুডিয়োতে প্রিন্ট নেওয়া হল। এই এচিং প্রিন্ট নিতে তখন আমিও শিখেছিলাম। মোটা অ্যাপ্রন পরে রোলার দিয়ে প্লেটে কালি লেপে হাতে ঘষে ঘষে প্লেট থেকে ঠিকমত কালি তুলে— কালি রেখে, প্রেসে চাপা দিয়ে হুইলের লোহার ডাণ্ডা ঘুরিয়ে প্রিন্ট যখন নিতাম— নিজেকে একটা বেশ জবরদস্ত কাজের লোক বলে মনে হত। মকরবাহিনীর প্রিন্ট আমিও নিলাম কয়েকটা। একটা করে প্রিন্ট নিই, আর কালিমাখা অ্যাপ্রন গায়েই গুরুদেবকে এনে দেখাই। আবার ছুটে স্টুডিয়োতে যাই।

রঙিন ছবিও অনেক এঁকেছেন গুরুদেব এই কয়টা বছরেই। বিদেশে যখন গিয়েছিলেন শেষবারে, তাঁর ছবির একজিবিশনও হয়েছিল সেখানে। গুরুদেব বলেছিলেন— সেখানে শিল্পীরা, ক্রিটিকরা বলল— আমরা যা খুঁজে বেড়াচ্ছি আপনি তা করে ফেলেছেন।

এবারে আরো অনেক বেশি ছবি হয়ে গেছে। বড়দা একটা একজিবিশন করবার প্রস্তাব করলেন। গুরুদেব রাজি হলেন।

সঙ্গে সঙ্গে দে কোম্পানি থেকে ছবি মাউন্ট করবার লোক এসে গেল।

সে আমলের বিদেশীদের তৈরি বাড়ি— উঁচু ছাদের, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর ; স্টুডিয়োটা আরো বড়ো। মাথার অনেকখানি উপরে উত্তরের দেয়াল-জোড়া স্কাই-লাইট। ছবি আঁকতে উত্তরের আলো ভালো, আর এইভাবে আলো এলে ঘরের ভিতরে আলোছায়া ক্ষণে ক্ষণে বদলাবে না। শিল্পীর আঁকার ব্যাঘাত ঘটবে না। এই বিরাট ঘরে এক দিকে বসে গেল ছবি মাউন্ট করবার লোক, এক দিকে ফ্রেম তৈরি হচ্ছে ছবির ; আর বুক-সমান উঁচু লম্বা একটা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ফ্রেমের মাপে কাঁচ কেটে চলেছি— এ ধারে আমি, ও ধারে মিস্ত্রি। খুব ভালো লাগে আমার কাঁচ কেটে কেটে ফেলতে। এ কাজও আমি আগেই শিখেছি। বড়দার মত ছিল শিল্পী— সে তার ছবির সব কাজই জানবে, নিজের হাতে করবে। নন্দদাও তাই বলতেন। ছবি মাউন্ট করা, ফ্রেম করা তিনিও শিখিয়েছিলেন।

আমার খুব উৎসাহ, টেবিলের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছি, কাঁচের পাতগুলি একটা একটা করে কাছে টেনে আনছি, মাপছি, ডায়মণ্ড পয়েন্ট দিয়ে কাঁচে লাইন কাটছি, যন্ত্র দিয়ে একটু চাপ দিচ্ছি— আর কাঁচের বাড়তি অংশ সরু সরু লম্বা লম্বা

টুকরাগুলি ঝন্‌ঝনিয়ে মেঝেতে পড়ছে। সে শব্দে যেন উৎসাহ আমার বেড়ে চলেছে।

এর পর ছবিতে ফ্রেম লাগাবার পালা। কাঁচ, ছবি, ফ্রেমে ফিট্ করে উল্টো দিকে ঠুকঠাক পেরেক ঠুকে একের পর এক গোছা গোছা ছবি দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখছি। এ এক প্রবল উত্তেজনা। অনেক রাত পর্যন্ত এ কাজ করতাম। গুরুদেব দু-একবার আসতেন, দেখতেন, হাসতেন। আমার উৎসাহ শত গুণে বেড়ে যেত।

একজিবিশন হবে, প্রতিটি ছবির নাম চাই। সব ছবি গুরুদেবের ঘরে আনা হল। বড়দারাও সবাই আছেন। এক-একটি করে ছবি এনে গুরুদেবের সামনে ধরি, গুরুদেব ছবির নামকরণ করেন। ক্যাটালগে ছবির নাম, দাম দুটোই দেওয়ার রেওয়াজ। দামের বেলায় গুরুদেব কিছুই বলেন না, সেটা বড়দারাই ঠিক করেন।

খুব সুন্দর ক্যাটালগ ছাপা হল। ছবিগুলির কত যে ফোটো নেওয়া হল ফোটোগ্রাফারকে দিয়ে, তার শেষ নেই। বড়দার এই একটা বিশেষ গুণ, ছবি বড়ো ভালোবাসেন। ছবির একজিবিশন সব দিক দিয়ে নিখুঁত করেন। ছবি টানাবার সময় কোন্ ছবির পাশে কোন্ ছবিটি থাকবে, ছবির ভিড় হবে না দেয়ালে, ছবি থাকবে দৃষ্টি বরাবর চোখের লেভেল-এ— সব নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করান।

আর্ট স্কুলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তিনটি ঘর জুড়ে গুরুদেবের ছবি সাজিয়ে একজিবিশন হল, অতি সুন্দর হল। প্রতিটি ছবি একই মাপের ফ্রেমে সাদা মাউণ্ট বোর্ডের উপরে জ্বলজ্বল করতে লাগল। বহুলোক এসেছিলেন সেই ছবির একজিবিশন দেখতে। প্রায় সকলেই একটি দুটি করে ছবি কিনে নিলেন।

এক-একটি ছবি বিক্রি হয় আর তার কোনায় সিঁদুরের টিপের মতো একটি করে লাল কাগজের টিপ আঠা দিয়ে আটকে দিই। এতেও আমার উৎসাহের অন্ত থাকে না। ছুটে গিয়ে গুরুদেবকে সংবাদ জানাই আরো তিনটে ছবিতে লাল টিপ পড়ে গেল। লাল টিপ পড়া মানেই ছবিটি বিক্রি হয়ে গেল। একজিবিশনের শেষ দিনে যে যার কেনা ছবি সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন এখান থেকে।

গুরুদেবের ছবি সাধারণের বোঝা কষ্টকর ছিল। গুরুদেব আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন তাদের বোঝাতে, কী কী বলতে হবে। অনেকে আবার বুঝতেও চাইতেন না, এমনিই কিনে নিতেন। একদিন একজন খুব মোটাসোটা গোলগাল

ভদ্রলোক এলেন, ব্যবসায়ী কেউ হবেন। তাঁকে ছবি বোঝাতে যেতেই তিনি বললেন— তা মহাজনের আঁকা ছবি, এর আর বুঝবার কী আছে? 'ম-হা-জন' কথাটা এমন টান দিয়ে বলেছিলেন যে, সেই ভদ্রলোক চলে যেতে-না-যেতে আমি হাসতে হাসতে গুরুদেবের কাছে এসে লুটিয়ে পড়লাম। গুরুদেবও হেসেছিলেন খুব। অনেক দিন পর্যন্ত গুরুদেব ছবি এঁকে বলতেন— বুঝতে পারছিস কিছু? তা ম-হা-জনের আঁকা!

গুরুদেবের ছবির একজিবিশন হয়ে গেল, মনে হল একটা উৎসব শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু উৎসব আমাদের শেষ হয় না আশ্রমে। চির-উৎসব চির-আনন্দের স্থান এখানে। একটুতেই যেন আনন্দের বন্যা জাগে।

সুরেনদার বিয়ে। সুরেনদা নন্দদার পিসতুতো ভাই। অত্যন্ত অনুগত ভাই। শিল্পী সুরেনদা শিক্ষক ছিলেন কলাভবনে, কিন্তু সকল কাজেই সুরেনদাকে নইলে চলত না আশ্রমে। টাকাপয়সার হিসাব রাখতে সুরেনদার মতো ছিলেন না আর কেউ। কোথায় কিভাবে কী করলে আশ্রমের দুআনা পয়সা বাঁচবে সেটুকু অঙ্ক কষে আগে ঠিক করে নিতেন।

একবার নাচগানের দল নিয়ে সিলোনের আমন্ত্রণে গুরুদেব যাবেন। সুরেনদা আগে রওনা হয়ে গেলেন— বিধি-ব্যবস্থা করতে। গুরুদেব যাবেন— তাঁর যাতে কোনো অসুবিধে না হয়। তা ছাড়া— মস্ত দলও যাবে সঙ্গে। একবার সিলোনের মাটিতে গিয়ে পড়লে সেই দেশবাসীর সব দায়ভার; কিন্তু যাওয়া-আসার পথে আর্থিক দিকটা তো দেখতে হবে সুরেনদাকেই। সুরেনদা প্রতিটি স্টেশন, পথ, স্টাডি করতে করতে গেলেন— গিয়েই লিখে জানালেন, কিভাবে কোথায় থামতে হবে, কোন্ স্টেশনে ইডলী কফি একটু সস্তায় পাওয়া যায়, কোন্‌খানে আগে থেকে খবর পাঠিয়ে রাখলে দুপুরের খাওয়া অল্প দামেই সারা যাবে— সব-কিছুর নিখুঁত হিসাব জানিয়ে দিলেন। পরে অবশ্য সকলে জাহাজেই গেলাম সিলোনে, তবে সুরেনদার হিসাবে কোনো ত্রুটি থাকত না কখনোই। তখনকার দিনে আশ্রমের আর্থিক অবস্থায় সুরেনদার মতো দরদী লোক নইলে কিছু করাই দায় ছিল।

আশ্রমে যখন মাটির বাড়ি খড়ের চাল নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে হল কর্তৃপক্ষকে— বছর বছর চালের খড় বদলানো বড়ো খরচসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়াল,

আও প্রতি বছর খড় পাওয়াও দুষ্কর হত, বিশেষ করে খরার বছরে; তার উপর আছে উইয়ের উৎপাত; সবাই ভাবতে বসলেন কী করা যায়? ঠিক হল কোনোমতে একবার যদি ইটের পাকা বাড়ি করা যায়, তা হলে বছরে বছরে এই লোকসান ও ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে বাঁচা যায়। সুরেনদা হিসাব কষতে বসে গেলেন কত কম খরচে বাড়ি তোলা যায়। আরো একটা দিক বিশেষভাবে দেখলেন— ইটের বাড়ি এই উন্মুক্ত প্রকৃতির শোভাতে আঘাত না হানে। যেন দিগন্তের রেখা ভেঙে উঁচু না হয়ে ওঠে ইটের কঠিন শক্ত গাঁথুনি। তাই নিয়ে স্কেচ করে করে দেখতে লাগলেন সুরেনদা।

নিচু-বাংলায় একসারি স্টাফ-কোয়ার্টার উঠল। পাকাবাড়ি। নিচু ছাদ। যতটুকু প্রয়োজন ঠিক তত বড়ো ঘর, রান্নাঘর, বারান্দা, বাথরুম। তাই-ই আমাদের চোখে অট্টালিকার জলুস আনল।

এই নিচু নিচু ছাদ নিয়েও আমরা সুরেনদাকে ঠাট্টা করেছি, বলেছি যে, নিচু ছাদ কি সবটাই সৌন্দর্যবোধে করেছেন সুরেনদা? খরচ কমাবার জন্তই করেছেন। বলতাম— দশহাত উঁচু যদি ঘরের দেয়ালটা উঠবে, শেষের হাতটা সুরেনদা আঙুল মেলে মাপেন না, হাত মুঠো করে মাপেন— যাতে একটা ইটের লাইনের গাঁথনি বেঁচে যায়।

সুরেনদা শুনে হাসতেন।

আশ্রমের বাড়ির বাইরে দেয়ালে থাকত শুধু সিমেণ্টবালির পলেস্তারা। রোদে জলে কিছুকালের মধ্যেই দেয়ালে শেওলা পড়ত, কালো ছোপ-ছাপ রঙ ধরত, মনে হত গাছের ছায়া পড়েছে বাড়ির উপরে। বড়ো মিলমিশ ছিল সবেতে।

আশ্রমে উত্তরায়ণ থেকে সমস্ত বাড়ি সুরেনদার প্ল্যানে তৈরি। এই বিদ্যা তিনি শিক্ষার মাধ্যমে আয়ত্ত করেন নি, স্বভাবসুলভ গুণে সুরেনদা এই বিদ্যার অধিকারী ছিলেন। পরে দিল্লিতে ভারত সরকারেরও বড়ো বড়ো কয়েকটা বিল্ডিং-এর আর্কিটেক্ট হয়েছিলেন সুরেনদা। আমরা সে পথে যেতে আসতে সেই-সব প্রাসাদোপম বাড়ি দেখে বলতাম এই তো সুরেনদার বাড়ি। ভারতীয় একটা বিশেষ ছাপ থাকত সুরেনদার আর্কিটেক্চারে।

দেখি আর ভাবি— এখন এই যে এত বড়ো বড়ো প্রাসাদ, এর কি প্রয়োজন ছিল এখানে? বুঝি, কিছু জিনিসপত্র সংরক্ষণের জন্ত বড়ো ও মজবুত ঘরের প্রয়োজন, যেমন লাইব্রেরির বই রাখতে, কলাভবনের ছবি রাখতে, পুরাতন

পুঁথিপত্র রাখতে। কিন্তু তবু মনে হয় সব-কিছুরই পরিবেশ বলে, শোভনতা বলে যে কথাটা আছে— তা মানতে হয়।

তখনকার দিনে আমাদের দালানবাড়ি কয়টাই বা ছিল? বড়ো বাড়ি বলতে উদয়ন। সেই উদয়নকে কত ধীরে ধীরে ভেবেচিন্তে বাড়ানো হয়েছে। আর্কিটেক্ট বলতে শুধু ছিলেন সুরেনদাই। গাছের ডাল যেমন হাত-পা মেলে প্রকৃতির অঙ্গ হয়ে মিশে থাকে, কোনো বিচ্ছেদ ঘটায় না, সুরেনদাকে দেখতাম সেই ছন্দটি নিয়ে বাড়ি তুলতেন। কোথাও একটু কার্নিস বের করে দিলেন, কোথাও দেয়ালের সোজা লাইনটা ভেঙে দিলেন, কোথাও জাফরি বসালেন আপন নকশায় কেটে। বাড়ি বাড়িই হল, তাতে ঘর রইল, বারান্দা রইল, সিঁড়ি-ছাদ সবই রইল, সব নিয়ে বাইরে থেকে সে সুন্দর শোভন হয়ে রইল। নিজের অস্তিত্বকে ডাক-হাঁক দিয়ে জাহির করল না।

দুঃখ হয়, চোখের সামনেই তো ছিল উদয়ন উদীচী— তা দেখে দেখেই তো সব বাড়তে পারত। তা হল না। শান্তিনিকেতন তো ইমারতে বন্দী ছিল না। সে ছড়িয়ে ছিল আকাশে বাতাসে আর লাল কাঁকরের মাটিতে। প্রাণ ভরে নিশ্বাস নেবার স্থান এটি। 'বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে, অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে'— এই অপরূপকে দেখতে শেখার সাধনাস্থল শান্তিনিকেতন।

সুরেনদা ছিলেন নম্র বিনয়ী লাজুক প্রকৃতির স্বল্পভাষী মানুষ। সকল কাজ সকল দুরূহ কাজ তিনি যেন অন্তরালে থেকে করতেন। প্রকাশ্যে এগিয়ে আসা তাঁর স্বভাবে ছিল না। সুরেনদাকে গুরুদেব অতিশয় স্নেহ করতেন, ডাকতেন 'সুরেন সাহেব' বলে। বড়ো মধুর ছিল সে ডাক। নতমস্তকে তাঁর সে-ডাক গ্রহণ করতেন সুরেনদা।

ছোটো একটি সরল সুন্দর হাসির ঘটনা বলি এখানে। গল্পটি শুনেছিলাম গুরুদেবের মুখেই।

গুরুদেব যখন জাভা যান, সুরেনদাকেও নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে। ফিরবার পথে গুরুদেব কিছুটা অসুস্থ বোধ করলেন। জাভাবাসী যাঁরা গুরুদেবকে জাহাজে তুলে দিলেন তাঁরা খুবই উদ্‌বিগ্ন বোধ করলেন। তখনকার মতো কি আর করা যায়, তাঁরা খুব পুরাতন ও দামি এক বোতল ওয়াইন দিয়ে দিলেন সঙ্গে, যে, এটা খেলে গুরুদেব কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করবেন। কিন্তু গুরুদেবের তা প্রয়োজন হয় নি। গুরুদেব একদিন সেই গল্পই হাসতে হাসতে বললেন— আমি ভাবলাম

এই দামি জিনিসটা নষ্ট হবে— সঙ্গে যারা ছিল তাদের বললাম 'তোমরা চাও তো নিয়ে খাওগে যাও'। তারা খেয়েছিল ঠিকই, কারণ কেউ আর সে সন্ধ্যায় এলো না আমার কাছে। এলো শুধু সুরেন সাহেব। ডেকে বসেছিলাম, সুরেন এসে আমার সামনে বসে— যা নাকি কখনো সে করে না, সে আমাকে গীতাঞ্জলির মানে বোঝাতে লাগল। বলল, জানেন গুরুদেব, কবি কেন লিখলেন 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার 'পরে'। কেন 'চরণধুলা' বললেন। আমি যত বলি 'আমি বুঝতে পেরেছি, সুরেন সাহেব, রাত অনেক হল, তুমি এবারে শুয়ে পড়োগে যাও।' সে ততই চরণধুলার মানে আমাকে বোঝাবেই। বলে, গুরুদেব খুব হাসলেন।

সুরেনদাকে আমরা যখন এই গল্পটা করে তামাশা পেতাম, সুরেনদা আমাদের হাসিতে হেসে যোগ দিতেন অবশ্য, কিন্তু লজ্জায় যেন তাকাতে পারতেন না সোজা। ঐ একবারই বোধহয় এই ভাবে সামনা-সামনি কথা বলেছেন, গুরুদেবের সঙ্গে সুরেনদা।

এই সুরেনদার বিয়ে সুটুদির সঙ্গে। আশ্রমে একটা খুশির ঢেউ জাগল।

সুটুদির মা থাকতেন মেয়েদের নিয়ে— এখন যেটা সংগীতভবন তার পাশে রাস্তা— সেই রাস্তার অপর দিকে ছিল একটা বড়ো খড়ের চালার ঘর, সেই বাড়িতে। মাঝখানে উঠোন— উঠোনের এদিকে থাকতেন কালীমোহন ঘোষ মশায়— স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে। সেও একখানা এই রকমেরই বাড়ি।

আমরা কলাভবনের দল বরের বাড়ি কনের বাড়ি ছুটোছুটি করি। গুরুপল্লীতে নন্দদার বাড়ি অর্থাৎ বরের দাদার বাড়ি। সুধীরা বৌদি থালায় থালায় তত্ত্ব সাজিয়ে দিলেন, আমরা মেয়েরাই সে তত্ত্ব মাথায় করে গান করতে করতে খেলার মাঠের ভিতর দিয়ে কনের বাড়ির উঠোনে এসে থামি। বরের বাড়ির তত্ত্বের থালা মাথা হতে নামিয়ে কনের বাড়ির উঠোন লেপে বিয়ের আলপনা দিতে বসি— সেও আমরাই।

মোটা হ্যাণ্ডমেড পেপারে গুরুদেবের আশীর্বাদী কবিতায় ছাপা হল। বিলি হল।

…জ্বালো গো মঙ্গলদীপ,
করো অর্ঘ্য দান,
তনু মনপ্রাণ।

ও যে সুরভবনের রমার কমলবনবাসী,
মর্ত্যে নেমে বাজাইল সাহানায়
নন্দনের বাঁশি।...
এলো প্রেম চিরন্তন, দিল দোঁহে আনি
রবিকর-দীপ্ত আশীর্বাণী।
তারি আগমন পথে বাজাইল
মাঙ্গল্যের শাঁক
পঁচিশে বৈশাখ।

সুরেনদার বিয়ে হয়ে গেল। সুরেনদার ইচ্ছেতেই পঁচিশে বৈশাখ বিয়ের দিন ধার্য হয়েছিল। বাসরঘর সাজিয়ে বর-কনেকে এনে তুললাম কলাভবনে আমাদেরই বসে আঁকবার সেই ছোট্ট বাড়িটিতে। তখন গ্রীষ্মাবকাশে আশ্রম ছুটি, কলাভবনের কাজও বন্ধ। সুরেনদা হুটুদি এই বাড়িতেই প্রথম সংসার পাতলেন। গুরুদেব তাঁদের নতুন সংসার দেখতে এলেন, ইচ্ছে প্রকাশ করলেন— সুরেনদা হুটুদিকে বললেন, তোমরা এই বাড়িতেই থাকো, এইটিই তোমাদের বাড়ি হোক।

গুরুদেব দান করা সত্ত্বেও বাড়িটি নিলেন না সুরেনদা। এ যে আশ্রমের বাড়ি। সুরেনদা কাছেই একটা মাটির চৌচালা বাড়ি তুলছিলেন, গরমের ছুটির শেষে আশ্রম খুলবার আগেই সে বাড়িতে হুটুদিকে নিয়ে চলে গেলেন।

কী গভীর ভালোবাসা ছিল গুরুদেবের প্রতি সুরেনদার, আর কী গভীরতম ছিল শ্রদ্ধা।

শেষ বয়সে যখন তিনি পুত্রের কাছে থাকতে লাগলেন দুর্গাপুরে, স্থানীয় আর-এক বৃদ্ধ বন্ধু সুরেনদাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যে, রোজ আপনি একবার করে গীতা পড়ুন। সুরেনদা হেসে ধীরভাবে বলেছিলেন, আমি গুরুদেবকে ছুঁয়েছি, তাঁর কবিতা পড়েছি, আমার আর অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই।

৪

অতীত বুঝি বা শুধুই সুন্দর। যতই পিছিয়ে যাই দেখতে কোথাও যেন অসুন্দর কিছু নেই। যেন সকালের আলো মাখা সব-কিছু। না, কি, সেই বয়েসটাই ছিল তেমনি— হাসি দিয়ে ভরা। কি জানি!

শ্রীভবনে আমরা থাকি নি বেশি দিন। কিন্তু যতদিন ছিলাম— সকলে মিলে আনন্দে ছিলাম। পরে এখনকার হাসপাতালের কাছে পূর্ব দিকে শৈল বৌঠানের কাছ হতে দু বিঘা জমি কেনা হল। আমাদের নিজ বাড়ি উঠতে শুরু করে দিল। জমির দাম তখন বেশ বেড়ে গিয়েছিল, ষাট টাকা করে বিঘা।

বাড়ি উঠছে, বড়দা সপ্তাহে সপ্তাহে আসেন, আমরা তো প্রায় সারাক্ষণই সেখানে পড়ে থাকি। সুরেনদা বাড়ির প্ল্যান করে দিয়েছেন, বাড়ি গড়ার কাজেও দেখাশোনা করছেন। বীরভূমে দোতলা মাটির বাড়ি হয়, সেই নকশায় নীচে দুখানা আর উপরে একখানা ঘর। পুব-দক্ষিণ-উত্তর তিন দিকে বারান্দা। পশ্চিম দিকের বারান্দায় বাথরুম রান্নাঘর। সবই সংক্ষেপে ছোটোখাটোর মধ্যে। কাদা দিয়ে ইটের গাঁথনির দেয়াল— গায়ে বালি-সিমেন্টের পলেস্তারা। উপরে খড়ের চাল।

ইমারত লাগে না এর কাছে। মনের সুখে প্রাণের আনন্দে ছোটো ভাইকে নিয়ে আমরা দু বোনে সংসার পাতলাম। ছোটো ভাই পাঠভবনে পড়ে, আমরা কলাভবনে। তিনজনে খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে পড়ি, ক্লাস শেষে ফিরে এসে রান্না করি, ক্লাস করি; দিনান্তে লণ্ঠনের আলোয় রাত্রের খাবার ব্যবস্থা দেখি। নিজেরাই সব কাজ করি। দিক-দিগন্ত খোলা, আমাদের বাড়ির পরে বাড়ি নেই আর কারো। ভয়-ডরও নেই কোথাও। দরজা-জানলা খোলা রেখেই চলে যাই, নিশ্চিন্তে এসে ঘরে ঢুকি।

কিছুদিন পরে মা চলে এলেন দেশ থেকে। এবারে আমাদের পুরোপুরি সংসার। সংসারের কাজ, ছবি আঁকার কাজ— ঘর-বাহির সব একসুরে বাঁধা। ঠেকছে না কোনো-কিছুতে। সমবয়সী সবাই সঙ্গীসাথী। হেসে-খেলে দিন যায়।

একদিন কলাভবন শেষে দু বোনে বাড়ি ফিরছি, শ্রীভবনের পাশ দিয়ে আসছি দু বোনে কলকল করতে করতে— একটি মেয়ে এগিয়ে এসে বলল, এই বুড়ি, তোর তো বিয়ে। আমার দিদির ডাক নাম বুড়ি।

রসিকতা ভেবে দু বোনেই হেসে উঠি। আরো এগিয়ে চলি। আর-একটি মেয়ে এসে বলে, তোর যে বিয়ে বুড়ি। এমনিতরো চার-পাঁচ জন বলার পর যখন বয়স্কা একজন মাসিমা বললেন, হ্যাঁ, তোমার তো বিয়ে, গৌরবাবুর সঙ্গে— তখন দিদি চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কেঁদে ফেলল। জানি না, কিছু না, মনভরা হাসিখুশি নিয়ে আছি, হঠাৎ শুনি বিয়ে। দিদিকে থামাতে পারি না, কেঁদে

কেঁদেই পথ চলছে। বাড়িতে মা নেই, বড়দা তাঁকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেছেন। হাসপাতাল পেরিয়ে আমাদের বাড়ি, দিদিকে কাঁদতে দেখে অক্ষয়দা এগিয়ে এলেন, বললেন, কি বুড়ি, কি রানী, কি হয়েছে তোমাদের ?

এই হাসপাতালটি সবে তৈরি হয়েছে। অক্ষয়দা হাসপাতালে ঔষধাদি দিতেন, রোগী ছেলেদের সেবাযত্ন করতেন। স্বেচ্ছায় তিনি এ কাজে এসেছিলেন। চিরকুমার। নন্দদা অক্ষয়দা আর তেজেশদা— এঁরা তিনজনে ছিলেন তিন বন্ধু। রোজ বিকেলে একসঙ্গে মিলিত হতেন, চা খেতেন, গল্প করতেন, কিছুক্ষণ কাটিয়ে যে যার বাড়ি ফিরতেন। মিলতেন তেজেশদার বাড়িতেই— তাঁর বিখ্যাত তালধ্বজে। এক-একদিন তিনজনে আশ্রম ঘুরে ঘুরেও বেড়াতেন— একসঙ্গে। এঁদের পরস্পরের একটা করে ডাক নামও ছিল। অক্ষয়দার ছিল বড়ো একজোড়া গোঁফ, নন্দদা আর তেজেশদা মিলে তাঁর নাম দিয়েছিলেন— 'গুঁফো'। নন্দদার রঙ কালো, তেজেশদা অক্ষয়দা তাঁকে ডাকতেন 'কেলো' বলে। আর ছোটোখাটো স্থূল মানুষটি তেজেশদার নাম ছিল 'বেঁটে'। এঁদের মধ্যে খুব ভাব ছিল। কি নিয়ে যে তাঁরা একে অন্যকে দেখে হাসতেন অত— তাঁদের হাসি দেখে আমরা হেসে মরতাম। বিশেষ করে গোঁফের পাশে ভাঁজ ফেলে অক্ষয়দা যখন হাসতেন— নন্দদার সাদা দাঁত হাসিতে ঝিক্‌মিক্ করতে থাকত।

তেজেশদার ছিল বাগানের শখ, পাখির শখ। নন্দদা তাঁকে আচমকা বলতেন, ঐ দেখ কেমন নতুন পাখি একটা ডালে এসে বসেছে। তেজেশদা অমনি গাছের তলায় গিয়ে হুমড়ি খেয়ে আকাশের দিকে মুখ করে পাতার আড়ালের পাখি খুঁজে মরতেন। কেলো গুঁফো হেসে উঠতেন। তিনটি বয়স্ক বালকের এই খেলা কত কতবার দেখেছি।

অক্ষয়দা পরে গান্ধীজির সঙ্গে লবণ আইন অমান্যে যোগ দিয়েছিলেন। জেলে গিয়েছিলেন।

এই অক্ষয়দারও খুব মমতা ছিল সবার প্রতি, স্নেহভরা অন্তর ছিল তাঁর। অক্ষয়দা দিদিকে প্রবোধ দিতে দিতে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত এলেন। দিদি কেবল বলেন— আমার নাকি বিয়ে, বলেন আর কাঁদেন। কান্না থামে না। দিদির বিয়ের কথাটা অক্ষয়দাও জানেন, আশ্রমের সবাই জানে। জানি না শুধু আমরা দুজন। এ কথা পরে শুনেছি।

প্রস্তাবটা প্রথম কোথা থেকে কি করে উঠেছে, কি জানি। শুধু জানি গুরুদেব

রথীদা, সুরেনদা, মা ও বড়দা— সবারই পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে স্থির হয়েছে এই বিবাহ, এবং এই কারণেই বড়দা মাকে নিয়ে কলকাতায় গেছেন, অর্থাৎ বিবাহের নানা সামগ্রী কেনাকাটা করতে।

দিদির কান্না না থামাতে পেরে অক্ষয়দা নিরুপায় হয়ে পড়েন। শেষে বললেন, এক কাজ করো, তোমরা গুরুদেবের কাছে চলে যাও, গিয়ে তাঁকে বলো সব।

রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া সব রইল পড়ে। দুবোনে গেলাম সোজা গুরুদেবের কাছে। প্রণাম করে দিদি সেখানে বসেই কাঁদতে লাগলেন। গুরুদেব দিদির মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করলেন। বললেন, তোকে জানানো হয় নি এ বড়ো অন্যায় মুকুলের। গোরা বড়ো ভালো ছেলে রে, তার সঙ্গে বিয়ে হলে সুখীই হবি। সে আমার খুবই প্রিয়।

গুরুদেবের কাছে গৌরদার সুখ্যাতি শুনে দিদির কান্না থামল। বোধ হয় একটা ভয় হয়েছিল অকস্মাৎ এ ভাবে খবরটা শুনে— সেই ভয়ও কাটল। বোঠান আমাদের খুব খাইয়ে দিলেন। বললেন, সাত বছরের ফুটফুটে ছেলেটি এসেছিল এখানে— কী রঙ— ওর রঙ দেখেই ওকে আমরা 'গোরা' বলে ডাকতে শুরু করলাম, এখনো ঐ নামেই ডাকি। শুনে দু বোনে খিলখিল করে হেসে উঠলাম— গৌরদাকে আমরা দেখেছি, রোদে-পোড়া তামাটে রঙ মুখের। ঐ নাকি আবার 'গোরা'।

অক্ষয়দা আমাদের গুরুদেবের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে অবধি একটা ব্যাকুলতা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন পথের দিকে তাকিয়ে। দূর থেকে আমাদের চলার ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারলেন মনের ভঙ্গি। তিনি এগিয়ে এলেন, তাঁর গোঁফ জোড়ার দু পাশে ভাঁজ পড়ল, আমরাও হেসে উঠলাম।

বড়দা মা ফিরে এলেন। বিয়ের তোড়জোড় হতে লাগল। হাতে সময় কম। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। গৌরদা সুরেনদা অভিন্নহৃদয় বন্ধু। গৌরদা তখন শ্রীনিকেতনের সচিব, শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতনের মিলিত এই বিবাহ-উৎসব। দু দল ভাগাভাগি হয়ে গেল, সুরেনদা এদিকটায় খানিকটা গুছিয়ে দিয়ে গেলেন ওদিকটা গোছাতে। বোঠান, কমল বোঠান ওঁরা চলে গেলেন বরপক্ষে।

সুরেনদারই ব্যবস্থা সব; বিয়ের দিন সকালে তত্ত্ব এল বরের বাড়ি থেকে। সাঁওতাল মেয়ের মস্ত এক দল, পরনে সবার বাসন্তী রঙে ছোপানো শাড়ি, তেল চকচকে মুখে গায়ে ঝকঝকে রুপোর গহনা। খোঁপায় লাল জবা, তত্ত্বের থালা কাঁধে তুলে নিয়ে আসছে সারি বেঁধে— সকালের আলো পড়েছে তাদের বেশে বাসে,

দিনের আলো যেন ঝিলিক হানছে পথ জুড়ে।

সন্ধেয় এলেন বর। দিদির ভালো নাম অন্নপূর্ণা। রথীদা সুরেনদা বন্ধুর দল, বোঠানরা— সবাই ভাবলেন অন্নপূর্ণাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে কে, না, শিবশংকর। শিব যাবেন কিসে, না, ষাঁড়ে চেপে।

শ্রীনিকেতনের ডেয়ারি হতে বাছাই করা বিরাট দুই ষাঁড়কে মালায় রঙে কাঁচ বসানো কাঠিওয়ারি বস্ত্রে— সাজে অলংকারে সাজানো হল। খোলা এক গোরুর গাড়িতে গদি তাকিয়া ঝালর সুজনী দিয়ে মনোরম এক ফরাশ করা হল। গাড়ির চাকায় রঙবেরঙের নক্‌শা। কলাভবনের দল নিয়ে সুরেনদা সাজিয়েছেন সব, এ যেন এক ছাদ-খোলা রথ, অপরূপ দেখতে।

গৌরদা বন্ধুবর্গ নিয়ে সেই রথে বসে রওনা হলেন বিয়ের আসরে। মাথার উপরে ছত্র ধরে আছে একজন। রথের দুপাশে সাঁওতাল যুবকের দল বাসন্তী রঙের ধুতি পাগড়িতে সেজে বাঁশি কাঁসর মাদল বাজিয়ে চলেছে। সাঁওতাল মেয়ের দল আগে আগে নাচছে। কলাভবনের দল, নন্দদা— সবাই সেদিন বরযাত্রী, হেঁটে হেঁটে চলেছেন বরের সঙ্গে।

বর আসছে, বর আসছে— আমরাও ছুটে চলেছি সেই 'চলন' দেখতে। মুহূর্তে বরপক্ষ কন্যাপক্ষ কখন একসঙ্গে মিলে গেল সেই 'চলনে'— কনের বাড়ি খালি হয়ে গেল।

কালীবাড়ির পাশে পুকুরের পাড় ধরে শ্মশান পেরিয়ে আমবাগান পিছনে ফেলে দু দিকের খোলা মাঠ পেরিয়ে শান্তিনিকেতন— কতটুকুই বা পথ; কিন্তু আসতে লাগল অনেকখানি সময়। পথটুকু যেন শেষ করতে চায় না 'চলনে'র দল। কলাভবনের দলও গান জুড়ে দিয়েছে, নিশিকান্ত নাচছে আর সঙ্গে সঙ্গে গান বাঁধছে, ছেলের দল দোহার ধরেছে। গাইয়ে নিশিকান্ত যা যখন মনে আসছে গেয়ে যাচ্ছে। নিশিকান্ত গাইছে—

ওই আমাদের দাদা মুকুল
ওই আমাদের দাদা মুকুল॥
দাদা বন্দুকখানা ঘাড়ে নিয়ে
পাক-পাখালি মারেন গিয়ে
তিনি ঘুঘু দেখেছেন ফাঁদ দেখেন নি
এমনি তার হয়েছে ভুল।

কালীমায়ের পুজো দিয়ে
আজ মুকুলদা'র বোনের বিয়ে
মায়ের প্রসাদ পাবার জন্য
আমরা সবাই হলেম আকুল—
ঐ আমাদের দাদা মুকুল ॥
বর সেজেছেন গৌর দাদা
তাঁর দুই পায়ে দুই পাউরুটি বাঁধা
আনন্দে তাঁর মন মশগুল
ঐ আমাদের দাদা মুকুল ॥

গৌরদা এক সময়ে মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন ছিলেন, পায়ের মাসলগুলি ফোলা ফোলা ছিল— সঙ্গে সঙ্গে নিশিকান্তর মনে পাউরুটির উপমা এল। এক-একটা ছড়া গাইছে আর ছেলেবুড়ো সবাই হেসে উঠছে— দোহারয়া সুর ধরে রাখছে— ঐ আমাদের দাদা মুকুল— ঐ আমাদের দাদা মুকুল। সারা পথ চলল এই গান— সে এক মস্ত লম্বা গান।

কয়েক বছর আগে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর পর পণ্ডিচেরিতে আবার যখন দেখা হল নিশিকান্তর সঙ্গে সে ভোলে নি এই গানের কথা। সে-ই বরং মনে পড়িয়ে দিল। বলল, রানী, মনে আছে গান বেঁধে গাইতে গাইতে আসছিলাম আমরা?

বলেছিলাম, বলো তো গানের কথা কয়টা? বলল, আর তো মনে নেই— এই কয়টাই মাত্র মনে আসছে।

দিদি গৌরদার বিয়ে হয়ে গেল। অগণিত লোক এল খেল। হিসাব ছিল না কোনো-কিছুর তার। এ যেন নিমন্ত্রিত বলে আলাদা কেউ নয়, সবাই আপন লোক। নিজেরাই পরিবেশন করছে, নিজেরাই দলে দলে বসে যাচ্ছে।

পর দিন শিব ফিরে গেলেন শঙ্করীকে নিয়ে নিজ আবাসভূমে— শ্রীনিকেতনে। আমরাও গেলাম সঙ্গে।

কমল বোঠান বধূবরণ করবেন, বরণডালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আঙিনায়। গৌরদার মা নেই। পিতাও স্বর্গত বহু বৎসর।

বর-কনে গাড়ি থেকে নামতেই একটা চওড়া লালপেড়ে শাড়ি-পরা ঘোমটায় মুখ-ঢাকা আলুদা বরণকুলো হাতে নিয়ে গৌরদার মা সেজে ঘিয়ের প্রদীপ দিয়ে নববধূর মুখখানা দেখে নিলেন সর্ব প্রথমে বোঠানদের ভিড় ঠেলে। সানাই ব্যাণ্ড

চাপা পড়ে গেল হাসির হুল্লোড়ে।

বোঠান, সুধীরা বৌদি, মীরাদি, কমলবোঠান, টুটুদি— পঞ্চ এয়োস্ত্রী এগিয়ে এলেন। নববধূকে বরণ করে ঘরে তুললেন।

ফুলশয্যার রাত্রে এই পঞ্চ এয়োস্ত্রী কেউ বাড়ি ফেরেন নি, সারা রাত জেগে রইলেন গৌরদার ঘরে আড়ি পাতবার চেষ্টায়। পরে এ নিয়ে তাঁদের হাসাহাসি করতে শুনেছি।

এঁরাও কত মজা করতেন আশ্রমে। কিছু-না-কিছু সর্বদাই তাঁদের মাথায় ঘুরত। গল্প শুনেছি তাঁদের মুখেই— সুধীরা বৌদি হাসতেন আর বলতেন।

তখন শ্রীভবন হয় নি, মেয়েদের হোস্টেল ছিল দ্বারিকে। জনাকয়েক মেয়ে নিয়ে হেমবালাদি থাকেন সেখানে। একদিন বোঠানদের শখ হল হেমবালাদিকে ভয় দেখাবেন। কমলবোঠান ছিলেন গোলগাল পুরুষ্টু মহিলা, সুধীরা বৌদি ছিলেন লম্বা বলিষ্ঠ গঠনের। মীরাদি, বোঠানও ছিলেন দলে। গোপন পরামর্শ অনুযায়ী এক অন্ধকার রাত্রে গোঁফ গালপাট্টা পাগড়ি পাঞ্জাবি দিয়ে সাজিয়ে দিলেন নন্দদা এঁদের। হাতে দিলেন বাঁশের লম্বা লাঠি। তখনকার দিনে দরজা জানালা সবই খোলা থাকত। আর জানালায় শিক বলে থাকত না কিছুই। মালকোঁচা-মারা বোঠানরা গভীর রাত্রে গিয়ে উঠলেন দোতলায় দ্বারিকে, মেঝেতে লাঠি ঠুকে একটু হুংকার মতোও দিলেন। নিজেদের ব্যাপারে নিজেরাই হাসি সামলাতে পারেন না, তা হুংকার আর কত জোরে দেবেন? তাইতেই মেয়েরা জেগে উঠে হাঁউমাঁউ চীৎকার করে উঠল, হেমবালাদিও জেগে উঠলেন। ডাকাতরা সব তখন উধাও। দিনুদা থাকেন দেহলির নীচের তলার ঘরে। তিনিই দ্বারিকের সব চেয়ে নিকটে। হেমবালাদি 'ও দিনুবাবু— ও দিনুবাবু' বলে চীৎকার করে ডাকতে ডাকতে রাস্তার উপরে এসে দাঁড়ালেন। আগে হতেই এঁদের সবাইকে জানিয়ে রাখা হয়েছিল, দিনুবাবু যতটা পারছেন সাড়া দিতে দেরি করছেন। শেষে যেন এইমাত্র ঘুম ভাঙল এমনি ভান করে গলাখাকারি দিয়ে বাইরে এলেন— কী কী, কী হয়েছে? কোথায় গেল ডাকাতরা? খুব যেন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

উৎকণ্ঠিত হেমবালাদির দিনুদাকে ডাকার দৃশ্যটাই হয়েছিল বোঠানদের উপভোগের ব্যাপার।

আশ্রমে নিজেদের মধ্যে এই রকম কৌতুক মাঝে মাঝেই হত।

শ্রীনিকেতনের কাজ তখন বেশ চালু হয়েছে। কর্মীরাও ওখানে অনেকে বসবাস করছেন। তখন এখানে ব্যাঙ্ক ছিল না কোনো। কলকাতা হতে মাসান্তে টাকা নিয়ে আসা হয় কর্মীদের মাহিনা খরচ-খরচা ইত্যাদি বাবদ। কালীমোহন ঘোষ মশায় কলকাতা গেলেন, টাকা নিয়ে সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরবেন। এখন শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতন পথের দু ধারে পর পর বাড়ি, ঘর। তখন ছিল শুধু ধূ ধূ মাঠ। মাঠের পরে ছিল সুরুলের জমিদারদের আমবাগান। তার পরে ছিল শ্মশান, একেবারে রাস্তার ধারে। শ্মশান পেরিয়ে কালী সায়রের ধার দিয়ে বহু পুরাতন তেঁতুল গাছটার তলায় অনেক কালের প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির, মন্দির বলতে খুব ছোট্ট একটি ঘর। ঘরটা দেখা যাবার আগেই চোখে পড়ে ঘরের সামনের হাড়িকাঠটা। দুপুরবেলা বুকটা ধক্‌ধক্ করে ওঠে— দু জন তিন জন এক-সঙ্গে পথ চলতেও। অনেকে বলত এ ডাকাতদের কালী। তার পরে শ্রীনিকেতন।

ধূ ধূ মাঠ, আমবাগানের ঘন অন্ধকার, শ্মশান, মন্দির— সবটাতেই একটা গা-ছমছমে ভাব। এই আমবাগানে দিনের বেলা এসেছি দু-একদিন, নন্দদা আমাদের নিয়ে বেড়াতে এসেছেন। একটা আমগাছের গুঁড়ির কাছে ছিল অনেকখানি কাঠের অংশ গোল হয়ে এগিয়ে আসা। যেন ঠেলেঠুলে বেরিয়ে পড়েছে খানিকটা মাংস গাছটা হতে। নন্দদা বলতেন, এটা কি জানো ? এটা জগদানন্দবাবুর ভুঁড়ি।

জগদানন্দ রায় মশায় আগে গুরুদেবের জমিদারিতে ছিলেন, বেশ গোলগাল নাদুসনুদুস। এখানে এসে রোগা হয়ে গেলেন, ভুঁড়ি মিলিয়ে গেল। নন্দদারা বলতেন, এই আমগাছে তিনি ভুঁড়িটা রেখে দিয়েছিলেন। সেই হতে এই গুঁড়িটার নামকরণই হয়ে রইল— জগদানন্দবাবুর ভুঁড়ি। কয়েক বছর আগেও দেখেছি এটা, আর নন্দদার সেদিনের মুখের চাপা হাসি চোখে ভেসেছে। এখনো তা আছে কি না কি জানি।

এই শ্রীনিকেতনের পথে দিনে যদিও-বা চলা যায়, রাত্রে যাওয়া-আসা করা ডাকাবুকো লোকের কাজ। কালীমোহন ঘোষ মশায় আসছেন আজ সারা মাসের টাকা নিয়ে, চার-পাঁচশো টাকা, তখনকার দিনে এ প্রচুর টাকা। এত টাকা সঙ্গে থাকে, তাই এই দিনটিতে পায়ে হেঁটে যান না এ পথে তিনি। ঝরঝরে একটা মোটর গাড়ি ছিল আশ্রমের, অনঙ্গবাবু চালাতেন— আমরা বলতাম অনঙ্গকাকা। এই গাড়িটা যত না দ্রুত চলত ডাক ছাড়ত তার বেশি।

স্টেশন থেকে এই মোটরে করে আসছেন কালীমোহন ঘোষ মশায়। কোমরের

পট্টিতে টাকা শক্ত করে বাঁধা। স্টেশন থেকে সোজা যাবেন শ্রীনিকেতনে, টাকা রাখবেন সিন্দুকে, তবে শান্তি তাঁর। এ দিন রাত্রে আর বাড়ি ফেরেন না তিনি। শ্রীনিকেতনেই থেকে যান।

মোটর আসছে প্রচণ্ড আওয়াজ করতে করতে আর লাফাতে লাফাতে। আমবাগানের কাছে এসে পড়েছে গাড়ি, এমন সময়ে হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে একদল ডাকাত পড়ল লাঠি-সোঁটা হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে— পথ আগলে। অনঙ্গকাকা গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলে 'ওরে মা রে বাবা রে' বলে দে ছুট। গাড়িতে বসে মার খাবেন— কালীমোহন ঘোষ মশায়ও নেমে পড়লেন পথে। ডাকাতরা তাঁকে ঘিরে তাঁর কোমরের পট্টিটা খুঁজতে লাগল। মুখ সবার কালো কাপড়ে বাঁধা। পরে কালীমোহন ঘোষ মশায়ের নিজের মুখে শুনেছি গল্প, তিনি বলেছিলেন, আমিও তখন মরিয়া হয়ে গেলাম, হাত বাড়িয়ে হাতের কাছের ডাকাতটার চুল মুঠি চেপে ধরলাম। ধরেই কেমন যেন মনে হল, এ তো তেল চুকচুকে চিটেধরা চুল নয়। এ যে বেশ ফুরফুরে চুল। এ কথা মনে হতেই আরো অনেক কিছু মনে হয়ে গেল। চুল ছেড়ে দিয়ে হো হো করে হেসে উঠলাম।

মাসোজি সরোজদা— ওঁদের দলও হেসে উঠলেন। নিস্তব্ধ আমবাগান সেই হাসির ধ্বনিতে ধ্বনিত হয়ে উঠল। অনঙ্গকাকা হাসতে হাসতে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে আগে থেকেই সব শিখিয়ে রাখা হয়েছিল— নিখুঁত পার্ট তিনি করেছিলেন।

সব শুনে গুরুদেব বলেছিলেন, বাঙালকে ঠকানো কি এতই সোজা? সেদিন এক লেখক এলেন পূজাসংখ্যার জন্য লেখা নিতে। নতুন আর কী লিখব— এই লেখারই গোড়ার দিকটা পড়ে শোনাচ্ছিলাম। শুনতে শুনতে সাহিত্যিক অবাক হয়ে বলে উঠলেন— আপনারা তো বেশ সাধারণ মানুষের মতোই জীবন কাটাতেন।

সাধারণ মানুষই তো ছিলাম আমরা। সাধারণ সুখ-দুঃখ নিয়েই ছিলাম। সাধারণ ঘরকন্না — সবই ছিল আমাদের অন্য সবার মতো। অসাধারণ ছিল শুধু আমাদের প্রাণের অফুরন্ত উল্লাস, আর মনের সুগভীর আনন্দ। কখনো একটু এদিক ওদিক হত না কি? হত। তবে তা আর কতটুকু সময় থাকত— ঘূর্ণি হাওয়া মাটিতে দুপাক আছড়ে ঘুরে উপরে উঠে মিলিয়ে যেত।

বাতিকের কাজ সুরেনদাই এনেছিলেন এ দেশে। গুরুদেবের সঙ্গে সুরেনদাও গিয়েছিলেন জাভায়। জাভার বাতিকশিল্প নাম করা। গুরুদেব চাইলেন আশ্রমে এ শিল্পের প্রচার হোক। তাঁর ইচ্ছায় সুরেনদা জাভার বাতিক যতটা পারলেন দেখলেন, শিখলেন। দেশে ফিরে আসবার সময়ে বাতিক করার সাজসরঞ্জাম, নমুনা, বই সব সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। সেই প্রথম এখানে বাতিকের কাজ শুরু হল। পরে গোটা ভারতে আজ তা ছড়িয়ে গেল।

সুরেনদা এনেছিলেন বাতিক, আর রথীদা বোঠান এনেছিলেন বিদেশ থেকে চামড়ার কাজ, পিতলের পাত আর পিউটার পাতের কাজ। একবার স্বামী-স্ত্রী বিদেশে কিছুদিন থেকে এই ক্রাফ্‌ট্ অতি যত্নের সঙ্গে শিখে এসেছিলেন। উত্তরায়ণের জাপানিঘরের লাগা দক্ষিণের বারান্দায় বোঠান রথীদা আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে চালু করলেন এই কাজ। বারান্দার একদিকে পিউটার পাতে পিতলের পাতে এম্‌বস্ করে নানা নক্‌শা তুলে কাঠের বাক্সে বসাই। বোঠান দেখিয়ে দেন এই কাজ, নিজেও করেন। বারান্দার অন্য প্রান্তে রথীদা 'লেদার ওয়ার্ক' করেন, আমাদেরও শেখান। চামড়ার টুকরো ছড়াছড়ি যায় সেই কোণটা জুড়ে। চামড়া কাটা থেকে নক্‌শা তোলা, রঙ করা, সেলাই সবটাই নিজের হাতে করি। কোনোমতে তিন ভাঁজের একটা হাত ব্যাগ মোটা মোটা সেলাই দেওয়া, বড়ো জোর একটা টিপের বোতাম— এই-ই হয়ে যায় যদি— আনন্দে লাফিয়ে উঠি। চামড়ায় এতটুকু রঙ লাগাতে পুরো হাত রঙে মাখামাখি হয়ে যায়, এ রঙ সাবানে ওঠে না— দিনে দিনে নানা কাজে হাল্‌কা হয় এক সময়ে। তার জন্য অসুবিধা ছিল না কোনো। বরং সেই রঙমাখা আঙুলগুলোই একটা মর্যাদার স্থান পেত, আমরা যে 'লেদার ওয়ার্ক' করছি।

রথীদা বোঠান বিদেশে থেকে এ কাজ শিখে এসেছিলেন কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে যেটুকু পারেন সেটুকু শিখে চলে আসতে হয়েছিল তাঁদের। তাই যেটুকু শিখেছিলেন, দেশে ফিরে এসে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি নানা ভাবে পরীক্ষা করে তবে শিখেছেন। তাঁর সেই নানা পরীক্ষা— নানা সফল-নিষ্ফল ফলাফল— বারে বারে দেখেছি। আজ এই লেদার ওয়ার্ক কত সম্মানের স্থান করে নিয়েছে দেশে। বিদেশ থেকে রাশি রাশি টাকার অর্ডার আসে ভারতে, দিল্লিতে থাকতে দেখেছি। একদিন আমরা বারো ইঞ্চি বাই ছয় ইঞ্চি ভাঁজ-করা

একটা লেডিজ হ্যাণ্ড ব্যাগ বানাতে হিমসিম খেয়ে যেতাম, আর সেই চামড়ার কাজের আজ ছড়াছড়ি দেশে। কী না হয় চামড়ায়? দেখে বড়ো আনন্দ হয়। একটা ভালো— রথীদা বোঠান বেঁচে থাকতেই দেখে গেছেন যে ভারতময় ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন তাঁরা এ কাজ। এটা আরো ভালো লাগে— যেখানে যাঁরা যত এই কাজ করছেন— নাম কিন্তু এক— 'শান্তিনিকেতনী ব্যাগ' 'শান্তিনিকেতনী জুতো'— সবই 'শান্তিনিকেতন' ছাপমারা। এই কবছর আগের কথা বলি, জাপান থেকে অর্ডার এসেছে— লক্ষ জোড়া শান্তিনিকেতনী জুতো চাই। দিল্লির এক বড়ো ব্যবসায়ী— অর্ডার নিতে ইতস্তত করছিলেন, 'হস্তশিল্প' নিয়ে কথা, সময় মতো এতগুলি সাপ্লাই করতে পারবেন কি না।

বোঠান সেবার পটারির কাজও করিয়েছেন আমাদের দিয়ে। বিদেশের নামকরা কত শিল্পী এই পটারি শিল্পে বিখ্যাত। নতুন রকম চাকা এনেছেন বোঠান, কুমোরের চাকার মতো বসে বসে কাঠি দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চালাতে হয় না। টেবিল-সমান উঁচু— যেন একটা টেবিলে বসানো চাকাটি, পায়ের তলায় প্যাডল করবার মতো ব্যবস্থা, খানিক প্যাডল করে ছেড়ে দিলেই চাকা আপনিই কিছুক্ষণ ঘুরতে থাকে। সেই সময়ে মাটির মুখ চেপে বড়ো বড়ো 'ভাস' করে ফেললেন বোঠান কয়েকটা কয়েক মুহূর্তে। সে এক ম্যাজিক! এ কাজে একবার হাত লাগালে আর ছাড়তে মন চায় না। একটা হয়ে যায় তো আর-একটার জন্য দুহাতের আঙুল আপনা হতে মাটি চেপে ধরে।

চামড়ার কাজের মতো বাতিক-এর কাজও আজ সারা ভারতে ছড়িয়ে আছে। বিভুঁয়ে এসে এরা কিন্তু জন্ম নিয়েছিল এই শান্তিনিকেতনেই। সযত্নে তাদের পালন করে, বড়ো করে, নিখুঁত করে এনে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ভারত বিজয় করতে। সে উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে সফল আজ।

বাতিকের সরঞ্জাম তো এল। নন্দদা সুরেনদা কলাভবনে আমাদের নিয়ে বসলেন। আগুনে বাটিভরা মোম রজন মাপ মতো গলানো হল। কাঠের সরু একটা হাতলের ডগায় গোল ছোট্ট বাটির মতো তামার চামচ লাগানো, চামচের সামনের দিকে বাঁকানো খুব সরু একটুখানি নল। জাভায় এই দিয়ে বাতিকের কাজ করে। চামচটা গরম মোমে ডুবিয়ে এক বাটি মোম তুলে নেয়, সরু নল দিয়ে গরম মোমটা পড়ে। ঐ পড়ার মুখে নকশা করে যেতে হয় কাপড়ের উপরে। সুরেনদা কয়েকটা এই চামচ এনেছেন সঙ্গে করে। আমরা চামচে করে

গরম মোম তুলে কাপড়ের উপরে ধরি, হুড় হুড় করে গরম মোম সবটা গড়িয়ে পড়ে— বড়ো বড়ো নানা আকারের ফোঁটায় ছেয়ে যায় যত্নে করা শখের ডিজাইন। কিছুতে পারি না গরম গলা মোম অনভ্যস্ত হাতে সামলাতে। পরনের শাড়িখানাতেও মোম মাখামাখি হয়ে যায়।

জাভার লোকের কায়দা আলাদা। বংশানুক্রমে তারা করে আসছে এই কাজ। তাদের হাতে বশে থাকে এই চামচ।

কয়েক বছর পরের ঘটনা— প্রহস্ত বলে একটি জাভানী ছেলে এসেছিল শিক্ষাভবনে। কী সুন্দর সূক্ষ্মকাজ ভরা বাতিকের লুঙ্গি পরত সে। বলত, ঠিক এমনটি কিনতে পাবে না আমাদের দেশেও। কারণ আমাদের মা-ঠাকুরমারা করেন লুঙ্গি আমাদের পরবার জন্য। বিক্রির জন্য নয়। তাদের কাজই হল বাড়ির সকলের জন্য লুঙ্গি করা। তার কাছেই শুনেছিলাম— লুঙ্গির কাপড়টা কতদিন রেড়ির তেলে ডুবিয়ে রাখে, তার পর কাপড়টা পিটিয়ে পিটিয়ে এমন মসৃণ বানায় যে, হাতির দাঁতের মতো 'সারফেস' হয়। তার উপরে চামচ চলে জলের উপরে তেল ভাসার মতো— স্বচ্ছন্দ গতিতে। বলি, আর এই যে চুলের মতো সরু সরু লাইন— সূঁচের ডগার মতো ছোটো ছোটো মুক্তোর সারি, এই অতি সূক্ষ্ম জায়গাগুলি কি করে করেছে। প্রহস্ত হাসে। বলে, এগুলি নরুন দিয়ে খুঁটে খুঁটে মোম তুলে দিয়ে করা।

সে তো হল, এ জ্ঞান তো অনেক পরে পেলাম। আগে পেলেও সুবিধে হত না বিশেষ। কারণ চামচ কিছুতেই আমাদের ইচ্ছেয় চলে না, চলে পূর্ণমাত্রায় তার স্বইচ্ছায়।

নন্দদা এটা-সেটা করে শেষে একদিন গরম মোমে ছবি আঁকার তুলি ডুবিয়ে তুলিতে গরম মোম নিয়ে কাপড়ের উপরে নকশায় দিলেন। মোম নক্‌শার উপরে স্থির হয়ে রইল, বাইরে গড়িয়ে গেল না।

সেই হতে তুলি দিয়েই বাতিকের কাজ চলে আসছে আজও এ দেশে। জাভায় করে শুধু লংক্লথের উপরে বাতিকের কাজ, এখানে সিল্কের উপরেও বাতিকের কাজ চলল। বাতিকের কাজ চামড়ার উপরেও চলল— তার পদ্ধতি একটু অন্য রকম। গরম মোমের বদলে ঘন গঁদের ব্যবহার চামড়ার উপরে।

শুধু মোম দেওয়াই বাতিকের শেষ কাজ নয়। মোম দেবার পর আছে কাপড় রঙ করা। ঠাণ্ডা রঙে কাপড় ডোবাতে হয়— আবার রঙটাও হওয়া চাই পাকা

রঙ। তখন জার্মানি থেকে আসত একটা রঙ— নেপ্‌থল রঙ। তিনটি 'শেড'ই পাওয়া যেত— ইয়োলো, ব্রাউন আর ইনডিগো। রঙের মাপ পরিমাপ নিয়ে কত-না বাতিক নষ্ট হয়েছে। ফুটন্ত জলে ধুয়ে ধুয়ে মোম তুলে তবে শেষ ফলাফল জানা যেত— কোন্‌টা গেল, কোন্‌টা উতরোলো। এতক্ষণ অবশ্যি সব থাকত অন্ধকারে। কতবার আমরা ঐ নিয়ে কত বেদনা পেয়েছি, কতবার মনকে সান্ত্বনা দিয়েছি— আবার কতবার খুশিতে উপচে উঠেছি। তার পর যার যার ডিজাইনে আমরা বাতিকের শাড়ি চাদর করে পরেছি, গায়ে জড়িয়েছি আর আড়ে আড়ে একে অন্যকে দেখেছি— কারটা ভালো হয়েছে বেশি।

কলাভবনে প্রথম ছাত্রীর দল ছিলেন তখনকার শিক্ষকদের পত্নীরা। মেয়েরা ছবি আঁকা শিখবে, গান-বাজনা শিখবে— মেয়ে কোথায়? শিক্ষকদের পত্নীদেরই এনে কলাভবনে ঢোকানো হল। এই সেদিন উনিশশো সাতাত্তর সালের কথা, এখানকার মহিলা সমিতি 'আলাপিনা'র তরফ থেকে যখন সর্বজ্যেষ্ঠা ঠান্‌দিকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল, নব্বই বছরের ঠান্‌দির হাতে অর্ঘ্য তুলে দিলেন ঠান্‌দির এক-দু বছরের ছোটো মনোরমাদি। আলাপিনীর সকলের মনই এই অনুষ্ঠানে উৎফুল্ল। তখনকার গুরুপত্নীরা প্রায় সকলেই পূর্ববঙ্গ হতে আসা পল্লীবধূর দল। কলাভবনে তাঁরা তখন কে কী করতেন সে-সব নানা কৌতুককর ঘটনার উল্লেখে মনোরমাদি বললেন, আর, আর তাঁকে ছেড়ে দিচ্ছ কেন? প্রমোদবাবুর স্ত্রীও তো ছিলেন সেই দলে। এতখানি ঘোমটা দিয়ে উপুড় হয়ে বসে এস্রাজে ছড়ি টানতেন। বলে মনোরমাদি বুক-সমান ঘোমটা টেনে পা ছড়িয়ে বসে নিজের কোলের উপর ঝুঁকে পড়ে সেই ভঙ্গি দেখাতে গিয়ে হাসলেন যত, হাসালেন তত।

প্রমদারঞ্জন ঘোষ মশায়কে আমরা বলতাম 'মশায়জি'। আমাদের মামাবাড়ির পাশেই মশায়জির গ্রাম। সে গ্রামের বধূ মশায়জির স্ত্রী বৃদ্ধকালেও একহাত ঘোমটা দিয়ে চলাফেরা করতেন। তাঁকেও ঢুকতে হয়েছিল সেদিন কলাভবনে ছাত্রীর দলের সঙ্গে।

ঠান্‌দিকে দেখে প্রাণ আনন্দে ভরে ওঠে। কারো শোকে বিপদে ছুটে আসেন, বুক ঢেলে দেন। এখনো ঠান্‌দি ঘুরে ফিরে বেড়ান, বিবাহ উৎসব, আশ্রমের অনুষ্ঠান— কিছু বাদ দেন না তিনি। হাসিমুখ ছিমছাম দেহ; সংসারের সব-কিছু তত্ত্বাবধান করেন নিজে। লাবুদি— ঠান্‌দির মেজো কন্যা বলছিলেন একদিন, মা'র বাড়িতে যখন খাই, মা পরিবেশন না করলে পেট ভরে না যেন।

মনোরমাদিও আশ্রমের কোনো নাটক নৃত্য বাদ দেন না। এখনো সময়মত এসে শতরঞ্চি-পাতা বসবার জায়গায় ঠিক বসে পড়েন। তেমনি হাসিভরা মুখ। আজও রোজ ভোরে উঠে উঠোনে গোবর-ছড়া দিয়ে ঝাঁট দেন। বলেন, এ আমার শাশুড়ির আদেশ। শাশুড়ি বলে গেছেন, 'বৌ গো, রোজ উঠানে গোবর-ছড়া দিবা, ঝাঁট-পাট করবা— বাত, ব্যাধি কিছু ধরবো না তা হলে'।

নিরামিষ ঘরের রান্না আজও তিনি নিজের হাতে করেন। তাঁর সন্তানেরা হাসেন আর বলেন, সকাল থেকে মা'র কাজের শব্দের শেষ থাকে না। বিকেল শুরু হলে তবে শব্দ থামে, বাড়ি শান্ত হয়।

এই ঠান্‌দি, মনোরমাদি, কমলবোঠান, সুধীরা বৌদি, মীরাদি, বোঠান, মশায়জির স্ত্রী— সবাই আসতেন নিয়মিত কলাভবনে। বোঠান, সুধীরা বৌদিদের কাছেই শুনেছি এ-সব গল্প। কাজে নন্দদা সবাইকে স্বাধীনতা দিয়ে এসেছেন বরাবর। তখনো, পরেও। ঠান্‌দি মাটি মেখে ছোটো ছোটো মূর্তি গড়তেন, বোঠান ছবি আঁকতেন। বোঠান তাঁর ছোটো মামা অবনীন্দ্রনাথের কাছে আগেই ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন, তা তিনি ছাড়েন নি। আমাদের কালেও দেখেছি বোঠান বড়ো ছোটো নানা আকারের কাগজে ছবি আঁকছেন। মীরাদি সেলাই করতেন। মনোরমাদিরা সাঁজ কাটতেন। আর কমলবোঠান পানের ডাবা খুলে সবাইকে পান খাওয়াতেন, নিজেও খেতেন, আর কাজের বদলে গল্প করেই জায়গাটা জমিয়ে রাখতেন।

কমলবোঠান খুব গল্প করতে পারতেন, এ আমিও দেখেছি পরে। কমল-বোঠানের গল্প বলা নিয়ে বোঠানরা হাসাহাসি করতেন। কোনো ঘটনার প্রয়োজন হত না গল্প বলার জন্যে। গল্পের স্রোত এমনিই বয়ে যেত। কমলবোঠান গুরুদেবের কাছে রোজ এসে বসতেন। কমলবোঠানের বসা মানেই মুখ খোলা। গুরুদেব বেশ পছন্দ করতেন কমলবোঠানের কথা-বলা। কি-না বলতেন, বলেই চলতেন। বলতেন, জানো রবিকাকা, তার পরে সেই ছেলেটাকে তো খাওয়ালুম খুব, এতটা ভাত খেল। বললুম, খাওয়া তো হল, এবারে বাগানটা একটু পরিষ্কার কর্, শুক্‌নো পাতাগুলি ঝাঁটপাট দে। বলে, আমি একটু গড়িয়ে নিলুম। উঠে বেরিয়ে এসে দেখি, ওমা! ছেলেটা বারান্দায় ছায়ায় পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। উনি বললেন, থাক্ থাক্ ডেকো না, ঘুমুচ্ছে— ঘুমোক।

কমলবোঠানের দেহখানি ছিল একটু স্থূল মতন, মোটা-সোটার দিকে। গাল

ভরা থাকত পানে। পাতলা ঠোঁট। সুন্দর মুখখানি। সেই গালভরা মুখে পাতলা ঠোঁট নেড়ে, বেঁকিয়ে গল্প বলে যেতেন, সেই বলাটাই দেখতে বড়ো ভালো লাগত আমার। গুরুদেব কখনো শুনতেন, কখনো লিখতেন, কি আনমনে বাইরের দিকে চেয়ে বসে থাকতেন— কমলবোঠান বলেই চলতেন।

কমলবোঠানের কথা বলতে গিয়ে গুরুদেব একদিন বললেন, জানিস, একবার কমল আমাকে কী বিপদেই না ফেলেছিল। জোড়াসাঁকোয় আছি তখন, আমাদের বাড়ির মেয়েরা কোথায় যেন গেছে নেমন্তন্ন খেতে। আমি দুপুরবেলা বিছানায় আধশোয়া হয়ে একটা বই পড়ছি, শরীরটা তেমন সেদিন ভালো লাগছিল না। বৌমার কাছে ছিল গ্রামের একটি দুঃস্থ নিরীহ বিধবা মেয়ে— বৌমার নানা কাজে সাহায্য করত। দেখি, সে এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে। কোনো দিন তাকে দেখি নি। বাড়ির ভিতরে আড়ালে আড়ালেই থাকত। অতি সংকুচিত ভীরু ভাব। ঘরে ঢুকবে কি ঢুকবে না— বুঝতে পারছে না। বললাম, কি চাও? সে বললে, আপনার পা-দুটি একটু টিপে দেব? আহা! এইটুকু তার আকাঙ্ক্ষা। বাড়ির ভিড়ে আমার কাছে আসবার তার সাহস ছিল না, আজ নির্জন দুপুরে একটু সেবা করবার আকূতি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে দোরে। বললাম, দাও। সে অতি ভয়ে ভয়ে খাটের কাছে বসে আমার পা টিপে দিতে লাগল। তখন মনে হল এই টেপাটুকুর আমার দরকার ছিল এই সময়ে। পা-দুটো সত্যিই ব্যথা করছিল। মেয়েটির টেপায় বেশ আরাম পাচ্ছিলাম। এমনি সময়ে কমল এসে ঘরে ঢুকল, রবিকাকা, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে? বল নি কেন আমাদের? দেখো তো কি কথা। বলে, কমল ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাড়ির দুটি মেয়েকে এনে আমার পায়ের দু দিকে বসিয়ে দিল। সেই মেয়েটি ভয়ে বেদনায় ধীরে ধীরে ঘর হতে বেরিয়ে গেল। কমলের ভাবখানা রবিকাকার পা টিপবে যে-সে কেউ? রবিকাকার পায়েরও তো একটা প্রেস্টিজ আছে? এ দিকে মেয়ে দুটি যত জোরে পারছে আমার পা টিপে চলেছে। তাদের টেপার চোটে এবারে আমার পায়ে সত্যি সত্যি ব্যথা হচ্ছে। কিন্তু কমলকে বোঝাবে কে? আমি যতই বলি, এবারে বোধ হয় হয়েছে, আমার পায়ে আর ব্যথা নেই, আর বোধ হয় দরকার নেই টেপার। কিন্তু কে শোনে তা। গুরুদেব এ গল্প বলেন আর হাসেন। বলেন, এই পা টেপা নিয়েই তো সেই গল্পটা লিখি, ঐ চরিত্রটা তো কমলকে নিয়েই।

আমাদের কালে কলাভবনে প্রবীণতমা ছিলেন সুকুমারী মাসিমা। আমরা তাঁকে মাসিমা বলে ডাকতাম। তিনি মেয়েদের সেলাইয়ের ক্লাস নিতেন, নানা রকম এমব্রয়ডারি শেখাতেন। বালবিধবা মাসিমা এসেছিলেন পূর্ববঙ্গের এক গ্রাম হতে। পূর্ববঙ্গের মেয়েদের হস্তশিল্পের খ্যাতি খুব। নানা রকম হাতের কাজ জানতেন তিনি। নন্দদা তাঁকে ছবি আঁকতেও শিখিয়েছেন। মিউজিয়ামের এক ঘরে এক জানালার পাশে 'সিট' ছিল তাঁর। ওয়াশের ছবি আঁকতেন মাসিমা। ছবিতে গয়না পরাবার খুব ঝোঁক ছিল তাঁর, নানা কারুকাজ করতেন ছবির অলংকারে। মনে আছে একবার একটা রাসলীলার ছবি আঁকলেন, অনেক কৃষ্ণ অনেক গোপী। মাসিমা মন প্রাণ ঢেলে অলংকার পরালেন সকলের অঙ্গে। কাছে বসে বসে দেখতাম তাঁর কাজ।

এই মাসিমা অসুস্থ হলেন। কলাভবনের কাছাকাছি ছোটো ছোটো কয়েকটা খড়ের ছাউনির মাটির বাড়ি— ছাত্ররা থাকে। এরই একটা বাড়িতে থাকেন মাসিমা। আমরা মেয়েরা পালা করে তাঁর শুশ্রূষা করি। এই সময়েই একদিন রাত্রে আলেয়া দেখেছিলাম আমি, জীবনে সেই প্রথম। ধানখেত চলে গেছে দক্ষিণ মাঠ পেরিয়ে কয়েক মাইল। মাঝ রাত্রি, মাসিমা ঘুমোচ্ছেন। দরজা জানালা খোলাই থাকত তখনকার দিনে। ঘর হতে বারান্দা হতে সুদূর দেখা যায় নির্বিঘ্নে। দেখি দূরে ধানখেতের ভিতরে আলো চলাচল করছে— আলো এগিয়ে আসছে— দূরে চলে যাচ্ছে— ধানখেতময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেশ বড়ো আলো— লণ্ঠন বা মশাল নয়, যদিও সেই রকমই মনে হচ্ছিল। পরদিন এ কথা বলতে গিয়ে জানলাম— তা ছিল আলেয়া।

মাসিমার অসুখ বাড়াবাড়ির দিকে গড়াল। আজ রাত কাটে, কি কাল রাতে যান— এই অবস্থা। মাসিমা যন্ত্রণায় এ-পাশ ও-পাশ গড়াচ্ছেন— ভুল বকছেন। তারই মধ্যে একবার বললেন, গুরুদেবকে দেখব।

গুরুদেবের শরীর তখন ভালো ছিল না। মাসিমার কথা শুনে তক্ষুনি চলে এলেন, মাথা নিচু করে খড়ের ঘরের ছোটো দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন, মাসিমার বিছানার পাশে গিয়ে তাঁর কপালে হাত রাখলেন। মাসিমা রক্তশূন্য মুখে বড়ো বড়ো করে দুচোখ মেলে গুরুদেবের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পরদিন মাসিমার ভাইপোরা এসে মাসিমাকে কলকাতায় তাঁদের কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানেই মাসিমা ইহলোক ত্যাগ করেন।

আশ্রমে আমাদের কালেও ঘরে ঘরে ঘর ছিল আমাদের। কখনো মনে হত না আমরা গৃহছাড়া, ঘরছাড়া। ক্লাসের সময়ে কাজ করতে করতে মনে হল— খিদে পেয়েছে। যে-কোনো বাড়িতে ঢুকলেই হত, কিছু খেয়ে আবার এসে কাজে বসতাম। নন্দদার বাড়ি তো আমাদের নিজেদের বাড়িই ছিল। কত সময়ে অসময়ে সে বাড়িতে থেকেছি, খেয়েছি। স্নেহ মমতা ঢেলে দিতেন সুধীরা বোঠান। গড়নে আচরণে এমন মহিমময়ী নারী কমই দেখেছি জীবনে।

কাছাকাছি বাড়িগুলিতেই যেতাম বেশি। সহজে যাওয়াটা হয়ে যেত তাই। কলাভবনে নিচু জানালার ধারে বসে ছবি আঁকছি, মনে হল একটু খিদে খিদে মতন লাগছে যেন। তখনকার দিনে আশ্রমে কোনো বাড়িতে, ভবনে শিক থাকত না জানালায়। খিদের কথা মনে হতেই তুলিটা ধুয়ে রেখে জানালা টপকে লাল পথটুকু পার হয়ে 'মালঞ্চে' ঢুকি। মালঞ্চ মীরাদির বাড়ির নাম। মীরাদি কোনোদিন তেল-মুড়ি, কোনোদিন ডিম ভেজে দেন, খেয়ে আবার এসে জানালা টপকে নিজের 'সিটে' বসি।

এই মালঞ্চেই জীবনের একটি বড়ো শিক্ষা পেয়েছিলাম একদিন, মন্ত্রের মতো আজও আঁকড়ে আছি তা। কখনো ভুলি নি।

এই রকম একদিন খিদে নিয়ে কলাভবন থেকে গেছি মালঞ্চে। মীরাদি বাগানে দাঁড়িয়ে মালিকে দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়িয়ে হালকা করে দেওয়াচ্ছেন। সে সময়ে উত্তরায়ণে শৌখিন বাগান ছিল না কিছু। জল ছিল না প্রচুর। বাগান বলতে মালঞ্চই শুধু তখন রূপে রঙে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ফুল দেখতে পাতা দেখতে মালঞ্চে যায় লোকে। কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা স্টাডি করে ছোটো ছোটো ছায়ায় ব'সে। বাগান মীরাদির প্রাণ। একা থাকেন, এই বাগান নিয়েই মেতে আছেন দিন রাত। খুব যে অজস্র ফুল কিংবা দুর্লভ বৃক্ষ তা নয়। কিন্তু যা আছে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজানো। আমরা বাগানে ঘুরলে ভয়ে ভয়ে পা ফেলি, কি জানি কোনো কেয়ারির লাইনে পা পড়ে যাবে, কোন্ পাতাটায় আঁচলের ঘসা লাগবে। আমার স্বামী কৌতুক করে বলতেন, মীরাদির বাগানের প্রতিটি পাতা মীরাদি ধোন, মোছেন; পরে ইস্ত্রি করেন। শুনে আমরা হাসলেও দেখেছি ঝকঝক তকতক করছে মীরাদির বাগান, গাছের সবুজ পাতা। পাতায় ধুলো জমতে পারত না, সত্যি সত্যিই স্নান করাতেন গাছগুলিতে জল ছিটিয়ে।

সেদিন গিয়ে দাঁড়িয়েছি বাগানে মীরাদির পাশে, হঠাৎ মীরাদির নজর পড়ল

একটা পাতার নীচে বড়ো একটা ক্যাটারপিলার। প্রজাপতির নয়, মথেরই হবে, মথেরই ক্যাটারপিলারগুলি এত বড়ো বড়ো হয়। ডিম থেকে বাচ্চা ফুটছে, এবারে কিছুদিন পাতা খেয়ে খেয়ে পুষ্ট হয়েই গুটি বাঁধবে পাতার আড়ালে। একুশ দিনে প্রজাপতি হয়ে ফুটে বের হবে। যে গাছে প্রজাপতি ডিম পাড়ে, সেই গাছেরই পাতাগুলি খায় ক্যাটারপিলাররা। কটা পাতা আর খাবে এই ক্যাটারপিলারটা। একটা পাতা খেলেও সহ্য করবেন কি করে? মীরাদি টোকা মেরে ফেলে দিলেন ক্যাটারপিলারটাকে কাঁকরে। দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। দূরেই পড়েছে সেটা, কিন্তু উঠে আসতে কতক্ষণ? মীরাদি ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে পোকাটাকে মারলেন। তাতেও শান্তি পাচ্ছেন না। শেষে পায়ের চপ্পলটা দিয়ে ঘষে ঘষে ক্যাটারপিলারটাকে পিষে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন।

দৃশ্যটা কেমন মনে গাঁথা হয়ে গেল। পরে এই মালঞ্চই একদিন মীরাদি বিহনে দেখতে দেখতে পোড়ো হয়ে গেল। এক ধারে শতাব্দীর বট-পাকুড় ছিল কয়েকটা তল্লাট জুড়ে। ছায়া বিস্তার করত। তাও দেখলাম সেদিন কেটে সাফ করা হল।

বাগান করার শখ আমারও। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে স্বামীকে বলেছিলাম, সারাজীবন ভিড়ে ভিড়েই কাটল। অবসর যখন নেবে ভিড় হালকা হয়ে যাবে, কাজও যাবে কমে, সময় আমার অফুরন্ত মনে হবে। তখন তোমরা পিতাপুত্রে আমাকে একটি দুটি ভালো মালী রেখে দিয়ো। মনের সুখে দিন কাটিয়ে দেব। সময় পেলেন না। সে কথা রাখবার আগেই তিনি চলে গেলেন।

এখন একা আমি জিৎভূম ঘুরে ঘুরে একে-ওকে নিয়ে বাগানের পরিচর্যা করি। অভিজিৎ থাকে সুদূর আসামে। হিতৈষীরা আসেন, জানতে চান এত যে কষ্ট করছি পরে কি হবে? বলি মালঞ্চের ঘটনাটা। বলি, এ জেনেই তো করছি। মনে তাই দুঃখ নেই ভবিষ্যৎ ভেবে।

৬

আমার বিয়েও হয়ে গেল। নিজের বিয়ের গল্প কি করে বলি? এই বয়সেও সেই কুমারীর সলজ্জ সংকোচ আমাকে আড়ষ্ট করে তোলে। তবু বলতে হবে। এটা ঘটনা। এই বিবাহে প্রধান একটা প্রসঙ্গ আছে— যা ভাবলে, যা মনে হলে হৃদয় কান্নায় কান্নায় ভরে উঠত; এখনো ওঠে।

আমার স্বামী, তখনো আমার স্বামী হন নি— এ অনেক আগেকার কথা, বিদেশে শিক্ষালাভ করতে গেছেন, চিন্তা হল দেশে ফিরে গিয়ে তো সেই বৃটিশের অধীনে চাকুরি করতে হবে, এ কি করে সম্ভব ? নন কো-অপারেশনের যুগ থেকে তিনি স্বদেশীভাবাপন্ন।

এই সময়ে গুরুদেব বিদেশে গেলেন— সে দেশের আমন্ত্রণে। স্বামী এলেন গুরুদেবকে প্রণাম করতে। গুরুদেব যেমন অনেককেই বলে থাকেন, তেমনি ওঁকেও বললেন, দেখ, তোরা আমার কাজ না ধরলে কে ধরবে ?

মনস্থির করে ফেললেন। পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এলেন দেশে। এসে সোজা এলেন শান্তিনিকেতনে। রতনকুঠিতে ঘর মিলল তাঁর একখানা। সেখানে থাকেন, শিক্ষাভবনে পড়ান, আশ্রমের 'জেনারেল কিচেনে' খান। টাকা নেই নিজের হাতে, টাকা কম আশ্রমের ফণ্ডে। নিজের হাতের সোনার ঘড়ি, টাইপরাইটার-মেসিন, সোনারজলে এমবস্ করা শখের বাঁধানো শেক্‌স্‌পিয়রের সেট— একে একে বিক্রি করে খরচ চালাতে লাগলেন নিজের। মাস-ছয় চলল এই ভাবে।

গুরুদেব বললেন, এ তো হয় না। অনিল আশ্রম থেকে টাকা না নিয়ে চালাবে কতদিন ? ওর খরচটা তো অন্ততপক্ষে দিতেই হয় আমাদের।

গুরুদেবের নির্দেশে আশ্রম থেকে ওঁকে খরচ দেওয়া হতে লাগল ষাট টাকা করে। গুরুদেবের প্রাইভেট সেক্রেটারিও তিনি এই কালেই হন।

আমি তখন কলকাতায়, নানা কাজে বড়দা আমাকে আটকে রেখেছেন সেখানে।

পরে শুনেছি এ-সব ঘটনা বোঠানের কাছে। গুরুদেব একদিন রথীদা-বোঠানের কাছে তাঁর একান্তসচিবের সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব তুললেন। রথীদা-বোঠান খুবই আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

সে সময়ে নানান সুধীজন আশ্রমে আসতেন, গুরুদেব তাঁদের সঙ্গে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন ; যাঁরা কোনো বিষয়ে সাহায্য করতে ইচ্ছুক— গুরুদেব তাঁদের সে সুযোগ দিতেন।

তখন সাহেদ সুরাবর্দি আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। গুরুদেব আমাদের বিবাহের প্রস্তাব দেবার পরে দিন কয়েক বাদে সাহেদদা, হাসিম আমীর আলি আর গুরুদেবের সচিবকে নিয়ে রথীদা কলকাতায় এলেন। হাসিম আমীর আলি ছিলেন হায়দ্রাবাদ-নিবাসী— বিদেশ-প্রত্যাগত, সবে যোগ দিয়েছিলেন শ্রীনিকেতনের

কাজে। সাহেদদা আর হাসিম আমীর আলিকে শুধু রথীদা ব্যাপারটা খুলে বলেছিলেন, আর সচিবমহাশয়কে লোভ দেখিয়েছিলেন কলকাতায় একটু ঘুরে আসার জন্যে। কলকাতায় এসে খবর নিয়ে জানলেন, আমি দিদি গৌরদার সঙ্গে দিদির শ্বশুরবাড়ি চন্দননগরে বেড়াতে গেছি। রথীদা সদলবলে মোটরে চলে এলেন চন্দননগরে। গুরুদেবের সচিবকে আর-এক দফা ভুলিয়েছিলেন যে, চলো, দেখবে চলো— গঙ্গার উপরে ফরাসি চন্দননগর কত সুন্দর দেখতে।

দিদির শ্বশুরবাড়িতে সদরমহল-অন্দরমহল দুই মহল জুড়ে একটা ব্যস্ততার কলরব জাগলো। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হতে লাগল। রথীদা ইশারায় গৌরদাকে জানিয়ে দিলেন তাঁদের আসার উদ্দেশ্যটা। গৌরদা জানালেন দিদিকে। শশব্যস্ত গৌরদা অন্দরে এলেন— বললেন, রথীদারা এসেছেন। দেখা করতে চলো।

দিদি দেখছি আমার আঁচল ধরে টানছেন— শাড়িটা বদলে যাও।

কেমন যেন খটকা লাগল একটু। দিদির হাত ছাড়িয়ে বৈঠকখানায় গেলাম। রথীদা সাহেদদাকে প্রণাম করলাম। রথীদাকে দেখে বড়ো খুশি হলাম— কতদিন যেন আমি আশ্রম-ছাড়া, রথীদাকে পেয়ে যেন আশ্রমের হাওয়াতে নিশ্বাস নিলাম। অন্য দুজনকেও নমস্কার জানালাম। অন্দরে চলে এলাম।

রথীদারা সারাদিন রইলেন। গৌরদা রথীদা— বালককাল হতে বন্ধু ওঁরা। কতবার এসেছেন রথীদা গৌরদার বাড়িতে, নৌকো করে গঙ্গা ঘুরেছেন। চেনা-জানা বাড়ি তাঁর।

রথীদারা গল্প করে তাস খেলে দুপুরে বিশ্রাম করে সন্ধের দিকে কলকাতায় ফিরে গেলেন।

কিছুদিন পরে আমি ফিরে এলাম আশ্রমে। বোঠানের উৎসাহ ও উদ্যমে ব্যাপারটা ঘনীভূত হল। দু পক্ষের অভিভাবকদের জানানো হল, তাঁরা বিবাহের আয়োজনে লাগলেন। এমন সময়ে কিছু ভুল বোঝাবুঝির জন্য দু পক্ষই বেশ বিগড়ে বসলেন। বিবাহ-অনুষ্ঠান কিছুটা জটিল হয়ে উঠল এবং ধরতে গেলে অকারণেই জটিল হল। আমি আবার কলকাতায় আটকা পড়লাম।

সব খবর গুরুদেবের কাছে চলে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। গুরুদেব রথীদাদের বললেন, রানীকে নিয়ে এসো ওখান থেকে, আমি ওদের বিয়ে দেব।

তখন নৃত্যনাট্যের বিরাট দল নিয়ে গুরুদেব চলেছেন বোম্বেতে। বর্ধমানে অপেক্ষা করছেন ওয়েটিংরুমে বোম্বে মেলের জন্য। আমরা দুজনে গিয়ে প্রণাম

করলাম তাঁকে। বোঠান, কমলবোঠান এসেছিলেন বর্ধমান অবধি, তাঁদেরও প্রণাম করলাম। রথীদা, সাহেবদা, অপূর্বদা— ওঁদের ব্যবস্থাতেই আসতে পেরেছিলাম কলকাতা হতে। সে কাহিনী অপ্রয়োজন এখানে।

ট্রেনের অনেকগুলি কামরা জুড়ে আশ্রমেরই দল। দিনুদাও আছেন দলে। দিনুদার কামরায় উঠলাম।

বোম্বে স্টেশনে পৌঁছে গুরুদেবের ব্যবস্থায় আমাকে নিয়ে গেলেন পুরুষোত্তম ত্রিকোমদাসের পত্নী— তাঁর পিত্রালয়ে। গুরুদেব থাকবেন টাটা প্যালেসে, সঙ্গে থাকবেন সেক্রেটারি, থাকবেন দিনুদা ও আরো অনেকে। তবু বিবাহের আগে এক বাড়িতে আমাদের থাকা গুরুদেবের মনঃপূত নয়।

একবস্ত্রে এসেছি। ভাবছি কী করি। এমন সময়ে একজনকে দিয়ে একটি প্যাকেট পাঠালেন গুরুদেবের সেক্রেটারি। বোম্বেতে নেমেই প্রথমে দোকানে গিয়ে কিনেছেন একটি খদ্দরের শাড়ি, সায়া, জামা। অন্নবস্ত্রের ভার নিলেন তিনি প্রথম দিন হতেই।

বৌভাতের দিন বর শপথ নেন— নববধূকে বলেন, 'আজ হ'তে তোমার ভাত-কাপড়ের ভার আমি নিলাম'। পরবর্তী জীবনে এই প্রসঙ্গে আমার স্বামী উল্লাসের সঙ্গে বলতেন গুরুদেবকে, 'গুরুদেব, আমি কিন্তু কথা রেখেছি'। তাঁর এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। যখন তিনি চলে গেলেন— দিনে দিনে সবই চলতে থাকল কেবল একটি জায়গায় এসে ঠেকে রইলাম— নিজের জামাকাপড় নিজে কখনো কিনি নি, কিনতে পারলামও না। সন্তান-সন্তানস্থানীয়রা সে ভার নিলেন।

সেদিন সারাদিন রইলাম আমি পুরুষোত্তম ত্রিকোমদাসের পত্নীর সঙ্গে অন্য বাড়িতে। সন্ধের দিকে হরেন ঘোষ মশাইকে পাঠালেন গুরুদেব— আমাকে নিয়ে যেতে। পুরুষোত্তম ত্রিকোমদাসের পত্নী আশ্রমে কলাভবনে ছাত্রী ছিলেন তখন, বয়সে বড়ো, তাঁকে 'চাচী' বলে ডাকতাম। চাচী আমার খোঁপায় একটি জুঁই ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। আমার স্বামী তাঁর মায়ের একখানা লালপেড়ে গরদের শাড়ি সঙ্গে এনেছিলেন, সেখানি আমাকে পরে যেতে বলেছিলেন, পরে নিলাম। এই হল আমার বিবাহের সজ্জা।

টাটা প্যালেসে এলাম। উপরে বিরাট এক বসবার ঘর, দামি কার্পেটে ঢাকা মেঝে, আশেপাশে দামি কোচ-কেদারা।

দেখি গুরুদেব গরদের ধুতি-পাঞ্জাবির জোড় পরেছেন, গলায় জুঁই ফুলের এক

বিরাট, সুন্দর গোড়ে মালা— আসনপিড়ি হয়ে বসে আছেন কার্পেটের উপরে। অপরূপ সে মূর্তি।

এখানেই গুরুদেব বৈদিক মন্ত্র পড়ে আমাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন।

সেদিন সেই টাটা প্যালেসে আরো তো বহু লোক ছিলেন, গুরুদেব কাউকে আসতে দিলেন না বিবাহ-অনুষ্ঠানে, কাউকে জানতে দিলেন না। কেন দিলেন না, তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন জাগে নি মনে কোনোদিন।

পরে শুনেছি দিনদা এ নিয়ে দুঃখ করেছেন।

সে রাত্রে বিরাট একটা পার্টি— ভোজসভা ছিল গুরুদেবকে নিয়ে— আমাদের দলের সকলের। সেই পার্টিতে গুরুদেব ঘোষণা করলেন যে, আমরা নিউলি ম্যারেড্ কাপ্‌ল। পরদিন সব সংবাদপত্রে ছাপা হয়ে গেল খবর। 'গুরুদেব' বইতেও ইতিপূর্বে এ বিষয় নিয়ে লিখেছি।

টাটা প্যালেসে তেতলায় ছিল লেডি টাটার বিরাট স্যুইট্। গুরুদেবের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল এই স্যুইটে। গুরুদেব পাশের অপেক্ষাকৃত ছোটো ঘরটায় এলেন থাকতে। বললেন, অতবড়ো ঘরে ওরাই থাকুক, আমার ছোটো ঘরই পছন্দ। এ স্যুইটেও মস্ত মস্ত ঘর— এটা ছিল স্যার টাটার স্যুইট্।

লেডি টাটার শোবার ঘর— হারিয়ে যাবার মতো ঘর। এত বড়ো আর এত সুসজ্জিত শোবার ঘর এই প্রথম দেখলাম। শোবার ঘর দেখে যত না আশ্চর্য হয়েছি, স্নানাগার দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম। সে ঘরে পা ফেলতে ভয় করত, এই বুঝি দাগ লেগে যাবে মেঝেতে। প্রকাণ্ড বাথটব, দেয়ালের গায়ে সারি বেঁধে জলের কল খোলার চাবি। প্রথমে বুঝতেই পারি নি— কি এগুলো। কৌতূহলবশে অতি সন্তর্পণে একটা চাবি ঘুরিয়েছি কি বাথটবে যেন ঝরনা হতে জল পড়তে লাগল। তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিলাম। আর-একটা চাবি ঘোরালাম— ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। আর-একটা ঘোরালাম, বাথটবের জলে তরঙ্গ বয়ে চলল। আর-একটায় ফোয়ারা। আর একটায় ঝড়ের ফোঁটা— এমনি নানারূপে জল খেলে গেল একই বাথটবে। একটা করে চাবি ঘোরাই আর ভয়ে সরে আসি —এবারে যেন কি হবে।

স্নানাগারে এখানে ঐ, ওখানে তাই— মুখ ধোবার জায়গাতেই কত রকমের বাহার। এই স্নানের ঘরে ঢোকার একটা প্রবল আকর্ষণ আমাকে ঘিরে রইল। আর একবার ঢুকলে বেরিয়ে আসা সহজ হত না কিছুতেই। প্রতিবার যে স্নানের

সময়েই সে ঘরে ঢুকতাম তা নয়, যখন-তখনই যেতাম, চাবি ঘোরাতাম— শাড়িজামা জলের ছিটায় ভিজে যেত— হাসতাম নিজের অবস্থা দেখে।

এই বাড়িতে দিনূদা থাকতেন, নন্দদা সুরেনদাও থকেতেন।

গুরুদেব তাঁর নিজের ঘরে খেতেন। দিনূদার খাবারও তাঁর ঘরে দেওয়া হত। নন্দদা সুরেনদা ব্যস্ত থাকতেন— অভিনয়ের সাজ স্টেজ ইত্যাদি নিয়ে সারাদিন বাইরে। রাত্রে বাড়িতে ফিরতেন। আমাদের দু'জন ছাড়া আর যাঁরা থাকতেন সবাইকে নিয়ে সরোজিনী নাইডু দোতলার খাবার ঘরে রোজ খেতে বসতেন। গুরুদেবের দেখাশুনা করা, তাঁর প্রোগ্রাম ঠিক করা— যাবতীয় কাজের ভার নিয়েছিলেন সরোজিনী নাইডু নিজে। তিনিও নিজ বাসস্থান ছেড়ে এ বাড়িতেই থাকতে লাগলেন গুরুদেব যতদিন আছেন এখানে ততদিনের জন্য।

আমি নানা প্রকারে নতুন, একটু শঙ্কিত আড়ষ্ট-ভাব আমার। সরোজিনী নাইডু সব-কিছুতে আমাকে টেনে নিয়ে নিজের কাছে বসাতেন, কোথাও কোনো কাজে বা তদারকে বের হলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। খাবার টেবিলে নিজের পাশে বসিয়ে খাবার তুলে তুলে দিতেন, কখনো কখনো এটা-ওটা খাবার জন্য জোরও করতেন— ঠিক যেমন মা-মাসিমা করেন। টেবিলের এক মাথায় বসতেন তিনি, পুরো টেবিলে সকলের খাবার প্লেটের দিকে নজর থাকত তাঁর। থেকে থেকে চেয়ার ছেড়ে উঠে এর-ওর প্লেটে প্রচুর মাছ-মাংস মিষ্টি তুলে দিতেন।

পরম স্নেহময়ী তিনি তো ছিলেনই, তবু একদিন এক অপূর্ব মাতৃমূর্তি দেখেছিলাম তাঁর। পদ্মজা তখন অসুস্থ— নার্সিং হোমে আছেন। হাজার কাজের মধ্যেও রোজ তিনি দেখতে যেতেন কন্যাকে। গুরুদেব বোম্বেতে এসেছেন, এখানে ওখানে যাচ্ছেন, ফুলে ফুলে তাঁকে ঢেকে দিচ্ছে লোকে। ফিরবার কালে মোটরগাড়িটাও ভরে যাচ্ছে ফুলে মালায়।

একদিন এমনিতরো মিটিং করে গুরুদেব ফিরেছেন টাটা প্যালেসে। সঙ্গের ফুলগুলিও তোলা হচ্ছে তাঁর ঘরে। সরোজিনী নাইডু সেই ফুল হ'তে একগোছা আধোফোটা লাল গোলাপ নিয়ে— কাতর কুণ্ঠিতমুখে আমার স্বামীকে বললেন, অনিল, বিবি নার্সিং হোমে, তুমি এই ফুলগুলি নিয়ে যাও তার কাছে, বলো গিয়ে গুরুদেব পাঠিয়েছেন। বিবি বড়ো খুশি হবে। মায়ের কী করুণ কী মমতাভরা আকুতি দেখেছি সেদিন।

সেবার বোম্বেতে 'তাসের দেশ' ও 'শাপমোচন' হল কয়েকরাত্রি ধরে।

গুরুদেবকে বোম্বের নানা পার্টি, নানা মিটিঙেও যেতে হল। প্রতিদিনই এ-সবের নানা অনুষ্ঠান থাকত। গুরুদেব ক্লান্তি বোধ করলেন।

সরোজিনী নাইডুর প্রখর দৃষ্টি গুরুদেবের স্বাস্থ্যের প্রতি। কয়েকবার গুরুদেবের প্রোগ্রাম বাতিলও করে দিলেন। আগে হতে জন-সমাগম হবে, ফরম্যাল ব্যাপার, গুরুদেব-ইতস্তত করতেন প্রোগ্রামের এদিক-ওদিক করতে। সরোজিনী নাইডু বেশ ধমকের সুরেই বলতেন, না, কিছুতেই আজ এই ক্লান্ত শরীর নিয়ে যেতে পারবেন না বাইরে। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি— আমি জানিয়ে দিচ্ছি সবাইকে। তাঁর এই অভিভাবকত্ব গুরুদেব না মেনে পারতেন না।

গুরুদেবকে নিয়ে সরোজিনীর দৃষ্টি সব দিকে সতর্ক থাকত। গুরুদেবকে কেউ কোথাও বক্তৃতা বা কিছু উদ্‌বোধন করার অনুরোধ, নিমন্ত্রণ করতে এলে তিনি না বলতে পারতেন না। তাঁদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বসতেন। শুনে সরোজিনী নাইডু ছুটে আসতেন। কোথায় গুরুদেব যাবেন, কোথায় যাবেন না এ সিদ্ধান্ত তাঁর। একদিন এক বিশেষ সিগারেট কোম্পানি কিভাবে যেন গুরুদেবকে রাজি করিয়েছিল তাদের ফ্যাক্টরিতে তাঁকে নিয়ে যেতে। সরোজিনী নাইডু খবর পেয়ে দুম্‌দাম করে এসে গুরুদেবকে বললেন— কী ননসেন্স। আপনি সেখানে যাবেন কি ? সে হতেই পারে না। সে এক পরিস্থিতি তখন। সিগারেট কোম্পানির লোকেরা এসে ধরনা দিয়ে পড়েছে— নির্ধারিত দিনে। বিরাট আয়োজন করেছে, নানা শাখা-প্রশাখা থেকে তাদের অতিথি-অভ্যাগত এসে পড়েছে। সরোজিনী নাইডু অচল অটল দ্বারীর মতো গুরুদেবকে আগলে রইলেন। শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বামী-স্ত্রীকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়ে কোনোমতে ব্যাপারটার রফা করলেন। সে-এক প্রহসন আমাদের জীবনে। গুরুদেবের জন্য ফুলে পাতায় তৈরি সিংহাসনে আমাদের বসিয়ে উৎসব হল। লিখেছি এ ঘটনাও সংক্ষেপে আগে।

বোম্বেতে নৃত্যনাট্যের পালা শেষ হয়ে গেলে দলবল সব আশ্রমে ফিরে গেল। সরোজিনী নাইডুর ব্যবস্থাপনায় ঠিক হল গুরুদেব কিছুদিন ওয়ালটেয়ারে বিশ্রাম নিয়ে তবে যাবেন হায়দ্রাবাদে। সেখানকার আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেছিলেন আগে হতেই।

গুরুদেব ওয়ালটেয়ারে এলেন আমাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে। একেবারে সমুদ্রের ধারে বাড়ি, দোতলা বাড়ি। ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে পাড়ে, জল ছিটকে উঠছে শূন্যে।

গুরুদেব দোতালায় থাকেন। সারাদিন খোলা দরজা-জানালা দিয়ে সমুদ্র দেখেন, লেখেন, কত সময়ে তাঁর চেয়ারের পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। কথা বলার কারণ থাকে না।

আমরা থাকি নীচের তলায়। মানুষের ভিড় থেকে এসে এই নির্জন দিনগুলি একান্ত আপনার বলে মনে হল। দুপুরে ধূসর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সকল কথা স্তব্ধ হয়ে থাকত।

আমার স্বামী গুরুদেবের চিঠিপত্র লেখা, টাইপ-করা ইত্যাদি নানা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আমি কখনো গুরুদেবের কাছে বসে থাকতাম, কাছাকাছি ঘুরঘুর করতাম; কখনো নীচে নেমে সমুদ্রের দিকে দু'চোখ মেলে দিতাম। সমুদ্রের সামনে এসে দাঁড়ালে দেখেছি মন তখন আর কোনো কথা কয় না।

এখানে সপরিবারে সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ থাকতেন। তখন তিনি এখানকার ইউনিভারসিটির ভাইস-চ্যান্সেলার। তিনি ও তাঁর স্ত্রী রোজ আসতেন, গুরুদেবের কাছে বসতেন, কথা বলতেন। রাধাকৃষ্ণণ সকাল বিকেল দুবেলাই আসতেন, গুরুদেবের সুবিধে অসুবিধের নানা খবরাখবর করতেন। আর স্ত্রীকে নিয়ে দুজনে আসতেন বিকেলবেলা। তাঁর স্ত্রীর কোলে থাকত একটি কচি শিশু— তাঁদের নাতি-নাত্‌নির একজনা। বহু সন্তানের পিতামাতা এঁরা, মেয়েরা আসতেন পিত্রালয়ে, সন্তান-সন্ততিতে বাড়ি ভরা। গুরুদেবের সঙ্গে গিয়েছি এঁদের বাড়িতে। পরে আরো ঘনিষ্ঠভাবে থেকেছি তাঁদের সঙ্গে। এখান থেকে হায়দ্রাবাদ যাবার কথা গুরুদেবের। গুরুদেব ভাবনায় পড়লেন, এই প্রথমবার যাবেন সেখানে, সেখানকার হাল-চাল কী হবে—আমাকে নিয়ে হয়তো একটু অসুবিধেই হবে। মুসলিম রাজ্য, মেয়েদের জন্য হয়তো বিশেষ পর্দার ব্যবস্থা সেখানে। এই-সব নানা ভাবনায় গুরুদেব বিচলিত বোধ করলেন। রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে কথা বললেন গুরুদেব। ঠিক হল আমাকে রাধাকৃষ্ণণের বাড়িতে রেখে যাবেন কয়দিনের জন্য, পরে হায়দ্রাবাদ থেকে ফিরবার পথে এখান থেকে তুলে নেবেন আমাকে ট্রেনে।

রাধাকৃষ্ণণ বললেন, কোনো অসুবিধা হবে না। আমার মেয়েরা আছে, তাদের সঙ্গে রানী ভাব জমিয়ে ফেলুক, অজানা অচেনা বলে মনে হবে না কিছু।

সেইদিন থেকে রোজ রাধাকৃষ্ণণ আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান, কিছুক্ষণ সময় সেখানে কাটাই। মেয়েদের সঙ্গে ভাব হয়ে যায়। আবার ফিরে আসি এ

বাড়িতে। গিন্নিবান্নি রাধাকৃষ্ণণের স্ত্রীকে বড়ো ভালো লাগে, সকলের জন্যই যেন তিনি মা হয়ে বসে আছেন।

এমন সময়ে একদিন কালীমোহন ঘোষ মশায় এলেন ওয়ালটেয়ারে শান্তি-নিকেতন হতে। আগে থেকেই ঠিক ছিল তাঁর এ সময়ে আসার। তিনিও যাবেন হায়দ্রাবাদে গুরুদেবের সঙ্গে। হায়দ্রাবাদ তাঁর জানা জায়গা, বিশ্বভারতীর জন্য টাকার ব্যাপারে তাঁকে আসতে হয়েছিল হায়দ্রাবাদে ইতিপূর্বে বার-দুয়েক। আমাকে হায়দ্রাবাদে না-নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গুরুদেব বললেন তাঁকে। কালীমোহন ঘোষ মশায় তখন বোঝালেন গুরুদেবকে, যে, যে-কারণে আমাকে এখানে রেখে যাবার ব্যবস্থা করেছেন তার কোনো প্রয়োজন নেই। হায়দ্রাবাদে বিবি-বেগমরা সবাই খুব আপ্-টু-ডেট্। পর্দা সরে গেছে। বেগমদের ক্লাব আছে, তাঁরা তাস খেলেন, টেনিস-ব্যাডমিণ্টন খেলেন। আমাকে নিয়ে ভাবনার কিছু নেই সেখানে।

তাঁর কথায় গুরুদেব রাজি হলেন, আমাকে সঙ্গে নিয়েই রওনা হলেন হায়দ্রাবাদে। কালীমোহন ঘোষ মশায় আগেই রওনা হয়ে গিয়েছিলেন গুরুদেবের আগমন বার্তা নিয়ে। আমরা পরে গিয়ে পৌঁছলাম সে রাজ্যে।

এই সময়েই ওয়ালটেয়ারে আসবার মুখে, কি যাবার মুখে— মনে পড়ছে না ঠিক, বোধ হয় যাবার মুখেই হবে, বেজোয়াডার ডাওয়েজার মহারানী ললিতা দেবী কাতর আকাঙ্ক্ষা জানালেন, যদি গুরুদেব একবার পদধূলি দেন তাঁর কুটিরে। ললিতা দেবী তখন আর রাজরানী নন— রাজমাতা। প্রাসাদ ছেড়ে আলাদা বাড়িতে থাকেন। রাধাকৃষ্ণণও অনুরোধ জানালেন। গুরুদেব রাজি হলেন।

গুরুদেবের সঙ্গে ট্রেনের এক কামরাতেই আমরাও দুজন। বড়ো কামরা— এক দিকে খানিকটা করিডর মতো— সেটা কোনো স্পেশাল কামরা ছিল কিনা রাজারাজড়াদের— তাও এখন আর মনে নেই। পদে পদে বড়ো ঠেকে যাচ্ছি। ছোটো বড়ো তুচ্ছ মুখ্য— সব-কিছুর খুঁটিনাটি অবধি ধরা থাকত আমার স্বামীর স্মরণে। কোনোদিন কোনো নোট নিতে দেখি নি তাঁকে জীবনে। নির্ভুল নামধাম বিবরণী বলে যেতেন মুখস্থ বলার মতো। একবার বলেছিলাম তাঁকে, গুরুদেবের কাছে কত লোক আসেন যান, তাঁদের নামগুলি অন্তত একটু লিখে রাখতে পারো। বললেন, কোনো দরকার নেই, সব আমার মনে থাকে। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত এর প্রমাণ তিনি দিয়ে গেছেন, শুধু গৃহকোণে নয়, বিস্তারিত কর্মক্ষেত্রেও।

যাক যা বলছিলাম— গুরুদেব সেই কামরার একদিকে বনমালীকেও শুয়ে

থাকতে বললেন। খুব ভোরে গাড়ি থামবে বেজোয়াডা স্টেশনে— বনমালী কোন্ কামরায় থাকবে, তার ঘুম ভাঙবে কি না— হাঁকডাক নানা ঝামেলা। কী দরকার সে-সবের? থাক্ ও এখানেই শুয়ে।

সেই বেজোয়াডা স্টেশনের কিছু আগে সেই ভোররাত্রে দেখেছিলাম ঘটনাটা— দেখার মতো দৃশ্য। গুরুদেব বাথরুম থেকে বেরিয়ে নিজে তৈরি হয়ে নিয়েছেন, করিডোরটায় বনমালী, বনমালীর পরনে গুরুদেবের একটা ধব্‌ধবে পাজামা, গায়ে ব্রাউন রঙের পাঞ্জাবী— তাও গুরুদেবেরই— গুরুদেবই দিয়েছেন তাকে নিজের জামা পাজামা পরতে। সেই অতি ঢলঢলে জামা-পাজামা কোমরে দড়িদড়া বেঁধে কোনো রকমে সে আটকে রেখেছে।

গুরুদেব কাপড়ের নরম বড়ো টুপি মাথায় দিতেন। টুপিটা মাথায় দিয়ে মাথার উপর দিকটা একটু চেপে দিতেন, বেশ ভাঁজ খেয়ে মাথায় বসে যেত সে-টুপি।

বনমালী সেই সাজে দাঁড়িয়ে আছে, দেখি গুরুদেব তাঁর ঐ রকম একটা টুপি বনমালীর মাথায় পরিয়ে থাবড়ে-থুবড়ে ঠিক করে দিচ্ছেন, বলছেন, রাজবাড়ি যাবি— সোজা কথা? ভালো করে সেজে যেতে হবে তো সেখানে?

গুরুদেবের মাথার টুপি বনমালীর মাথার এদিকে-ওদিকে ঝুলে ঝুলে পড়ছে, কপাল চোখ ঢেকে পড়ছে। বনমালী কালো মুখে দাঁত বের করে হিঁ হিঁ হাসছে।

বহু আড়ম্বরে ললিতা দেবী গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করে তুললেন বাড়িতে। বাড়িতে ঢুকেই প্রথমে একটি হল ঘর— সেখানে গুরুদেবকে কোচে বসালেন। পুরনারীরা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে পুষ্প চন্দন ধূপ নারকেলের অর্ঘ্যথালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন— তাঁরা গুরুদেবকে আরতি করলেন। সাতটি অর্ঘ্যথালায় সাতটি শিখা গুরুদেবকে ঘিরে নেচে নেচে জ্বলল। ধূপ-পুষ্পের সুবাসে দেবালয় হয়ে গেল সে স্থান।

ললিতা দেবী গুরুদেবকে নিয়ে দোতলায় গুরুদেবের জন্য সাজানো বাসগৃহে এলেন।

মনে-প্রাণে গুরুদেবের অনুগত ভক্ত ললিতা দেবী। যতক্ষণ কাছে থাকেন জোড়হাত করে থাকেন। বসেন যখন গুরুদেবের পায়ের কাছে বসেন। সুস্বাস্থ্যের শ্যামবর্ণের শ্রীমণ্ডিত এক বিশেষ রূপ রাজমাতার।

সেই সেবার রাজমাতার বাড়িতেই আমি প্রথম দেখেছিলাম— অন্নব্যঞ্জন খেতে দিয়েছেন প্রকাণ্ড এক-এক রূপোর থালায়। গুরুদেব আগে খেয়ে নিলেন, আমরা

পয়ে খেলাম। রুপোর থালাতেই। থালাটা ঘিরে ছোটো বড়ো বাটি আকারে গোল গোল খোপ-করা। ভাত ডাল ব্যঞ্জন মিষ্টি— সবই এক-এক খোপে পরিবেশন করা। থালার সামনের খোপটা যেটা কিছুটা বড়ো, তা হল চামচ দিয়ে ভাত তুলে পছন্দমত ডাল-তরকারি তুলে মেখে খাবার জন্য। লম্বা করে হাত বাড়িয়ে খোপগুলির নাগাল পেতে হয়।

একরাত্রি ছিলেন গুরুদেব রাজমাতার আশ্রয়ে। রাজমাতা গুরুদেবের পায়ের কাছে বসে গুরুদেবের মুখে কবিতা শুনতেন, গুরুদেব পরমস্নেহে তাঁকে কবিতা পড়ে শোনাতেন। রাজমাতা নিষ্পলক নেত্রে গুরুদেবের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। মিটিং নয়, বক্তৃতা নয়, জনসমুদ্রের উত্তাল ভিড় নয়— একান্তে নিরিবিলিতে একটি তৃষ্ণায় আকুল উৎকণ্ঠিত চিত্তে যেন শ্রাবণের ধারা ঢেলে দিচ্ছেন গুরুদেব। এ দেখেছি সেদিন।

রাজমাতার কাছ হতে রওনা যখন হই, প্রাসাদ-দেউলে মোটর অপেক্ষায় আছে, গুরুদেব উঠে বসলেন, আমি গুরুদেবের পাশে বসলাম, আমার স্বামী বসলেন সামনে। ললিতা দেবী মোটরের খোলা দরজার সামনে এসে নক্শা কাটা খুব ভারী একটা রুপোর ট্রে কিংখাবে ঢাকা, তুলে দিলেন আমার কোলে। ট্রে রেখে ললিতা দেবী করজোড়ে ব্যথাকাতর নয়নে চেয়ে রইলেন গুরুদেবের দিকে। ঐ চোখের ভাষাতেই নিবেদন করা হয়ে গেল— সামান্য কিছু দান গ্রহণ করে ধন্য করবেন।

ললিতা দেবী জানতেন গুরুদেবের আশ্রমের কথা, জানতেন টাকার অভাবের কথা। ট্রেনের একই কামরাতে উঠেছিলাম গুরুদেবের সঙ্গে। তাঁর সামনে ট্রের কিংখাবের ঢাকাটা খুলে ফেললাম। জরির কাজ করা একটি থলে-ভর্তি টাকা। গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে গুনেছিলাম, বেশ কয়েক হাজার টাকা ছিল থলিতে।

সেইবারেই এক স্টেশনে ট্রেন থেমে আবার যখন চলতে লাগল— গুরুদেবের মুখে চাপা হাসি, মাথা ঝাঁকিয়ে তালে তালে বলতে লাগলেন, 'সেনগুপ্ত দাশগুপ্ত, সেনগুপ্ত দাশগুপ্ত'। আমি অবাক হয়ে চেয়ে আছি। গুরুদেব হেসে ফেললেন, বললেন, গাড়ির চাকাগুলো বলছে শোন্— সেনগুপ্ত দাশগুপ্ত— সেনগুপ্ত দাশগুপ্ত। আমি সশব্দে হেসে উঠলাম।

এখন মনে হয় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আছি, কীই-বা বুঝতে পারি, কতটুকুই-বা ধরতে পারি। তাই বুঝি সময়ে সময়ে ছেলেমানুষকে খেলা দেওয়ার মতো করে খেলা

দিতেন আমাকে। আড়ষ্টভাব কাটিয়ে দিতেন, ভুলিয়েও রাখতেন।

এ লেখায় গল্প বলতে বসেছি— বিস্তারিতভাবে বলবার অবকাশ পেয়েছি। যে কথা আগে বলেছি তা হয়তো আবারও বলছি, দোষ কী তাতে?

বোম্বেতেও এমনিতরো হাসি-খেলার ঘটনা কত ঘটত। শান্তিনিকেতন হতে কলাভবনের ছবি নিয়ে আসা হয়েছিল নৃত্যনাট্যের দলের সঙ্গে। ছবির প্রদর্শনী হল বোম্বেতে। ব্রিটিশ আমল, তখনকার বোম্বের লাটসাহেব এলেন একজিবিশন দেখতে, কী নাম ছিল মনে তো নেই এখন। খুব লম্বা সুদর্শন পুরুষ, মাঝামাঝি বয়সের। গুরুদেবও ছিলেন সেখানে। কলাভবনের আমরাও কয়েকজন ছিলাম, নন্দদা সুরেনদা ছিলেন। লাটসাহেব ঘুরে ঘুরে ছবি দেখে গুরুদেবের কাছে এলেন। গুরুদেব বসেছিলেন সে হলেই একটা সোফায়। লাটসাহেব এসে যেমন মামুলি কতকগুলি কথা বলেন তেমনি— 'কী সুন্দর ছবি— কী ওরিজিনাল কাজ— কী রঙের ঔজ্জ্বল্য' এই-সব বলতে লাগলেন। গুরুদেব এ আলোচনায় কি আর যোগ দেবেন, তফাত দাঁড়িয়েছিলাম, গুরুদেব ডাকলেন ইশারায়। কাছে আসতে আলাপ করিয়ে দিলেন লাটসাহেবের সঙ্গে, যে, এও একজন আর্টিস্ট, এরও ছবি আছে এই একজিবিশনে। লাটসাহেব যথারীতি হেসে 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ' বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন, হ্যাণ্ডশেক করলেন। গুরুদেব বাংলাতে আমাকে বলতে লাগলেন, এ হাত ধুস নে যেন আজ; বাবা, লাটসাহেব শেকহ্যাণ্ড করেছে— সোজা কথা?

গুরুদেব বলে যাচ্ছেন আর আমি হাসি চাপতে পারছি না। লাটসাহেব বুঝতে পারছেন না কথা, অথচ বুঝছেন যে একটা হাসির কথা হচ্ছে। দেখে লাটসাহেবও হাসছেন একবার আমার দিকে চেয়ে একবার গুরুদেবের চাপা কৌতুকভরা মুখের দিকে চেয়ে।

এইসঙ্গে বোম্বের সিগারেট ফ্যাকটরির ঘটনাটিও ভালো করে খুলে বলি। ঘটনাটা বোধ হয় একটু ছুঁয়েই লাফিয়ে চলে এসেছি অনেকখানি।

সিগারেট ফ্যাকটরিতে গুরুদেবের যাওয়া তো সরোজিনী নাইডু বাতিল করে দিলেন। একেবারে শেষ মুহূর্তে ঘটল ব্যাপারটা। সেইদিনই গুরুদেবের সেখানে যাবার কথা। গুরুদেবকে নিতে এসে ভদ্রলোক শোনেন এ কথা। কলকাতা মাদ্রাজ হতে তাঁদের অনেক অতিথি অভ্যাগত এসে পড়েছেন এই অনুষ্ঠান-উপলক্ষে। সকলে সমবেত অপেক্ষা করছেন ফ্যাকটরিতে। এখন উপায়? ফ্যাকটরির কর্তা কাঁদো-কাঁদো হয়ে ধরনা দিলেন। অগত্যা বললেন— সব-কিছু তৈরি, দলের একজন

কেউ আসুন না-হয়, আমরা অনুষ্ঠানটা করে ফেলি।

গুরুদেব তাঁর সেক্রেটারিকে বললেন, তাই তো, ভদ্রলোকদের তো বড়ো বিপদ। তুই রানীকে নিয়ে যা ওঁর সঙ্গে। বলবি— আমার শরীর খারাপ এটা-সেটা— যা মনে আসে।

গুরুদেবের আদেশে তো গেলাম আমরা। গিয়ে চক্ষুস্থির। অনেকখানি পথ জুড়ে ফ্যাকটরির দোর পর্যন্ত ফুলে, রঙে, রঙিন কাগজে, বাদ্যে-বাজনায়, লোকে, তোড়ায়— ঝম্‌ঝম্‌ গম্‌গম্‌ ব্যাপার। লজ্জায় সংকোচে জড়োসড়ো হয়ে যাচ্ছি। এতেও শেষ নেই— গুরুদেবের জন্য ফুল দিয়ে সাজিয়ে সুসজ্জিত সুউচ্চ যে সিংহাসন করে রেখেছে আঙিনার প্যাণ্ডেলে, তাতে আমাদের দুজনকে বসিয়ে দিল। এততেও শেষ নয়। গুরুদেবের জন্য ভাটেরা গান বেঁধেছিল— সেই প্রশস্তি সংগীত যখন তারা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে গাইতে লাগল, 'জয় জয় জয়তু কবীন্দ্র রবীন্দ্র'। মনে মনে ভাবছিলাম গিয়ে যখন গুরুদেবকে বলব ঘটনাটা, কী বলে বলব ? কিন্তু বললাম এসে সবই। গুরুদেব খুব আগ্রহ নিয়েই শুনলেন। মুখভরা হাসি তাঁর, বললেন, কতকগুলো সিগারেট তো পেয়ে গেছিস উপহার, ওতেই তোমার কর্তা কত খুশি দেখ গে যাও।

মজার ঘটনার শেষ ছিল না যেন। বোম্বেতেই সেবার একদিন রাত্রিতে বোম্বের একজিকিউটিভ কাউন্সিলর সার গোলাম মহম্মদ হিদায়েৎ উল্লার বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ গুরুদেবের। গুরুদেবকে ডেকেছেন, শহরের গণ্যমান্যদেরও অনেকের নিমন্ত্রণ সেখানে। মস্ত পার্টি। বসবার ঘরে একটা লম্বা সোফায় বসতে দেওয়া হয়েছে গুরুদেবকে। চারি দিকে নিমন্ত্রিতদের ভিড়— একটু হকচকিয়ে যাচ্ছি বৈকি ? গুরুদেব আমাকে কাছে ডেকে তাঁর পাশে সোফার খালি অংশটা দেখিয়ে ইঙ্গিত করলেন, বললেন, বসে থাকো আমার পাশে। গুরুদেবের পাশে বসতে বড়ো কুণ্ঠিত বোধ করি, তবু বসি। আদেশ।

গোঁড়া মুসলমান পরিবার, পর্দানশীন বাড়ি; সবে মেয়েরা পর্দা ছেড়েছে। একটু একটু করে বাইরে আসছে। টের পাচ্ছি মেয়েরা অনেকে বেশ কৌতূহল নিয়ে দেখছে আমাকে— গুরুদেবের পাশে বসেছি— কে হতে পারি আমি ? তাদের সেই দেখা আমাকে আরো আড়ষ্ট করে তুলছে।

এই নিয়েই কী ভুল ধারণা! কত রসিকতা— ঠাট্টা! এ-সব আগেই গুরুদেব বইয়েতে লিখেছি।

"ঐ বুঢ়্চা সাব্ আপকো সাব্ হ্যায় ?"

টাটা প্যালেসে ফিরেই গুরুদেবকে বলেছি এ গল্প, গুরুদেব বললেন, তা তুই কী বললি ওদের ? বললাম— কিছু বলি নি, কেবল একটু সলজ্জ হাসি হেসেছি।

গুরুদেব হাসতে লাগলেন। সরোজিনী নাইডু তো হো হো করে হেসেই উঠলেন। পরদিন যাকে পেলেন এই গল্প বলে ছড়িয়ে দিলেন বোম্বের বিশেষ জন-সমাজে। পথে বাড়িতে যার সঙ্গেই দেখা হয় সরোজিনী নাইডু ডেকে বললেন— শোনো শোনো, সত্য এক নতুন গল্প শোনো।

সরোজিনী নাইডু রসিকা ছিলেন— হাসতে জানতেন, হাসাতে জানতেন। সরস অন্তর ছিল তাঁর। পরবর্তীকালে দেখেছি— আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা হলে আগেই বলতেন, এই রাসকেল— কি কি গল্প আছে বলে ফেল আগে। নিজেও গড়গড় করে বলে যেতেন ঝুলিতে যা জমেছে না-বলা গল্পগুলি। একবার দিল্লিতে এক পার্টিতে লোকজনের গা-ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে আমার স্বামীকে একপাশে টেনে নিয়ে দেখি কী একটা গল্প বলছেন আর চাপা হাসিতে ফেটে পড়ছেন। সে গল্প পরে আমিও শুনেছি আমার স্বামীর কাছে, কিন্তু বলতে তো পারি না, সব-কিছু মুখ ফুটে বলা যায় না। উচিতও নয়।

আবার একবার এসেছিলাম গুরুদেবের সঙ্গে ওয়ালটেয়ারে, খুব সম্ভব বছর দুই-তিন পরে কিংবা আরো একটু পরে। নৃত্যনাট্যের দল নিয়ে আসা হয়েছিল। তখনো সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ইউনিভারসিটির ভাইস-চ্যান্সেলার সেখানে। তাঁরই উদ্যোগে আর বেজোয়াডার রানীর আমন্ত্রণে এলেন গুরুদেব। আগের যাত্রায় যিনি রানী ছিলেন তিনি এবারে রাজমাতা। অল্পবয়সে মারা গেছেন রাজা, দুটি নাবালক পুত্র রেখে। রানী বিদ্যাবতী পুত্রদের নিয়ে আছেন এখানে।

গুরুদেবকে নিয়ে বিদ্যাবতী রাখলেন তাঁর নিজ বাসভবনে। আমরা দলবল রইলাম শহরের দুটি বাড়িতে— ছেলেরা একটাতে, মেয়েরা আরেকটাতে।

বিদ্যাবতীর বাড়িতে যেতাম মাঝে মাঝে গুরুদেবকে দেখতে। দেখেছিলাম গুরুদেবের শোবার ঘর ঘুরে ঘুরে— মোটা মোটা খুরো দেওয়া রুপোর পালঙ্ক, রুপোর জলচৌকি— পালঙ্কে উঠতে। কোচ কেদারা টেবিল— সব রুপোর। ঝকমক করছে ঘর চাঁদি রুপোর জলুসে।

এই বারেই এই ওয়ালটেয়ারেই ইউনিভারসিটির সামনে মস্ত প্যাণ্ডেলে শুনে-

ছিলাম গুরুদেবের আবৃত্তি— অপূর্ব সেই কণ্ঠস্বর। গুরুদেব যেন নিজের গলার স্বংটা ছুঁড়ে দিলেন শ্রোতাদের মাথার উপর দিয়ে! কবিতা যখন শেষ করলেন— 'ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর— এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা'— সবার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আছে। এতটুকু বিচলন নেই কোথাও। গুরুদেব আবার পড়লেন— 'পরানের সাথে খেলিব আজিকে মরণখেলা— নিশীথ বেলা, দে দোল্ দোল্— এ মহাসাগরে তুফান তোল্—'। হায়দ্রাবাদেও এমনই এক ভিড়ে গুরুদেব পড়েছিলেন এই দুটি কবিতা, তাদেরও অবস্থা হয়েছিল এমনিই। কেবল অতিকষ্টে যেন তারা বলতে পেরেছিল— এন্‌কোর, এনকোর। এখানে তাও বলতে পারল না কেউ। গুরুদেব বইয়ে এ কথাও বলা হয়েছে।

হায়দ্রাবাদস্টেট গেস্ট হাউসে গুরুদেব ছিলেন, আমরা ছিলাম, আর কালীমোহন ঘোষ মশায় ছিলেন। দোতলা বাড়ি— সুসজ্জিত বাড়ি বাগান, সুসজ্জিত নফর নোকর। মার্জিত সবার আচরণ, সংযত আদবকায়দা। সৌষ্ঠব এদের ব্যবহারে।

বন্ধু আমীর আলি হায়দ্রাবাদবাসী, কাজ করেন আমাদের শ্রীনিকেতনে। হায়দ্রাবাদে উপস্থিত আছেন। আমীর আলি দেখি কথা বলে এখানে অন্য ধাঁচে। ধীরভাবে মাথা নিচু করে আদাব করলে, শান্ত স্বরে কুশল প্রশ্ন করল। মনে মনে প্রথমটায় থমকিয়ে গেলাম। যে-আলি দূর হতে নাম ধরে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে আসত, দিদি গৌরদার বাড়িতে কত গল্প হাসি তামাশা করেছি, খেয়েছি একসঙ্গে, সে এমনভাবে এত বিনয়নম্রভাবে অতিথির মতো অভ্যর্থনা করে কেন? আমি তো আলিকে দেখেই উল্লাসে এগিয়ে এসেছিলাম; উল্লাসটা চাপা দিয়ে দিলাম। আলি মাথা নিচু করেই ধীরে ধীরে আমার সঙ্গে কথা বলল। পরে দেখলাম এটাই এখানকার শিষ্টাচার।

মেহেদীভাই প্রথম দেখা হতেই আমাদের বড়ো ভাইয়ের মতো স্নেহে মমতায় নিবিড় করে নিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত এইভাবেই পেয়ে এসেছি তাঁকে। স্বাধীন ভারতে আমেদাবাদে রাজ্যপাল ছিলেন। কিছুকাল আগে চলে গেলেন। মেহেদী-ভাইয়ের বাড়ি নিজ বাড়ি মনে হত, তাঁর সন্তানরা এখনো আমাদের নিজ সন্তান-স্থানীয়।

এই মেহেদীভাইয়ের বাড়িতে দেখতাম— সকালে নাস্তার টেবিলে সবাই বসেছি, বেগমসাহেবা, আমাদের 'ভাবী', টেবিলের এক মাথায় বসেছেন, মেহেদীভাই বসবেন

অন্ত মাথায়, তাঁর চেয়ারটা খালি, মেহেদীভাই এসে প্রথমে ভাবীকে আদাব করলেন, পরে চেয়ারে বসলেন।

মেহেদীভাই ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল শান্তিনিকেতনের প্রতি। প্রথমবার যখন কালীমোহন ঘোষ মশায় আসেন টাকার জন্ত হায়দ্রাবাদে, মেহেদীভাই-ই তুলে দিয়েছিলেন বেশ-কিছু টাকা শান্তিনিকেতনের সাহায্যার্থে।

মহারাজা কিষণপ্রসাদ ছিলেন নিজামের প্রধানমন্ত্রী, মেহেদীভাই ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সচিব। মেহেদীভাইয়ের উপর মহারাজার ছিল সম্পূর্ণ আস্থা ও ভালোবাসা। তেমনি মেহেদীভাইয়েরও ছিল মহারাজের প্রতি অগাধ ভক্তি আর শ্রদ্ধা। এই মন নিয়েই মেহেদীভাই তাঁর সকল কাজ করতেন এবং করে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করতেন।

নিজাম আবার নির্ভর করতেন অনেকখানিই প্রধানমন্ত্রীর উপর। কাজেই সব জড়িয়ে গুরুদেবের হায়দ্রাবাদ আসাটা অতিশয় সমারোহের হয়েছিল, আর সফলও হয়েছিল মেহেদীভাইয়ের উদ্যোগে। দূরদর্শী ছিলেন তিনি, ছিলেন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, আর ছিলেন উদার ও সুবৃহৎ হৃদয়ভরা ভালোবাসার অধিকারী।

মেহেদীভাইয়ের কাছে 'না' বলে কোনো কথা ছিল না। সবই ছিল 'হ্যাঁ'। অসাধ্য কিছু থাকলেও বলতেন 'হো জায়গা'। এটা তাঁর শুধু মুখের কথা ছিল না।

মেহেদীভাইয়েরই ব্যবস্থায় শহরের গণ্যমান্যরা এক-এক করে আসতেন সকালে সন্ধ্যায় গুরুদেবের কাছে। হায়দ্রাবাদে রাজা আর নবাব। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে আগে হতেই তাঁদের অনুরোধ জানিয়ে রাখতেন মেহেদীভাই। তাঁরা গুরুদেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যাবার সময়ে জানিয়ে যেতেন সেক্রেটারিকে তাঁদের সাহায্যের অঙ্কটা। অনেক টাকা সেবারে তুলে দিয়েছিলেন মেহেদীভাই।

নিজামের সঙ্গে দেখা করতে গুরুদেব নিজে গেলেন, নিজাম আমন্ত্রণ করে পাঠালেন। আমার স্বামী গিয়েছিলেন সঙ্গে, তাঁর কাছেই আমরা সে গল্প শুনেছি। গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে বসালেন বসবার ঘরে— নিজামেরই এক বিশেষ কর্তা-ব্যক্তি। বসিয়ে ভদ্রলোক দু-চারটে কথা বলছেন গুরুদেবের সঙ্গে, এমন সময় হঠাৎ লাফিয়ে উঠে টেবিল থেকে একটা সোনায় রুপোয় মোড়া বেল্ট তুলে কোমরে পরে নিলেন। নিজাম আসছেন দেখতে পেয়েছেন। এ বেল্ট পরে নেওয়া দরবারী-রীতি।

নিজাম এলেন, ছোটোখাটো মানুষটি, বেশবাসেও জমকালো কিছু নয়। স্বামী ভাবছিলেন, নিজাম নিজাম, নিজাম না জানি কেমন হবেন। দেখে যেন একটু নিরাশই হলেন। নিজাম ও গুরুদেবের কথাবার্তা তেমন কিছু হয় নি শুনেছি। শুধু মামুলি কথা কয়েকটা বলাবলি হল। নিজাম জিজ্ঞেস করলেন— রেসিডেণ্টকে 'কল' করা হয়েছে কি না ইত্যাদি। পরে মেহেদীভাই শুনে বলেছিলেন গুরুদেব কেন যাবেন তাঁর কাছে? শুনে গুরুদেবও খুশি হয়েছিলেন মেহেদীভাইয়ের প্রতি।

গুরুদেবের সম্মানে নিজাম ব্যাঙ্কোয়েট দেবেন, রেসিডেণ্টও সস্ত্রীক আসবেন।

আমরাও যাব গুরুদেবের সঙ্গে। ব্যাঙ্কোয়েট ব্যাপারটা কী বুঝতেও পারি নি। নিশ্চিন্ত মনে আছি— গুরুদেবের সঙ্গে যাব, ভাবনা আবার কি? কিন্তু ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়েও কত নিখুঁত ভাবনা ভাবেন গুরুদেব— সেদিন বুঝলাম।

ব্যাঙ্কোয়েটের আগের দিন গুরুদেব আমাকে বললেন, কী শাড়ি পরে যাবি? তোর যা যা শাড়ি আছে নিয়ে আয় তো আমার কাছে, দেখি। সঙ্গে অল্পই শাড়ি ছিল, কয়েকখানা মুর্শিদাবাদ সিল্ক, কয়েকটা খদ্দর— আর ছিল ললিতা দেবীর দেওয়া একখানা শাড়ি। আগাগোড়া সোনার জরির মিহি সুতোয় বোনা— দেখে মনে হয় যেন সোনারই শাড়ি একখানা। গুরুদেব শাড়িখানা হাতে নিয়ে বললেন, 'এইখানাই পরে যাবি'। ব্লাউজ তৈরি নেই, ব্লাউজ পিস আছে অবশ্য শাড়ির সঙ্গে। তাড়াতাড়ি ব্লাউজ তৈরি করিয়ে আনা হল। ঐ-একবারই পরেছিলাম শাড়িখানা জীবনে।

এলাহী ব্যাপার। নিজামের ব্যাঙ্কোয়েট, চারি দিকের রোশনাই-এ দিন-রাত্রি ভুল হয়। কত জরি, কত রঙ, কত মণিমুক্তোর ঝলকানি; থ' বনে গেছি। গুরুদেব শিখিয়ে রেখেছিলেন আগে হতে সব। বলেছিলেন, এক বিশেষ সুরে ব্যাণ্ড বাজবে, পুরুষরা এক-একজন নারীকে নিয়ে খাবার টেবিলে যাবে। একজন এসে তোমার দিকে বাহু বাড়িয়ে দেবে, তুমি আলতোভাবে তোমার হাতখানা তার বাহুর উপরে রেখো। তিনিই খাবার টেবিলে তোমার পাশে বসবেন।

ব্যাণ্ড বাজল। দুরু দুরু বুক নিয়ে আছি। গুরুদেবের দিকে তাকিয়ে আছি। গুরুদেব উঠে দাঁড়ালেন, রেসিডেণ্টের স্ত্রী তাঁর পাশেই বসেছিলেন, গুরুদেব বাঁ হাত-খানা ঈষৎ এগিয়ে দিলেন, রেসিডেণ্টের স্ত্রী উঠে ডান হাতখানা সেই বাহুর উপরে যেন ছুঁইয়ে রাখলেন। প্রোটোকল অনুযায়ী জোড়ায় জোড়ায় পর পর চলল।

আমার কাছেও একজন স্মিতহাস্যে এসে দাঁড়ালেন বাহু বাড়িয়ে, আমিও হাত রাখলাম, তিনি আমাকে নিয়ে বাজনার সঙ্গে সঙ্গে ধীর পায়ে চলতে লাগলেন।

ব্যাঙ্কোয়েটের কত নিয়ম, কত আদব-কায়দা। কত টোস্ট করা— স্বাস্থ্য পান। মুহুর্মুহুই দেখি সবাই উঠে দাঁড়াচ্ছেন। এই ওঠ-বোস্ যে কতবার হল। খাবারের চেয়ে কায়দাগুলিই মনে আছে বেশি করে। বোধ হয় খাবারের দিকে মন দিতে পারি নি ভালো করে। শুধু আমি নয়, অনেকেই। কেননা সকলেরই নজর ছিল টেবিলের মাঝখানটায়— যেখানে গুরুদেব, নিজাম, রেসিডেন্ট ও তাঁর পত্নী বসেছিলেন। তাঁরা কে কখন উঠে দাঁড়ান, সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে দাঁড়াতে হয়।

বাড়ি ফিরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এ রকম অতি-রাজকীয় ব্যাঙ্কোয়েট আর পাই নি কখনো। স্বাধীন ভারতেও নয়।

তখনকার দিনে ইংরেজ রেসিডেন্টের প্রবল প্রতাপ হায়দ্রাবাদে। রেসিডেন্ট সস্ত্রীক আসছেন ব্যাঙ্কোয়েটে— আনুষ্ঠানিক ভোজ ইত্যাদি নিখুঁত বৃটিশ মতেই হতে হত।

ব্যাঙ্কোয়েটের পরদিন মহারাজ ধনরাজগিরি এসে গুরুদেবকে দশ হাজার টাকা দিয়ে গেলেন শান্তিনিকেতনের জন্য। তিনি কথা দিয়েছিলেন পাঁচ হাজার দেবেন, দিলেন ডবল।

মহারাজ চলে গেলে পর গুরুদেব কৌতুক করে বললেন— তুমি যে কাল রাজার পাশে বসেছিলে তাই দেখো টাকাটা কেমন ডবল হয়ে গেল। বলে হাসলেন —আমিও হাসলাম। এই ধনরাজগিরিই আমাকে বাহু বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ব্যাঙ্কোয়েটের দিন।

কয়দিন নানা পার্টি, মিটিং, বক্তৃতা ইত্যাদি করে গুরুদেব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। শহরে থাকলে লোকজন আসতেই থাকবে, বিশ্রাম পাবেন না গুরুদেব। মেহেদীভাই গুরুদেবকে কয়েকদিন বিশ্রামে রেখে তবে আসতে দেবেন হায়দ্রাবাদ হতে। ভালোবাসার শাসন।

শহরের বাইরে অনেকখানি জুড়ে বিস্তৃত পাথুরে ভূমি ছোটোবড়ো নানা আকারের শিলাখণ্ডে ভরা। মাঝে মাঝে ছোটোখাটো পাহাড়ের মতো এক-একটা পাথরের চাঁই। চারি দিকে বাব্‌লা আর মনসা কাঁটার ঝোপ। আদিবাসী বাঞ্জারারা থাকে এখানে ওখানে ঝোপড়ি বেঁধে। এই আদিবাসীদের নামের সঙ্গেই স্থানটির নাম জড়াজড়ি— নাম এর 'বাঞ্জারা হিল'। কাঁচ বসানো মোটা

কাপড়ের রঙিন ঘাগরা পরনে মেয়েদের, মাথায় মোটা কাপড়ের ভারী ওড়না। বাহুভরা হাতির দাঁতের বালার মতো হাড়ের বালা— প্রায় কাঁধ থেকে এসে ঠেকেছে কব্‌জি পর্যন্ত। ছেলেদের গায়ে মোটা কুর্তা চাদর, পরনে লেংটি। এক ঠাঁয় থাকে না, এরা ঘুরে বেড়ায় শিলাভূমিময়, ঝোপড়ি বাঁধে, ভাঙে। মাঝে মাঝে শহরের কাছাকাছি এসে বেড়িয়ে যায়।

মেহেদীভাইয়ের নজর পড়েছিল এই বাঞ্জারা হিলে। শহরের ধারে— অথচ দূরে নির্জন প্রকৃতির মাঝখানে এই স্থানটুকু বড়ো ভালো লেগেছিল তাঁর। বন্ধু-বান্ধবদের বললেন— তারা হেসে উড়িয়ে দিলেন। মেহেদীভাই নিজেই উদ্যমী হয়ে তিনখানা বাড়ি করলেন বাঞ্জারা হিলে। মহারাজা কিষণপ্রসাদের তরফ থেকে যে বাড়ি করেছেন সেই বাড়িতে গুরুদেবকে নিয়ে এলেন কিছুদিন বিশ্রামে থাকবেন বলে। ছোটো বাড়ি— একতলা, চারি দিক খোলা. হু হু করে হাওয়া, উন্মুক্ত প্রকৃতি, অবারিত আকাশ। গুরুদেব খুব খুশি হলেন এসে। বললেন, এ কয়দিন আর লিখব না কিছু। শুধু ছবি আঁকব। পূর্ণ বিশ্রাম নেব।

গুরুদেব ছবি আঁকতে লাগলেন— রঙিন পেন্সিলেই বেশি। রঙ তেমন আনা হয় নি সঙ্গে।

গুরুদেব যে বাড়িতে আছেন সেই বাড়িরই কাছে একটা গোল মতো বড়ো পাথরের উপরে মেহেদীভাই বাড়ি তুলেছেন একটা, আজ ভুলে গেছি, বোধ হয় কিষণপ্রসাদের এক ছেলের নামেই হবে। ঠিক যেন গোল পাথরটার মাথার উপরে বাড়িটা। একখানা ঘর, বাথরুম; আর ছোটো একটি সিঁড়ি। এই বাড়িতে তিনি রাখলেন আমাদের। বাড়িটার নাম দিয়েছিলেন খুব সম্ভব 'গোলকুণ্ডা'। পাথরের উপরে ঘরখানা হওয়াতে পুব পশ্চিম উত্তর দাক্ষিণ— বহুদূর অবধি দেখা যেত ঘর হতে। মাতাল হাওয়া দিবারাত্রি। জমির চাইতে আকাশই দেখি বেশি। বিছানায় শুয়ে মনে হয় শূন্যে ঝুলছি।

এই পাথরটার চেয়ে আরো বড়ো একটা পাথরে বাড়ি করেছেন মেহেদীভাই তাঁর নিজের জন্য একটি, নাম দিয়েছেন বাড়ির— 'কোহিস্থান'। শিল্পীমন মেহেদী-ভাইয়ের। এ বাড়িতে দেয়াল তোলেন নি ঘর বানাতে। পাথর কেটে কেটে গুহার মতো জায়গা বের করে তৈরি করেছেন ঘরগুলি। কোনো ঘরটা লম্বা, কোনোটা চাপা। একটা ঘর হতে চার ধাপ সিঁড়ি নেমে আর-একটা ঘর, একটু ব্যালকনি, এখানে-ওখানে কুলুঙ্গি, বসবার সীট, বুক শেল্‌ফ্‌, তাক— সব

করেছেন একটা পাহাড় কেটে। বাইরের থেকে কিছু বুঝবার জো নেই যে, পাহাড়টার ভিতরে এমন একটা গোছানো সুন্দর বাড়ি। গুরুদেব খুব খুশি হলেন দেখে। কবিতা লিখে দিলেন।

ঘন কাঠিন্য রচিয়া শিলাস্তূপে
দূর হতে দেখি আছ দুর্গম রূপে,
বন্ধুর পথ করিনু অতিক্রম
নিকটে আসিনু ঘুচিল মনের ভ্রম।
আকাশে হেথায় উদার আমন্ত্রণ
বাতাসে হেথায় সখার আলিঙ্গন।
অজানা প্রবাসে যেন চির জানা বাণী
প্রকাশ করিল আত্মীয় গৃহখানি।

মেহেদীভাই কবিতাটি ঘরের দেয়ালে খোদাই করিয়ে রাখলেন চিরকালের জন্য।

বাঙ্গারা হিলে কিছুদিন রইলেন গুরুদেব। খুব খুশি মনেই রইলেন। বেশ বিশ্রাম হল তাঁর। মাঝে মাঝে রাজ্যের গণ্যমান্যরা আসেন, গুরুদেবের কুশল খবর নিয়ে যান।

একদিন মহারাজ কিষণপ্রসাদ এলেন। মেহেদীভাই এক নামকরা বীনকরকে এনেছেন গুরুদেবকে বাজনা শোনাতে। গুরুদেব ও কিষণপ্রসাদ বসেছেন একটা লম্বা সোফাতে, মেহেদীভাইরাও আছেন কয়েকজন। বীনকর বীণা বাজাতে লাগলেন।

মহারাজ কিষণপ্রসাদের সঙ্গে সর্বদা পানের সরঞ্জাম থাকত। হায়দ্রাবাদে দেখেছি পানদান এক বিলাসের বস্তু। বেশ বড়ো রুপোর পানদান নানা কারুকাজ করা, থাকে থাকে মসলার বাটি— সুগন্ধি মসলায় ভরা, শৌখিন কাপড়ে মোড়া পানের রেকাবি, পানদানের উপরে ঢাকা থাকে কিংখাব নয় বেনারসীর বড়ো রুমাল একটি। এই রুমালটি কোলের উপরে পেতে পানদান সামনে রেখে পান সাজেন বেগমরা, সেজে অতিথিদের দেন, নিজেরাও খান। এই পান দেওয়া-নেওয়ার আদবটিও বড়ো সুন্দর।

মহারাজ কিষণপ্রসাদের পানদান— তাঁরই উপযুক্ত পানদান। সেই পানদান তাঁর পাশে রাখা। মহারাজ কোলের উপরে কিংখাবের রুমালখানা রেখে পানদান খুলে পান সাজলেন, দামি পাথর সেট-করা একটি রেকাবিতে পানের খিলিটি রেখে গুরুদেবের সামনে এগিয়ে ধরলেন, গুরুদেব খিলিটি তুলে নিলেন। আর-একটি

সাজলেন— আমার দিকে তাকালেন— আমি পান দেওয়া-নেওয়ার আদবটি আগেই দেখেছি এঁদের, কাছে গিয়ে খিলিটি নিয়ে নমস্কার করলাম। মহারাজ এক-একটি করে খিলি সাজেন— যার দিকে তাকান— তিনি অতি বিনয়নম্র ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে এসে আদাব করেন, পানের খিলি নিয়ে আর-একবার আদাব করে আপন আপন স্থানে গিয়ে বসেন। নিঃশব্দে আর অতি ধীরে চলল এই কাজ। বীনকর বাজাচ্ছেন— সেই সুরে সুরে যেন মিলিয়ে চলল পান-পর্ব।

বীণা থামল। মহারাজা একটি মোহর ফেলে দিলেন— বীনকরের দিকে। বীণকর উঠে আভূমি আদাব করলেন গুরুদেবকে, মহারাজকে।

মহারাজ কিষণপ্রসাদ যখন তাঁর প্রাসাদ হতে বের হতেন, তিনি মোটরের সামনের সীটে চালকের পাশে বসতেন। পিছনের সীটে বসত কেউ গড়গড়া হাতে নিয়ে, কেউ তাম্বুল করঙ্ক নিয়ে, কেউ পিকদানি নিয়ে, মহারাজের ব্যক্তিগত অনুচরের দল এরা। কিষণপ্রসাদের এক হাতে থাকত গড়গড়ার নল, আর এক দিকে থাকত টাকার খুচরো— দু-তিনটা থলিতে ভরা। তিন বের হবেন— রটে যেত আগে হতেই। ভিখিরির দল পথের দুধারে এসে বসে থাকত। কিষণপ্রসাদ থলি হতে মুঠো মুঠো পয়সা আনি ছড়াতে ছড়াতে যেতেন। ভিখিরিরা ধ্বনি তুলত— 'জিতা রহ হামারা রাজা'। এই ছিল তাঁর রেওয়াজ।

খুব অমায়িক ছিলেন মহারাজা। দানে দক্ষিণায় মমতায় স্নেহে তাঁর যশ ও খ্যাতি রাজ্যময়। মহারাজ ছবিও আঁকেন অবসর বিনোদনের জন্য। আমাকে দিলেন তাঁর আঁকা ছবি চারখানা।

মহারাজা হলেন হিন্দু; কিন্তু হিন্দু মুসলমান মিলিয়ে তাঁর মহিষীরা সংখ্যায় সমান সমান। যখনই তিনি একটি হিন্দু রমণীর পাণিগ্রহণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে একটি মুসলমান তরুণীকেও সাদি করে প্রাসাদে তোলেন।

হায়দ্রাবাদে পরেও এসেছি আমরা দুজনে বারকয়েক। মহারাজা কিষণপ্রসাদ তখন চলে গেছেন। আকবর হায়দারী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। মেহেদীভাই প্রধানমন্ত্রীর সচিবত্ব ছেড়ে দিয়েছেন, বলেছেন, মহারাজ কিষণপ্রসাদের কাছে কাজ করেছি আমি, আমি আর কারো কাছে কাজ করতে পারব না। মেহেদীভাই নতুন বিভাগের ভার নিয়েছেন। পরের বারে দেখি সেই বাঙ্গারা হিল আর তেমনি নেই। মেহেদীভাই জোর করে বন্ধুদের দিয়ে বাড়ি তুলিয়েছেন সেখানে। বন্ধুরা তোলেন নি, মেহেদীভাই নিজেই তাঁদের নামে বাড়ি তৈরি করে দিয়েছেন।

পথঘাট বানিয়েছেন। ভাবী'র কাছে শুনি— মেহেদীভাই বন্ধুদের কাছে গিয়ে বলেছেন— দু হাজার টাকা ধার দাও। তাঁকে কে না দেবে টাকা? সবাই দিলেন। তিনি সেই টাকায় তাঁদের নামে বাড়ি শুরু করে দিলেন। বন্ধুরা সবাই— নবাব বা রাজা। ভাবলেন যাক্ গে থাক্। ক'টা টাকা তাঁদের কাছে কী?

তার পরের বারে যখন যাই, সেই আমাদের প্রথম-দেখা বাঞ্জারা হিল অদৃশ্য হয়ে গেছে, যেন ধুয়েমুছে ফেলা হয়েছে। প্রাসাদ-অট্টালিকায় ভরা এক জমাট শহর এখন বাঞ্জারা হিল। আছে শুধু সেই গোল পাহাড়টা তেমনি গোল— সেইটুকুই যা চিনতে পারলাম। এই গোল পাহাড়টার চিহ্নটুকু না থাকলে ধরতেই পারতাম না এর উপরে একখানা ছোটো ঘরে একদিন ছিলাম আমরা। সে ঘর কোথায় এখন? সেখানে এক বিরাট অট্টালিকা। আর আছে মেহেদীভাইয়ের গুহাবাড়িটা। আশপাশের প্রাসাদ অট্টালিকা তাকে গোপন করে ফেলেছে অনেকটা।

এই গোলপাহাড়ে যখন ছিলাম মজার ঘটনা ঘটেছিল একটা। গুরুদেবের টাকা, চেক ইত্যাদি সবই থাকত আমার স্বামীর কাছে। টাকা সামান্যই ছিল, চেক ছিল কয়েকটা। একটা অ্যাটাচি কেসে থাকত এ-সব, খোলাই থাকত। নিজামের অতিথি আমরা— ভয়-ভাবনা ছিল না মনে। দিনের বেশির ভাগ সময় গুরুদেবের কাছেই কাটাতাম। এ বাড়ি খালিই থাকত। জল দিতে আসত লোক, ঘর পরিষ্কার করতে আসত। একজন সিপাই পাহারা দিত বাড়ি। কে যে কখন কী করল একদিন দেখা গেল চেকগুলি ও টাকা নেই আর সেখানে। টাকা কয়টার জন্য তেমন কিছু নয়, ভাবনা হল চেকগুলির জন্য। মেহেদীভাই থানায় খবর পাঠালেন। থানা থেকে লোক এলেন। আমার স্বামীকে নিয়ে দেখতে লাগলেন। কোন্‌খানটায় ছিল অ্যাটাচি কেস, কখন দেখা গেল টাকা চেক নেই— ইত্যাদি ইত্যাদি সব জিজ্ঞেস করে লিখে নিলেন। শেষে জিজ্ঞেস করলেন এ বাড়িতে আর কে থাকে— তার নাম কি?

স্বামী বললেন, আমার স্ত্রী রানী।

পুলিস ভদ্রলোক ইংরাজি জানেন না, আমার স্বামী উর্দু বলতে পারেন না। হায়দ্রাবাদ রাজারানী নবাব বেগমের স্থান। পুলিস ভদ্রলোক যেই শুনেছেন 'রানী'— অতিশয় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন, রানী? কৌন্ স্টেট্‌কা? কাঁহাকা?

স্বামী বোঝাতে পারেন না যে আমাদের বাঙালিদের ঘরে ঘরেই রানী। 'রানী' শুধুমাত্র একটা নাম।

পুলিস নাছোড়বান্দা। 'রানী'র স্টেটের নাম না নিয়ে ছাড়বেন না। খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর নিরুপায় হয়ে স্বামী বলে ফেললেন— 'রানী অব্ চন্দ'। পুলিস খুশি হয়ে নোটবুকে টুকে নিলেন কথাটা। স্বামী রেহাই পেলেন।

গুরুদেব খুব হাসলেন গল্পটা শুনে। বন্ধুরা তো হাসলেনই।

হায়দ্রাবাদ থেকে কলকাতায় এলাম। অপূর্বদারা স্টেশনে ছিলেন, গুরুদেবকে নিয়ে জোড়াসাঁকোয় গেলেন। স্বামী আমাকে নিয়ে আমার শ্বশুরবাড়িতে এলেন।

শ্বশুরবাড়িতে কয়দিন কাটিয়ে শান্তিনিকেতনে এলাম। এসে উঠলাম রতন-কুঠিতে— স্বামীর ঘরটিতে। বন্ধুবান্ধবরা ভিড় করে রইলেন আমাদের ঘিরে। তাদের হাসি-তামাশায় সেই সন্ধ্যাটি মধুরতর হয়ে উঠল।

পরদিন চলে এলাম মৃন্ময়ীতে। আগে থেকেই ঠিক ছিল এই বাড়িতে থাকব আমরা। স্বামী বলে গিয়েছিলেন ভূধরবাবুকে কয়েকটা ফার্নিচারের কথা। তিনি বানিয়ে রেখেছিলেন। আম জাম কাঠ দিয়ে সস্তায় তৈরি একটা খাবার টেবিল, চারখানা চেয়ার, তিনটি তক্তা আর দুটো বইয়ের শেল্ফ্। এই নিয়ে আমাদের প্রথম স সার যাত্রা শুরু হল শান্তিনিকেতনে।

৭

মৃন্ময়ী বাড়ি তৈরি করেছিলেন পিয়ার্সন সাহেব নিজে থাকবেন বলে। বাংলো ধরনের বাড়ি— মাটির বাড়ি। বড়ো চৌচালা একটি খড়ের চালের নীচেই ঘর বারান্দা সব। মধ্যিখানে একটি বড়ো ঘর, পুবে দক্ষিণে বারান্দা, পশ্চিমেও বারান্দা— তবে পশ্চিমের বারান্দার দু কোণায় দুখানি ছোটো ছোটো খুপরি মতো ঘর, উত্তরের বারান্দায় তেমনি আকারে স্নানের ঘর, কাপড় ছাড়বার ঘর— অর্থাৎ বাথরুম, ড্রেসিং রুম। পুবের বারান্দাটি একটু লম্বা। মাঝখানের এই বড়ো ঘরটিতেই একপাশ জুড়ে তিনটি তক্তা পেতে ফরাশ করা হল। দিনে এই ফরাশই চেয়ার সোফা ডিভান— যা-কিছু সব, এর উপরেই চেপে বসি অতিথি-অভ্যাগত বন্ধুবান্ধব নিয়ে। রাত্রে হয় মশারি টানিয়ে বালিশ চাদর পেতে শোবার ব্যবস্থা এর উপরে। তক্তার দুপাশে দুটি কাঁচা কাঠের বুক শেল্ফ্। ঘরের আর অর্ধেকটায় খাবার টেবিল, চারটে চেয়ার। একই ঘরে শোওয়া-বসা, খাওয়া— সব। শুরু করে দিলাম সংসার করা।

পশ্চিমের একটা কোণার ঘরে হয় রাঁধা-বাড়া, আর অন্য ঘরটুকুতে বাক্স প্যাট্‌রা রাখি। অতিথি সজ্জন, বন্ধু, বন্ধুর বন্ধু, আত্মীয়-পরিজন আসেন, থাকেন। সংসার আমাদের প্রথম হতেই গম্‌গম্‌ করে ওঠে।

মৃন্ময়ীর পাশে কোনার্ক, কোনার্কে থাকেন গুরুদেব। কোনার্কের সামনে পুব দিকে অনেকখানি এগিয়ে আসা লাল বারান্দা। গুরুদেব ভোর না হতে উঠে এসে বসেন বারান্দায়। আমরা বিছানায় শোয়া অবস্থাতেই দেখতে পাই। তাড়াতাড়ি উঠে তৈরি হয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করি, আমাদের দিনের প্রভাত হয়।

গুরুদেব বারান্দায় বসে লেখেন কি মাঝের ঘরে বসে লেখেন, সর্বদা তাঁকে চোখের সামনে দেখতে পাই। তাঁর সামনে দিয়েই যাওয়া-আসা করি। কলাভবনে যাই, কি আশ্রমে যাই, কি উদয়নে বা এখানে-ওখানে যাই তাঁকে দেখতে দেখতে যাই— দেখতে দেখতে এসে আবার ঘরে ঢুকি। মাঝে মাঝে গিয়ে তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়ি— কথা বলি; কী দেখলাম, কী করলাম— কে এল কে গেল, সব বলি।

গুরুদেবের কাছে দেশবিদেশ হতে কত গুণী-জ্ঞানী লোক আসেন— সহজভাবেই তাঁদের দেখি, তাঁদের সঙ্গে মিশি। কোনো আড়ষ্টভাব মনে আসে না, তাঁর কাছে যেন সবই সহজ— সবই সুন্দর। কত ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক আসেন বিদেশ হতে, সহজভাবেই তাঁরা মিলে যান আমাদের সঙ্গে। আশ্রমজীবন তাঁরা সহজে সাদরেই তুলে নেন নিজ জীবনে। আপনা হতেই এ হয়ে যায় যেন।

আমাদের বিয়ের পরে গুরুদেব একদিন বলেছিলেন— কত বিদেশী আসে এখানে নিজের দেশ ঘর ছেড়ে। দেখিস তারা যেন সেটি অনুভব না করে, আশ্রমে যেন তারা ঘর পায়। গুরুদেবের এ কথাটি আমরা আমাদের জীবনে ব্রত বলে নিয়েছিলাম।

শান্তিনিকেতনে এটা নিয়ে ভাবতে হয় নি কখনো। কিছু বলতে কইতে হয় না।

শ্রীভবনে ছিলাম যখন— কয়টিই বা মেয়ে ছিলাম আমরা, তারই মধ্যে বিদেশিনী ছিল বেশ কয়েকজনা। জাপানী মেয়ে হোসিসান ছিল তখন আমাদের সঙ্গে। আমাদের চেয়ে বয়সে একটু বড়োই ছিল সে। হাসিখুশি ধীর শান্তগতি, সবই করে, সবই বলে— তবু গাম্ভীর্যের একটা স্নিগ্ধ সুষমা ছিল হোসিসানকে ঘিরে। কলাভবনের ছাত্রী। হোসিসানের কাছে আমরা প্রথম জাপানী প্রথায় ফুল সাজানো

শিখি। নন্দদা হ্যাভেল-হলে ব্যবস্থা করে দিলেন।

আমাদের মতো দুম্‌দাম ফুল পেড়ে ডাল ভেঙে, কিছু ফেলে কিছু নষ্ট করে ফুল সাজাত না হোসি। হোসি কাঁচি হাতে আমাদের নিয়ে আশ্রম ঘুরে ঘুরে ফুল সংগ্রহ করত। ফুল গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, দেখত। কোন্ পাত্রে আজ ফুল সাজানো হবে সেই অনুযায়ী মনে মনে বেছে নিয়ে তবে সে ফুলের ডাল কাটত। কাটত যে, মনে হত— যেন গাছের ব্যথা না লাগে, গাছ যেন টের না পায়; মনভরা যত্ন মমতা নিয়ে কাটত। অকারণ ডাল আর ফুল তুলত না।

হ্যাভেল-হলে নন্দদা ছাত্রছাত্রী শিক্ষক সবাই দেখতাম বসে হোসির ইকাবেনা। হোসি অল্প অল্প ইংরেজি জানত, অল্প অল্প বাংলা বলত। হোসি তিন আকারের তিনটি ডাল নিয়ে বোঝাত— স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল। কোন্‌দিন কাকে প্রাধান্য দেবে পাত্র বুঝে ফুল বুঝে তা ঠিক করত।

হোসিসান দেশে ফিরে গেল। পরে শুনলাম— নন্দদাই একদিন বললেন, জানো হোসিসান নান হয়ে গেছে।

শ্রীভবনে আমাদের ঘরটা ছিল লম্বা ধরনের। ছয়জন থাকতাম একটা ঘরে। সেই ঘরে থাকতে এলেন এক বার্মিজ মহিলা। আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো বয়সে। তখনকার দিনে ডিগ্রি ডিপ্লোমার এত আয়োজন ছিল না। ছাত্রছাত্রীরা, বিশেষ করে মেয়েরা যে-কোনো বিভাগে পছন্দমত ক্লাসে যোগ দিতে পারত। সংগীতভবনে গান শিখল, শিক্ষাভবনে বাংলা-ইংরেজির ক্লাসে গেল, সময় থাকলে কলাভবনে কারুশিল্প শিখতে গেল, ড্রইংয়ে হাত পাকালো— বাধা নেই কোনোটাতে।

এখন শ্রীভবনে কত মেয়ে, কয়েক শত তো হবেই। শ্রীভবন নাম বদলে হয়েছে শ্রীসদন। একা শ্রীসদন স্থান দিতে পারে না সবাইকে, বিড়লালয়, মৃণালিনী গোয়েন্কালয়, আনন্দসদন— কত সদন আলয় গড়তে হল, আরো হয়তো হবে ভবিষ্যতে। আমাদের কালে এক শ্রীভবনই মনে হত বিরাট এক প্রাসাদ। মনে হত এর সব ঘরগুলি যদি ভরে যায় কোনোদিন— না-জানি কী ব্যাপার হবে তখন। একটি-দুটি করে মেয়ে আসত, তাও রোজ নয়। নতুন মেয়ে এসেছে, গেটের কাছে তার মালপত্র নামানো হচ্ছে, আমরা ছুটে সবাই বাইরে আসতাম, নিজেরাই ধরাধরি করে তার বাক্স-বিছানাটা তুলে ভিতরে আনতাম। কোন্ ঘরে তার স্থান হবে জেনে নিয়ে নিজেরাই নতুন মেয়ের হোল্ডলটা খুলে বিছানাটা পেতে ফেলতাম। দল বেঁধে তার সঙ্গে ঘুরঘুর করতাম, কোথায় স্নানের ঘর কোথায় রান্নাঘর সব বুঝিয়ে

দিতে সময় লাগত না। নতুন মেয়ে আসার আনন্দই ছিল আলাদা।

সেই দিনেও দেশী-বিদেশী মেয়ে বলে কোনো পার্থক্য ছিল না আমাদের মনে। সবাই ছিলাম একই গোষ্ঠীর।

এই বার্মিজ মহিলাটি যে কেন এসেছিলেন জানি না। কথা বলার অসুবিধে ছিল ভাষার জন্য, অসুবিধে ছিল না ভাব জমাতে। ইনি ইংরেজিটা শিখবার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। বার্মিজ মেয়েরা সুন্দরী হয়, ইনিও সুন্দরী ছিলেন তবে একটু স্থূলাঙ্গী। স্নান করতেন না রোজ। গরমের সময়ে মুখে চন্দনের মতো একটা হলুদ প্রলেপ মেখে বসে থাকতেন। সে প্রলেপ শুকিয়ে মুখখানি যেন টেনে টেনে খিমচে ধরত। দেখে না হেসে পারতাম না।

সারাদিও ছিলেন তখন শ্রীভবনে। ছোটো ছোটো দুই পুত্র কন্যা, পুত্র জগবন্ধু থাকত শিশুবিভাগে, কন্যা কমলা থাকে সারাদির সঙ্গেই।

বেপরোয়া দুষ্টু ছিল জগবন্ধু। গাছের ডালে বসেই সে ক্লাসের পড়া দিত। আমরা লম্বা বিনুনি ঝুলিয়ে চলতে পারতাম না পথে। কোথা থেকে ছুটে এসে বিনুনি ধরে ঝুলে পড়ত পিঠের দিকে, দোল খেত।

এই সারাদিকেও দেখি নি কখনো ভিজে চুল পিঠে খুলে রাখতে। আঁট-সাঁট বিনুনির মস্ত একটা খোঁপা থাকত সর্বদা মাথায়। একদিন কী কারণে বার্মিজ মহিলার সঙ্গে সারাদির ঝগড়া হল। দুজনে দুজনকে দেখতে পারতেন না, আমরা জানতাম। তবে ঝগড়াটা যে কী নিয়ে হল জানতাম না। ঝগড়া করবার মতো ভাষার দখলও তাঁদের ছিল না। তবু হয়ে গেল ঝগড়াটা, বেশ ভালোভাবেই হল— একটু হাতাহাতিও হয়ে গেল। পরক্ষণেই দেখি সারাদির মাথার মস্ত খোঁপাটা পড়ে আছে মেঝের উপরে। দেখে থ' বনে গেলাম। একি সম্ভব?

আপন আপন চুল দিয়ে খোঁপা বাঁধি— এই-ই জানি। খোঁপা দিয়ে খোঁপা বাঁধা? আমরা যেন লজ্জা পেলাম সারাদির মাথার খোঁপা-রহস্য নিয়ে। এটা যে জেনে ফেললাম, দেখে ফেললাম, এ লজ্জাও যেন আমাদেরই।

সারাদি ছিলেন আধা বিহারী আধা দক্ষিণী। বাংলা ভালো জানতেন না, তবে বাংলাই বলতেন আর ঊর্ধ্বশ্বাসে জোরে জোরে বলতেন।

জগবন্ধুর দুষ্টামির দৌরাত্ম্যে অস্থির সবাই। একদিন এক শিক্ষক তাকে বকতে বকতে বললেন, 'তোমাকে মেরে লাল করে দেব'। কথাটা সারাদির কানে গেল। দৌড়ে তিনি অফিসে ছুটলেন। পুরাতন লাইব্রেরির পাশেই ছিল

আশ্রমের অফিস, সেখানে গিয়ে রাগে ফেটে পড়লেন, তার ছেলেকে কেন বকেছেন শিক্ষকমশায়। বললেন, আমার কালো ছেলে কালো থাকবে, তাকে কেন লাল করবে?

'বাবা' 'মামা' এলেন আশ্রমে থাকতে, হাঙ্গেরী থেকে। ছোটোখাটো হাল্‌কা গড়নের মানুষ দুটি, মা আর মেয়ে।

মাথায় মাথায় সমান। কে মা কে মেয়ে বোঝা যায় না এক নজরে। নন্দদার সঙ্গেই এঁদের ভাব হয় সব চেয়ে বেশি, আর সকলের আগে। মা-মেয়েও শিল্পী। নন্দদা এঁদের ভাবের ভাষা বোঝেন, এঁরাও নন্দদার ভাষা বোঝেন। অন্য ভাষার প্রয়োজন হয় না। বেশি অসুবিধে হলে নন্দদা ছবি এঁকে দেখান, এঁরা বুঝে উল্লাসে হৈ-হৈ করে ওঠেন।

মায়ের বয়স কত বোঝবার জো নেই, মেয়েটি উনিশ-কুড়ি বছরের হবে। দুজনই সুন্দরী, মেয়েটি একটু বেশি সুন্দরী— মায়ের চেয়ে মুখখানি একটু কচি তো বটেই।

মেয়ে মাকে ডাকে 'মামা', মা মেয়েকে ডাকে 'বাবা'। আমরাও তাই শুনে 'মামা' 'বাবা' বলেই ডাকি তাদের।

গুরুদেবের সঙ্গে বোধ হয় চিঠি লেখালেখি করেই এলেন ভারতে, কি অকস্মাৎই এলেন তা এখন ঠিক মনে আনতে পারছি না। এ-সব নিয়ে ভাবি নি তো। আশ্রমে এসেছেন, আমাদের আপনজন, এইটুকুই যথেষ্ট।

মা-মেয়েকে রতনকুঠিতে একটা ঘর দেওয়া হল থাকতে। মা-মেয়ে থাকেন। তাঁরা কী এক বিশেষ ধর্মাবলম্বী অথবা পন্থাবলম্বী ছিলেন, রান্নাকরা জিনিস তাঁরা খাবেন না। সাজ-পোশাক পরবেন না। মাটির সঙ্গে মিলেমিশে থাকবেন— এই তাঁদের সাধনা।

আশ্রমের লাল কাঁকরভরা মাটি— কঠিন মাটি, রসহীন শুষ্ক মাটি, মা-মেয়ে দিনভর এই মাটি কুপিয়ে কুপিয়ে চীনেবাদাম এটা ওটা লাগালেন। জলের অভাব, কুয়োর জল সেই কোথায় চলে যায় তলায়— সেই জল টেনে টেনে মাটিতে ঢালেন। রতনকুঠির পিছন দিকে কিছুটা জমি নিয়ে মা-মেয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকেন। সেই মাটিতে শাক পাতা বাদাম যা হয় তাই শুধু খান, কাঁচা খান।

সেলাই-করা জামা পরবেন না। থান কাপড়ের দুটো টুকরো দুদিক দিয়ে ঘাড়ে গলায় গিঁট বেঁধে মাঝে মধ্যে কলাভবনে আসেন, ঘুরে ঘুরে দেখেন। আমার

জানালার কাছে এসে মেয়ের দিকে তাকিয়ে মা কী যেন বলেন, মেয়ে হাসে— ঝুঁকে পড়ে এদিক ওদিকে ঘুরে ঘুরে আমাকে দেখে। এই হাসি আর দেখা নিয়ে একদিন দেখি আমার খুব ভাব হয়ে গেছে 'বাবা' 'মামা'র সঙ্গে। মার মুখে যেন মাতৃসুলভ স্নেহও দেখতে পাই আমার প্রতি।

তাঁদের ঘরে যাই— উন্মুক্ত অঙ্গ দুজনের, সেই অবস্থায়ই আমাকে জড়িয়ে ধরেন, আদর করেন। নন্দদা এলে এক-একখানা টার্কিশ তোয়ালে গলায় বেঁধে সামনের দিকে ঝুলিয়ে দেন। কথাবার্তা বলেন, অর্থাৎ আকার ইঙ্গিত করেন।

একদিন এই মাকে কাঁকড়াবিছে কামড়ালো। কাঁকরের মাটিতে তখন আরো বেশি বিছে ছিল, কাঁকড়াবিছে তেঁতুলে বিছে— তেঁতুলে বিছেগুলি হলুদ হয়ে যেন পেকে টসটস করত। মা তো কাঁকড়াবিছের বিষের জ্বালায় অনেকখানি মাটি খুঁড়ে তার ভিতরে সর্বাঙ্গ ঢুকিয়ে শুয়ে রইল। তখনকার দিনে আশ্রমের পরিধি ছিল ছোটো, সব-কিছুই ছিল সবার নজরের সামনে। মেয়ে ব্যগ্র ব্যস্ত ভাবে তিড়িং বিড়িং করতে লাগল। নন্দদা এলেন, মেয়ে বোঝাতে পারে না কী ব্যাপার, শুধু বোঝায় কিছু একটা কামড়েছে। 'উ-হুঁ' শব্দ করে জানাতে চায় যে, বেশ যন্ত্রণা। নন্দদা কি বুঝলেন— মাটিতে দাগ কেটে একটা কাঁকড়া বিছে এঁকে দিলেন। মেয়ে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, মা-ও ছুটে এলেন গা থেকে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে, নন্দদাকে আদর করতে লাগলেন মা-মেয়ে দু দিক থেকে।

এই মা-মেয়ে অনেকদিন ছিলেন আশ্রমে। ইংরেজি শিখলেন চলনসই গোছের। কেটের থান কিনে মাঝামাঝি জায়গায় একটু ছিঁড়ে গলায় গলিয়ে ভদ্রগোছের একটা সাজ মতনও পরলেন। অয়েল পেন্ট-এ ছবিও আঁকলেন অনেক। তার পর কলকাতায় একজিবিশন করলেন। বরোদার রাজার নিমন্ত্রণ পেলেন। বোম্বে দিল্লিতে গেলেন। ওয়ার্ধা সেবাগ্রামে রইলেন। পাহাড়-পর্বত ঘুরলেন। শেষ দেখেছিলাম মা-মেয়েকে আমি আলমোড়ায়। সেই তখনো তাঁরা কাঁচা ফল-পাকুড় খেয়ে থাকেন। ঘরের তাকে সারি দিয়ে সাজিয়ে রেখেছেন টমাটো পীচ নাসপাতি আপেল চেরী। মা সেবারে একান্তে নিয়ে আমার কাছে একটু দুঃখ করলেন, এতদিনে তাঁর ভাবনা হচ্ছে তিনি চলে গেলে মেয়ে ঠিক পথে থাকবে কি-না।

মেয়ে আমাকে একান্তে পেয়ে দুঃখ করল— এখন আমার অনেক বয়েস হয়েছে, আমি জীবনটা জানতে চাই। মা তা কিছুতেই বুঝবে না। মেয়ে আমাকে

ভালোবাসত ঠিকই, কিন্তু মা যেন আমাকে একটু অন্যরকম ভালোবাসতেন। আমার মুখখানা ধরে যেন একটা করুণ করুণা জাগত তাঁর মুখে। সেই মুখখানাই মনে পড়ে আমার আজও।

এর কিছুকাল পরেই মা চলে গেলেন। মেয়ে একলা পড়ল। জীবনটা চালিয়ে নিল বড়ো বড়ো শহরে থেকে আর ছবি এঁকে।

মা-মেয়ে গুরুদেবের ছবিও এঁকেছিলেন কয়েকখানা। সে বড়ো মজার দৃশ্য। তখনো তাঁরা অন্য কোনো ভাষা জানে না। মা-মেয়ে এসে নানা ভাবে বুঝিয়ে রাজি করালো— গুরুদেবকে সিটিং দিতে হবে। এও বোঝালো গুরুদেব লেখা পড়া যা ইচ্ছে করতে পারবেন তখন, তাতে তাঁদের ছবি এঁকে যেতে কোনো অসুবিধে হবে না। বলে, মা-মেয়ে দুদিক থেকে গুরুদেবকে জড়িয়ে ধরে চুমোর পর চুমো খেলেন। যেন ছোটো ছেলেকে আদর ঢেলে ভুলিয়ে রেখে গেলেন।

গুরুদেব তখন থাকেন 'পুনশ্চ'তে। সামনের বারান্দায় বসে গুরুদেব লিখতে লাগলেন। মেয়ে ইজেলে ক্যানভাস রেখে ছবি আঁকছে। মা কড়া নজর রাখছেন— মেয়ে ঠিক করছে কি না। আবার গুরুদেবকেও দেখছেন তিনি অসুবিধে বোধ করছেন কি না। থেকে থেকে মা গুরুদেবের দু গালে হাত বুলিয়ে আদর করে আসছেন। মেয়েই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? সেও মার দেখাদেখি তুলি রেখে গুরুদেবকে আদর করতে বসে। আমরা গুরুদেবের অবস্থা দেখে মুখে আঁচল চাপা দিই তফাতে দাঁড়িয়ে। গুরুদেব বুঝতে পারেন, আমাদের দিকে আড়ে আড়ে চেয়ে তিনিও হাসেন।

মা-ও এঁকেছিলেন গুরুদেবের ছবি। মা-র ছবি হত একটু অন্য ধরনের— একটা যেন গভীরতা থাকত ছবিতে— তা পোর্ট্রেটই আঁকুন, কি ল্যাণ্ডস্কেপই আঁকুন। গান্ধীজীরও খুব ভালো একটা ছবি এঁকেছিলেন মা, আধা অন্ধকারে প্রার্থনায় বসেছেন। সমস্ত ছবিটাই একটা গ্রে রঙের উপর। দিল্লিতে পণ্ডিতজীর বাড়িতে দেখেছিলাম ছবিটি।

কত পাখি আশ্রমে আজকাল। আগেও ছিল, কিন্তু এত ছিল না। এখন কতরকমের কত বৃক্ষ-লতা চারি দিকে। গাছে গাছে কত নিরাপদ আশ্রয় পাখিদের। কত কোকিল ঘুঘু বউকথাকও, কুটুম পাখি, কত কুকু কাঠঠোক্রা খঞ্জনা ফিঙে বুলবুলি। ঝাঁকে ঝাঁকে কত টিয়াপাখি আসে পেয়ারা খেতে।

পাখির দল এসে সারি বেঁধে বসে টেলিফোন তারের উপর। এত ছিল না আগে। সবই ছিল, তবে সংখ্যায় ছিল অল্প।

সেদিন আঙিনার স্বর্ণচামেলির মাচাটায় ভিতর থেকে ডেকে উঠল পাখিটা— পিউকাঁহা পিউকাঁহা। এত কাছে হতে কখনো ডাক শুনি নি এ পাখির। বনে জঙ্গলে শুনেছি এ ডাক, দেখতে চেষ্টা করেছি, দেখতে পাই নি। ভেবেছি— হয়তো ছোটো হালকা পাখি, কোথায় যে লুকিয়ে ডাকে কি জানি। বড়ো স্পষ্ট তার ডাক— পিউকাঁহা পিউকাঁহা।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, পায়ে পায়ে মাচাটার কাছে গেলাম— দেখি, পাখিটা বসে আছে সেখানে। স্বর্ণচামেলির ঝোপটা ঘন নয়, উই-এ গোড়া খেয়ে খেয়ে লতাটার বাড়বাড়ন্ত রেখেছে দাবিয়ে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম তাই এতকাল পরে এই পাখিকে। ভেবেছিলাম পিউকাঁহা বলে যে পাখি এমন করে ডেকে ডেকে ফেরে সে না-জানি কত সুন্দর হবে দেখতে। দেখি, ধূসর রঙের পাখি, অনেকটা ঘুঘুর মতো রঙ কিন্তু ঘুঘুর গায়ে ছিঁটেফোঁটার যে সৌন্দর্য আছে এতে তা নেই। তা ছাড়া ঘুঘু তন্বী সুন্দরী, পিউকাঁহার দেহের আয়তন ঘুঘুর মতোই তবে এ স্থূলাঙ্গী। ঠোঁটও মোটা, মাছরাঙার মতো গড়ন ঠোঁটের।

কাছে গেলাম। তখনো ডেকে চলেছে পিউকাঁহা। যেন আমাকেই জিজ্ঞেস করছে পাখি। ভাবি, আমিই তো বলি পিউকাঁহা? আমি আবার কী জবাব দেব এর?

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। ঠোঁটটা একটু ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে ডেকেই চলল সে, যেন মজা পেয়ে বসল। পরে শিরিষ গাছটার ডালে গিয়ে বসল, সেখান থেকে ডাকতে লাগল। সে পাখি সে অবধি এ বাড়িতেই রইল। কাল মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল, জোর গলায় যেন কানের কাছে ডেকে উঠল পাখিটা। ঘড়িতে দেখি তখন রাত দেড়টা। জানালার কাছে বকুল গাছ, সেই গাছ হতে পাখিটা যেন চিৎকার করতে লাগল— পিউকাঁহা— পিউকাঁহা— পিউকাঁহা। একাকী পাখির সে এক পরিত্রাহী ডাক। বাকি রাতটুকু ঘুমুতে দিল না আর। কী হয়েছিল তার জানব কেমন করে?

কত পাখির কাকলি আজ আশ্রম জুড়ে। সকালে তাদের কলধ্বনি, সন্ধ্যায় তাদের কলরব; আর দুপুরবেলা, কি জানি, আমার কানে তো লাগে— এ কাকলিও নয়, কলরবও নয়; দুপুরবেলা পাখিদের ডাকে যেন অনেকটা কান্নার সুর ভাসে। দোয়েলের শিশ কত মধুর, এই দোয়েলটাও থাকে বকুল গাছে। প্রতিদিন

সকালে প্রথম ডাক শুনি তার। এই দো'য়েলই যখন ভরদুপুরে টেনে টেনে শিশ দেয় মনে হয় যেন কাঁদে।

শীতে বসন্তে কত রকমের পাখি আসে। এরা সব ভিনদেশী। দু দিনের অতিথি। আশ্রমের উত্তর-পশ্চিমে হয়েছে 'রিজার্ভ ফরেস্ট ডিয়ারপার্ক'। খোয়াই জুড়ে কত গাছ-গাছালি, আছে জলভরা 'লালবাঁধ', ময়ূরাক্ষীর রিজার্ভয়ার। জল চিক্‌চিক্ করে এই দিকটা। শীতকালে লক্ষ লক্ষ হাঁস আসে এই জলে— আকাশ কালো করে আসে তারা, শীতের শেষে আবার আকাশে মেঘ ভাসিয়ে উড়ে যায়।

বারে বারে মনে পড়ে, গুরুদেব দেখলে কত খুশি হতেন। এখন এত জল, একটু জল দেখবার জন্য কত আগ্রহ ছিল তাঁর। মাটি খুঁড়ে পাওয়া জল— এ জল সে জল নয়। সে বছর আমাদের স্বাধীনতার আগে কি পরে মনে নেই, একজন বিদেশীরই পরামর্শে 'লালবাঁধ' হল।

উত্তরায়ণের উত্তর-পশ্চিমে মাটি ধুয়ে যাওয়া লাল কাঁকরের স্তূপ যেখানে উঁচু-নিচু আকারে খোয়াই সৃষ্টি করে রেখেছে, রথীদা সেইখানটার খানিকটা বেছে নিয়ে পাড় বাঁধিয়ে দিলেন। বৃষ্টির জল বাইরে যেতে পারল না, আট্‌কা পড়ল সেখানে। বন্দীজল তলায় পলিমাটি ফেলল। কয়েক বছরের মধ্যে সেই পলিমাটি সিমেণ্টের মতো মাটির স্তরটা 'সিল্‌ড্' করে দিল। বর্ষার জল বাইরে তো যেতেই পারে না— তলায়ও আর শুষে যায় না। খোয়াইয়ের খানাখন্দগুলি ভর্তি হয়ে বছরে বছরে বর্ষার জল পাড় অবধি থৈ থৈ করে। লাল কাঁকরের খোয়াই-ধোয়া লাল জলের পুকুর— লালবাঁধ নাম নিল। এখন সাঁওতাল গ্রামের লোকেরা স্নান করে, ধোপারা কাপড় কাচে। মাছগুলো নাড়াচাড়া খেয়ে দ্রুত বড়ো হয়।

এই লালবাঁধের পাশাপাশি এইভাবে বাঁধ দিয়ে আর একটা ঢালু খোয়াইতে জমা থাকে এসে ময়ূরাক্ষীর জল। অসময়ে খেতে সেচ দিতে কাজে লাগে লোকেদের। এই জলেই হাঁস আসে শীতকালে। পাতায় পাতায় ঢাকা পদ্মবনের মতো কালো হয়ে থাকে তখন জল পাতিহাঁসের কালো ডানায় ছেয়ে। এত হাঁসের কলরব মিলে ইঞ্জিনের আওয়াজ তোলে জলে সারাটা দিন।

শরতে সূর্যাস্তের লাল রঙে ভরে যায় জল। আকাশের নীল মেঘের ছায়া সব এসে খেলা করে এই জলে। শর গাছের ফাঁক দিয়ে ঝিকমিক করে ওঠে যখন বাঁধের জল— অকারণই তাকিয়ে থাকি। জল মন টানে।

পিয়ার্সন সাহেব এনেছিলেন বিদেশ হতে গাছ, শক্ত মাটিতে হয় এ গাছ। নিজেই বীজ ছড়ায়, নিজেই বেড়ে ওঠে। কারো যত্নের অপেক্ষা রাখে না। সরু একফালি চাঁদের মতো পাতার গড়ন, ঝিরঝিরে ফুল হয় হলুদ রঙের। একটা চাপা মিষ্টি সৌরভ এ ফুলে। তলায় গেলে মাথার চুল যেন হলুদ রেণুতে ছেয়ে যায়, ঝুরঝুর করে অবিরত ঝরে পড়ে ফুল। গুরুদেব নাম দিলেন ফুলের 'সোনাঝুরি'। এই সোনাঝুরি গাছ ছড়িয়ে দেওয়া হল ডাঙায়, খোয়াইতে। শিকড় মাটি আঁকড়ে রইল। এখন আর মাটি ধুয়ে যায় না বর্ষার জলে। খোয়াইও আর হয় না। রুক্ষ রাঙা খোয়াইয়ে এখন সবুজ বন। আশ্রমের পশ্চিম দিকে বন— উত্তরে বন। আশ্রমের মাঝেও কত গাছ কত সোনাঝুরি। আগে কম বৃষ্টি হত এখানে। মেঘ এসেছে আকাশ জুড়ে, কত আশা বৃষ্টি হবে এবারে; মেঘ চোখের সামনে গর্জন করতে করতে শাল গাছগুলির মাথা পেরিয়ে চলে গেল দূরে নাগালের বাইরে। এখন কত বৃষ্টি, শুনি গাছ মেঘকে টেনে নামায়। এক বছর কী বর্ষাই না হল। বর্ষার প্রতি মন প্রায় বিরূপ হয়ে উঠেছিল। এখানে তবু বর্ষায় একটা সুবিধে আছে— জল থকথকে কাদা হয় না। এমন পোরাস্ মাটি সঙ্গে সঙ্গে জল মাটির তলায় তলিয়ে যায়; বালি মাটি ঝরঝর করে।

পিয়ার্সন সাহেবকে আমি দেখি নি। অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবকে দেখেছি, খুব কাছে পেয়েছি। অতি স্নেহভরা প্রাণ ছিল যে তাঁর। ছটফটে মানুষ ছিলেন, নানা দেশ ঘুরে বেড়াতেন। কোথাও যেন স্থির হয়ে বসতে জানতেন না। তাঁর চলাটাও ছিল তেমনি, কোনার্ক থেকে উদয়নে যাচ্ছেন, কি উদয়ন থেকে শ্যামলীতে আসছেন— এইটুকু তো পথ, যেন ছুটে চলতেন। যেন বিষম এক জরুরি কাজের তাড়া তাঁর চলায় থাকত সারাক্ষণ। মোটা— খুবই মোটা চামড়ার পাম্পসু পায়ে, বগলে একগোছা কাগজপত্র ফাইলের মতো ধরা— অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব চলাচল করছেন আশ্রমের ভিতরে। গুরুদেব ছিলেন প্রাণের অধিক, গুরুদেবের আশ্রম ছিল তাঁর প্রাণ। আশ্রমের পথঘাট বাড়িঘর গাছগাছড়া সবেতেই তাঁর স্নেহদৃষ্টি বুলিয়ে চলতেন। মোটা খদ্দরের ধুতি, খদ্দরের সার্ট— এই ছিল তাঁর সাজ। যখন আশ্রমে আসতেন গুরুদেবের কাছাকাছি থাকতেন। গুরুদেব যখন কোনার্কে থাকতেন— পাশের ছোটো ঘরখানায় থাকতেন তিনি। আমরা সেই ঘরটিকে বলতাম অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবের ঘর, যখন তিনি থাকতেন না তখনো বলতাম।

ব্যস্ত মানুষ বলে যে কিছু উপেক্ষা করছেন তা দেখি নি কখনো। কত সময়ে দেখেছি— সত্যি সত্যিই কাজের তাড়া তাঁর। চলেছেন, শিশু অভিজিৎ কাঁকরের আঙিনায় খেলা করছে, অ্যাণ্ডুজ সাহেব বই কাগজ মাটিতে রেখে তার সঙ্গে খেলতে লেগে গেলেন। আত্মভোলা মানুষ।

আপন পর ভেদাভেদ ছিল না সাহেবের। নিজের জিনিস বলে যেমন কিছু ছিল না তাঁর, পরের দ্রব্য বলেও খেয়াল ছিল না কোনো। হাতের কাছে যা পেতেন মায় নিজের গায়ে জড়ানো চাদরটিও দিয়ে দিতেন কারও দুঃখকষ্ট দেখলে। একবার দিল্লী যাবেন, শীতকাল, ট্রেনে গায়ে দিতে সুধাদার কাছ হতে চেয়ে একটা সাধারণ কম্বল নিয়ে গেলেন। আশ্রমে ফিরে এসে তিনি সুধাদাকে একটা কম্বল ফেরত দিলেন বটে, কিন্তু সেখানা ছিল দামি বিলিতি কম্বল। সুধাদা ভাবলেন সাহেব হয়তো ভুল করে অন্য কারো কম্বল দিলেন আমাকে। বললেন— এটা তো আমার কম্বল নয়। সাহেব বললেন, ট্রেনে দেখলাম একটি লোক শীতে কষ্ট পাচ্ছে তাকে তোমার কম্বলখানা দিয়ে দিলাম। ফিরবার সময়ে তোমার কম্বলের কথা মনে পড়ল। প্রফেসর রুদ্রের বাড়িতে ছিলাম, আমার বিছানায় অনেকগুলি কম্বল পাতা ছিল— তোমার জন্য তা হতে একখানা নিয়ে এলাম।

এ-রকম ঘটনা সাহেবকে ঘিরে ঘটেই চলত। সাহেবকে সবাই জানতেন, ভালোবাসতেন, তাই কেউ কিছু মনে করতেন না, বরং খুশিই হতেন। সাহেবের নামই হয়ে গিয়েছিল দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ। প্রকৃতই তিনি দীনবন্ধু ছিলেন।

সেবার গুরুদেবের মাটির বাড়ি 'শ্যামলী' তৈরি হচ্ছে। মজুররা স্ত্রী-পুরুষে মিলে কাজ করছে সারাদিন। দূর গ্রাম থেকে এসেছে কেউ কেউ, তারা আর রোজ গ্রামে ফিরে যায় না। ওখানেই রান্না করে, খায়। রাত্রে কোনার্কের পশ্চিম দিকের পিছনের বারান্দায় শিশু-পুত্রকন্যা নিয়ে শুয়ে থাকে, সকালে উঠে আবার কাজে লাগে। তখন শ্রাবণ মাস, মাঝে মাঝেই বৃষ্টি নামে। একদিন রাত্রে এমনিতরো বর্ষা নেমেছে— বারান্দার ছাদটুকু শুধু ঢাকা, পাশটা খোলা। জলের ছাট এসে লাগছে গায়ে। শিশুরা শীতে কুঁই কুঁই কাঁদছে। আমাদের শোবার ঘরের শিয়রের দিকেই এই লম্বা বারান্দা। সাহেবের ঘর পুব দিকে বেশ খানিকটা দূরে। সেখান হতে সাহেব শুনতে পেলেন শিশুদের কান্না। গভীর রাত, সাহেব উঠলেন, দু-তিন ঘর পেরিয়ে আমাদের শোবার ঘরে এসে আমার স্বামীকে ডেকে তুললেন, বললেন, দেখো তো অনিল কে কাঁদছে, কোথায় কাঁদছে। তাঁরা দুজনেই পিছনের

বারান্দায় গেলেন, শিশুদের দেখে সাহেব 'হায় হায়' করে উঠলেন। নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় সুজনী চাদর কম্বল যা-কিছু ছিল এনে তাদের দিলেন। শিশুরা চাদরের নীচে মা-বাবার বুকে গুটিসুটি মেরে আরামে ঘুমোতে লাগল।

পরদিন ভোরে সাহেব গিয়ে বোঠানকে বললেন, বৌমা আমার বিছানায় কিছু চাদর সুজনী পাঠিয়ে দিয়ো। কাল সেগুলি বিলি হয়ে গেছে।

শুনে বোঠান হাসলেন। এ কাজ বোঠানকে প্রায়ই করতে হত।

শিশুর মতো মন ছিল সাহেবের। স্বভাবটিও ছিল তেমনি। শুনেছি গল্প, একবার— তখন নতুন নতুন আসা-যাওয়া করছেন সাহেব এ দেশে— একদিন তরমুজ খেয়ে সাহেব খুব খুশি। গরমের দিন, জলভরা মিষ্টি তরমুজ, 'আরো দাও, আরো দাও' বলে চেয়ে নিয়ে খাচ্ছেন। যাঁরা কাছে ছিলেন তাঁরা বলছেন, 'আর খেয়ো না সাহেব, তরমুজ বেশি খেলে হজম করা শক্ত।' তরমুজ খেতে ভালো লেগেছে— সাহেব কি থামতে পারেন? অনেকটাই খেয়ে ফেললেন। তরমুজ খেয়ে শেষে হয়ে গেল তাঁর কলেরা, হলেন মরণাপন্ন। কলকাতায় খবর পাঠানো হল লর্ডবিশপকে আসবার জন্য। ভুবনডাঙার মাঠে কবর খোঁড়া হল। সব তৈরি। শেষ নিশ্বাসটুকু পড়ার শুধু বাকি। ধরতে গেলে সাহেব সেবার কবরের মুখ থেকে বেঁচে উঠে এলেন।

চার পাশে মাটির স্তূপ-করা খুঁড়ে রাখা কবরটি পড়ে ছিল বহুকাল পর্যন্ত। আমরাও দেখেছি সেই কবর। বলতাম, 'ঐ যে সাহেবের কবর'। এখন এতদিনে রোদে জলে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আর তার চিহ্ন নেই।

খুব চিঠি লিখতেন সাহেব। কত যে লিখতেন তার হিসাব ছিল না। একখানা কি দুখানা চিঠি লিখলেন, লিখেই ছুটে ছুটে গিয়ে পোস্ট আপিসের বাক্সে ফেলে দিয়ে আসতেন। এসে আবার লিখতে বসতেন। একসঙ্গে সেদিনের মতো সব চিঠি লিখে পোস্ট করবেন— তা তাঁর স্বভাবে ছিল না। দুপুর রৌদ্রে এমনিতরো ছুটে ছুটে ডাকঘরে কতবার যে যেতেন আসতেন, দেখে মনে হত যেন এই মুহূর্তেই পোস্ট না করলেই নয় এমনই জরুরি ব্যাপার এটা।

আমার স্বামী একদিন বললেন তাঁকে, গুরুদেবের চিঠিগুলি নিয়ে যখন পোস্ট করতে যায় মহাদেব, তখন আপনার চিঠিগুলিও নিয়ে যাবে সে। এই রোদ্দুরে আপনি কেন এত কষ্ট করে যান।

সাহেব চিঠি হাতে চলতে চলতেই হেসে গানের কলি গেয়ে উঠলেন, Noel

Coward এর কবিতা 'দুপুর রৌদ্রে শুধু পাগলা কুকুর আর ইংলিশম্যানই বাইরে যায়'।

তখন গুরুদেব থাকেন শ্যামলীতে, কোনার্কে থাকি আমরা আর সাহেব। তাঁকে বললাম একদিন— আপনার একটা পোর্ট্রেট স্কেচ করব। সাহেব কী একটা কাজে বগলে ফাইল চেপে যথারীতি ছুটে চলবার জন্য পা বাড়িয়ে ছিলেন, তৎক্ষণাৎ কাজ ভুলে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে এসে বসলেন কোনার্কের সামনের বারান্দায়। বললেন, এখনই করো।

সেই মুহূর্তে তৈরি ছিলাম না আমি, কিন্তু তিনি তৈরি। কী করি, তাড়াতাড়ি কাগজ ক্রেয়ন-পেন্সিল নিয়ে বসলাম। 'প্রোফাইল' আঁকতে সহজ লাগে আমার, তাড়াতাড়িও হয়। প্রোফাইলই আঁকলাম। শেষ হলে বোর্ডসমেত স্কেচটা সাহেব কোলের উপরে নিয়ে বললেন, রানী, আমার প্রোফাইল আঁকলে কেন? বলে হেসে নিজের নাকে হাত দিয়ে দেখালেন, দেখছ না আমার নাকটা খাটো। যাদের খাটো নাক তাদের প্রোফাইল ভালো হয় না। চীনে-জাপানীদের প্রোফাইল আঁকলে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হয়। আমার আর একটা স্কেচ করো সামনে থেকে। ব'লে সাহেব সুবোধ বালকের মতো পোজ দিয়ে বসলেন। সেদিন আর-সব কাজের কথা ভুলেই গেলেন।

মনে পড়ে একখানা ছবির কথা— প্রায়ই মনে পড়ে। কলাভবনের দেয়ালে টানানো হত মাঝে মাঝে। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা— লম্বাটে ধরনের ছবিখানা। ছবিতে আর-কিছু নেই। কাছাকাছি মুখোমুখি বসে আছেন শুধু গুরুদেব, সাহেব, আর গান্ধীজী। ঘটনাটা ঘটেছিল বোধ হয় কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। সেকালে পরাধীন ভারতের কোনো এক গোপন বিষয়ের আলোচনা করতে বসেন তিন জনে ঘর বন্ধ ক'রে।

সেই ছবিতে দেখেছি সাহেবের মুখ— মুখের রঙ— অপূর্ব পোর্ট্রেট।

অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ভাবলেম কী করছেন তিনজন দেখিই না একবার। দরজার ফুটো দিয়ে চুপিচুপি এক ঝলক দেখে নিলেন।

ঐ এক ঝলকে এমন দেখা দেখলেন— তিনজনের এমন ছবি আঁকলেন— সামনে বসে আঁকাকে তুচ্ছ করে দেয়।

সাহেব নিজে এক সময়ে ছবি আঁকতেন, কবিতাও লিখতেন— শুনেছি সে কথা সেদিন তাঁর মুখে। তাই আঁকার মর্ম তিনি জানতেন, উপদেশ দিতে

পারতেন। তাঁর সম্বন্ধে কত ঘটনা কত কাহিনী বলার আছে। এমন মহৎ প্রাণের মানুষ জগতে দুর্লভ।

সাহেব ও গুরুদেবের একে অন্যের প্রতি ভালোবাসার তুলনা ছিল না। লোকে না জেনে কত সমালোচনা করে, সব তো কানে আসে না তাই জানতে পারি না। যেমন শুনি লোকে অনুযোগ করেছে— এখনো করে যে, রবীন্দ্রনাথ মারা গেলেন, তাঁর পুত্র শেষকৃত্য করতে গেলেন না শ্মশানে। এ কথাটা ঠিক এভাবে সত্য নয়। ঘটনাটা বলছি পরে। আগে সাহেবের কথাটা বলে নিই।

কিছুকাল আগে সেদিন একদিন সন্ধেবেলা 'জিৎভূমে'র এই ঘরেই বসে কথায় কথায় ক্ষিতীশ বলল আমার স্বামীকে যে গুরুদেব একটা অন্যায় কাজ করেছেন। অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব যখন হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায়— গুরুদেব একবার দেখতে যান নি তাঁকে।

আমার স্বামী তখন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত। শুনে তিনি চমকে উঠলেন। বললেন, কে বলেছে এ কথা?

ক্ষিতীশ বললে— অনেকেই বলে এবং তিক্ততার সঙ্গেই বলে। রবীন্দ্র-জীবনীতেও কোথাও লেখা নেই যে গুরুদেব অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবকে দেখতে কলকাতায় হাসপাতালে গিয়েছিলেন।

স্বামী বললেন, আমি নিজে সঙ্গে ছিলাম।

ক্ষিতীশ আমাদের ঘর থেকেই প্রভাতদাকে ফোন করল যে, এত বড়ো সংবাদটা তিনি জানলেন না কি করে?

ওদিক থেকে কী কথা হল জানি না— এদিক থেকে ক্ষিতীশের ভাষাটা তেমন মোলায়েম ছিল না। আমার একটু অস্বস্তিই লাগছিল।

শেষের কয়বৎসর সাহেবের স্বাস্থ্য ভালো চলছিল না। কখনোই তো তিনি স্বাস্থ্যের প্রতি তাকাতেন না। ১৯৪০ সালের প্রথম দিকে সাহেব খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কলকাতায় প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হল। দিন-দিনই শরীর ভাঙতে লাগল। কঠিন অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হল। রোজ খবর আসছে যাচ্ছে। বোঝা গেল এবারে তাঁর যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

গুরুদেবের স্বাস্থ্যও সে সময়ে সুস্থ ছিল না। তবু সাহেবের মৃত্যুর কয়দিন আগে গুরুদেব কলকাতা গেলেন তাঁকে দেখতে। সঙ্গে আমার স্বামী ও আলুদা গেলেন।

আমার স্বামীর কাছে শুনেছি, দোতলার সিঁড়ির কাছেই ছোটো একটি ঘরে সাহেব শুয়ে আছেন বিছানায়— অর্ধ-অচেতন অবস্থা। স্বামী বর্ণনা দিয়ে বলেছিলেন আমাদের— দেখাচ্ছিল যেন ছোট্টখাট্টো মানুষটি। দাড়ি-গোঁফ কামানো, শিশুর মতো মুখখানি। রোগক্লিষ্ট মুখ। দাড়ি-গোঁফ ভরা মুখের যে মানুষটিকে আমরা জানি তার সঙ্গে এই চেহারার কোনোই মিল ছিল না।

গুরুদেব গিয়ে পাশে দাঁড়ালেন। গুরুদেবকে দেখে সাহেব দু-একবার কথা বলবার চেষ্টা করলেন— পারলেন না। গুরুদেব হাত তুলে তাঁকে কথা বলতে বারণ করলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে থেকে গুরুদেব চলে এলেন। এই তাঁদের শেষ দেখা।

আলুদা সাহেবের দাড়ি-গোঁফ কামানো মুখখানার কথা বলতে বলতে জলভরা চোখে কেবলই বলতে লাগলেন, আহা, দেখাচ্ছিল যেন ছোবড়া-ছাড়ানো নারকেলটি। এর বেশি আর কোনো উপমা আলুদা হাতড়ে পাচ্ছিলেন না। বলছিলেন, আর 'আহা' 'আহা' করছিলেন।

এর কিছুদিন পরে সাহেবের চলে যাবার খবর এসে পৌঁছল। গুরুদেব জাপানীঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণে জানলার পাশে বসে লিখছিলেন। খবর পেয়ে ধীরে ধীরে হাতের কলমটি নামিয়ে রাখলেন। টেবিল হতে মুখ তুলে জানালা বরাবর বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলে পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলেন।

এর ষোলো মাসের মধ্যে গুরুদেবও চলে গেলেন।

এই ব্যাপারে লোকের এমন ভুল সমালোচনার কথা জানতে পারি নি এতকাল। যখন জানা গেল তক্ষুনি স্বামী লিখলেন ঘটনাটা। ১৩৮২ সালের ২৭ চৈত্র লেখাটি বের হল 'দেশ' পত্রিকায়। এর এগারো দিন পরে ১৩৮৩ সালের ৮ বৈশাখ আমার স্বামীও চলে গেলেন এপার হতে ওপারে।

ভাবি, ভাগ্যিস তিনি লিখে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন ঘটনাটা। নয়তো গুরুদেব সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা থেকে যেত।

আমার স্বামী আরো যা যা বলতে পারতেন, সবই না-বলা রয়ে গেল। জীবনের প্রান্তে এসে সবে মন প্রস্তুত করেছিলেন লিখবেন বলে, হল না আর তা। যা হল না তা নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই।

গুরুদেবের আশ্রমের আমরা সবাই ছিলাম অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবের বড়ো আপনার জন। আমাদেরও তিনি ছিলেন বড়ো আপনার। বড়ো আপন মানুষ। বিদেশী বলে মনেই হত না। কোনো বিদেশীকেই না। শান্তিনিকেতনে সবাই যেন সবার

আপন। কত বিদেশীই তো এসেছে, মিশে এক হয়ে গেছে। এক হয়ে গেছে মনের সঙ্গে মনে, প্রাণের সঙ্গে প্রাণে। পরে কতকাল বাদে হয়তো আবার দেখা— সঙ্গে সঙ্গে সেই সুরটি বেজে উঠেছে, এক পলক দেরি হতে পায় নি। শান্তিনিকেতন যেন কী এক অদৃশ্য সূত্রে বেঁধে রাখে এক করে সবাইকে।

শান্তিনিকেতনে এসেছে থেকেছে, শান্তিনিকেতনকে ভালোবেসে ফেলেছে। এর ব্যতিক্রম দেখি নি।

প্রাগে গেলাম, লেসনি তখন চলে গেছেন। মিসেস লেসনির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, ফ্ল্যাটে একাকী বসে আছেন ভদ্রমহিলা। ভারতের নানা জিনিসে ঘর ভরা, ভারতবর্ষকে যেন ঐটুকু ফ্ল্যাটের ভিতরে ধরে নিয়ে বসে আছেন বৃদ্ধা। কতকাল আগের দেখা— আমাদের চেহারায়ও আর সে-মিল নেই, তবু দেখে কী খুশি। শান্তিনিকেতনে কোথায় নতুন বাড়ি উঠল, ছাত্রছাত্রী কত বাড়ল, গুরুদেবের জিনিসপত্র কোথায় যত্নে রাখা হল— মায় ছাতিমতলার খবরটিও নিলেন এক-এক করে। বিদায় নেবার সময়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন— কী দেবেন, কোন্ স্মৃতি দিয়ে ধরে রাখবেন। ঘরের শেলফে শেলফে ঘুরে ঘুরে একটি কাট গ্লাসের গ্লাস তুলে বললেন, এইটি নাও। এতে আমাদের নামের ইনিসিয়াল লেখা আছে, 'L'। দেখলেই মনে পড়বে আমাদের। নিজের সেট ভেঙে গ্লাসটি তুলে দিলেন হাতে। এক পুত্র থাকে মার সঙ্গে। বললেন, আলাদাই থাকত, ডিভোর্স হবার পর আমার ছেলে ফিরে এসেছে আমার কাছে।

হাঙ্গেরিতে আমাদের শান্তিনিকেতনের এক প্রফেসার নামটা মনে পড়ছে না, হয়তো গারমানুস হবেন, তাঁর সঙ্গে দেখা। জমজমাট এক সরকারি পার্টি— বৃদ্ধ প্রফেসর শান্তিনিকেতনের আমরা এসেছি শুনে এসেছেন পার্টিতে। পার্টির আর কারো দিকে নজর নেই, প্রফেসর তাঁর চোখ দিয়ে মন দিয়ে যেন আমাদের আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রাখলেন। ভাবি, এ যোগ কিসের যোগ? শান্তিনিকেতনের মাটি যেন এঁদের মনকে আঁকড়ে রেখেছে।

প্রফেসর বললেন, সেই ছাতিমতলা— শাল গাছ, লাল মাটির পথ; দূরে পশ্চিম আকাশ রাঙিয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, সাঁওতাল গ্রাম— ঘরে ঘরে ঘুঁটের আগুনে উনুন ধরিয়েছে— ধোঁয়া উঠছে— আঃ বলে টেনে এক নিশ্বাস নিলেন, যেন ধোঁয়ার গন্ধটা তখনো পেলেন।

এ তো ইতিহাস নয়। কার কথা বলব? কতজনই তো এসেছেন, গেছেন।

কত স্মৃতি কতখানি মন জনে জনে তাঁরা রেখে গেছেন এই ধুলোয় মিলিয়ে। কত আনন্দের মুহূর্ত কাটিয়েছি কতজনের সঙ্গে। কত কৌতুক কত মজা পেয়েছি— কত ঘটনায়— কত আচরণে।

সুন্দরী যুবতী কন্যা 'এটা' এল হাঙ্গেরি থেকে। তখন বিদেশীরা এলে রতন-কুঠিতে থাকত। ঐটিই সে সময়ে একমাত্র স্থান ছিল আরাম করে থাকবার। রতন টাটার টাকায় বানানো বাড়ি, অর্ধচন্দ্রাকারে তৈরি করা, প্রতিটি ঘরে সমানভাবে ঢোকে আলো-হাওয়া। প্রতি ঘরের সঙ্গে বাথরুম।

রতনকুঠিরই একটা ঘরে রইল 'এটা'। কান্তিবাবু বিদেশে গিয়েছিলেন, বিবাহ ঠিক করে এসেছিলেন। কনে 'এটা' একাই থাকে, আমরা দেখাশুনো করি, তাকে ঘিরে থাকি। কান্তিবাবু থাকেন কলকাতায়, রিটায়ারের সময় হয়ে এসেছে, ওদিকটা গুছিয়ে একেবারে পাকাপাকি ভাবে আসবেন শান্তিনিকেতনে থাকতে।

বিবাহ কলকাতাতেই হল। কান্তিবাবুর আকাঙ্ক্ষা গুরুদেব তাঁদের আশীর্বাদ করেন। গুরুদেব থাকেন তখন 'পুনশ্চ'তে। আমরা কনেকে সাজিয়ে নিয়ে এলাম, বরের ললাটেও চন্দন দিলাম, গুরুদেব বর-কনেকে সামনে বসিয়ে আশীর্বাদ করলেন। অতি সুন্দর লাগছিল এটাকে দেখতে।

কান্তিবাবু আর এটার মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল অনেকটা, তাতে বিন্দুমাত্র হেরফের হয় নি, অতি সুখে, আনন্দে তারা ঘর সংসার করতে লাগলেন। নিজেদের জন্য একটি নতুন বাড়ি তৈরি করে সুরুচির সঙ্গে সাজিয়ে নিলেন। এটার উৎসাহ আর উচ্ছ্বাসে তাঁদের দুজনের সংসার বন্ধু-বান্ধব আদর-আপ্যায়নে জমজমাট হয়ে থাকত। কত যে খেয়েছি তাঁদের বাড়িতে, কত রান্না শিখেছি এটার কাছে। আশ্রমে কারো অসুখ অসুবিধা হলে এটা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত। খুব ভালো রান্না করতে জানত। প্রায়ই দেখা যেত সুপ নয় মাংস রান্না করে হাতে নিয়ে ছুটছে, কাউকে খাওয়াতে যাচ্ছে। এটা হাঁটতে জানত না, ছুটত। হাসতে হাসতে ছুটত। ওর কথা-বলা মানেই হাসা। সকল কথাতেই হাসি তার উপ্‌চে উঠত।

শ্রীনিকেতনে আমাদের পিকনিক— গোটা আশ্রমের; কার্যের পুকুরপাড়ে। অনেকে আগে গিয়ে রান্না চাপিয়েছে, অনেকে পরে আসছে। এটারও দেরি হল আসতে। ছুটতে ছুটতে আসছে, মাংসটা রান্না করার কথা তার। গরমের দিন, রোদের তাত, বিদেশী মেয়ে, ফরসা মুখখানা গরমে লাল টকটক্ করছে, যেন রক্ত ফেটে পড়ল বলে। এটা এসেই গাছতলায় বসে পড়েছে। ভক্ত নামে শিক্ষাভবনের

ছাত্র ছিল একটি— সাদাসিধে ছেলে। সে সহানুভূতিতে ভেঙে পড়ল, এটার লাল মুখখানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটাদি— ইউ আর লুকিং ব্লাড্ডি'। এটা হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল।

কান্তিবাবু চলে গেলেন। কয় বছর বাদে এটারও শরীর অসুস্থ হল। ধরা পড়ল পেটে ক্যানসার। আমরা তখন দিল্লিতে, এটা দেশে যাবে মা-বাবার কাছে। দেখা করতে এল— তেমনিই হাসি হাসতে হাসতে বলল তার রোগটা কী। যেন এ খবরটাও তরুণদের সেই 'ব্লাড্ডি' বলার মতো হাস্যকর একটা ব্যাপার।

দেশে যাবার কিছুদিন বাদে এটাও একদিন চলে গেল। ভাবি, এত যে হাসতে পারত, সে বোধ হয় যাবার সময়েও তার মা-বাবার কান্না দেখে এমনি ভাবে হাসতে হাসতেই চলে গিয়েছিল।

৮

লাইব্রেরির পশ্চিম দিকটায় ছিল একটা প্রকাণ্ড সেগুন গাছ। তাল গাছও ছিল একটা। কত শোভা খেলত এই সেগুন গাছে। তাকিয়ে থাকতাম। ডাল ডাল সবুজ পাতায় ছেয়ে থাকত গাছ। তার প্রতিটি পল্লবে ছড়ানো-মঞ্জরীতে ফুল আসত যখন, যখন ঝড়ের মেঘ থম্‌থম করত আকাশে— সেই কালো মেঘের গায়ে ফুলভরা সেগুন গাছের মাথা অপূর্ব এক সৌন্দর্যে ভরে উঠত। তার পর যদি কোনো দিন পশ্চিম আকাশের আলো এসে পড়ত তো রূপের তুলনা থাকত না এর। ফুল যখন ঝরে যায়, শুকনো গোটাগুলি নিয়ে শুকনো মঞ্জরী যখন দাঁড়িয়ে থাকে গাছ ছাপিয়ে— তখনো একটি আশ্চর্য রূপ থাকে সেগুনের। এর রূপের যেন ঘাটতি পড়ে না কখনো।

এই সেগুন গাছের তলায় দেখেছিলাম একবার ছোরা-তলোয়ারের খেলা। মনোমোহন ঘোষ মশায় তখন আশ্রমের মেয়েদের ছোরা খেলা লাঠি খেলা শেখাতেন। ছেলেদেরও শেখাতেন। কিন্তু আমাদেরটাই মনে আছে বেশি করে। কোমরে আঁচল জড়িয়ে ছোরা হাতে যখন 'তামেচা বাহেরা শির মুণ্ডা' করা হত— বড়ো ভালো লাগত— যারা দেখত এবং যারা শিখত উভয়পক্ষেরই। বাঁ হাতে প্রতিপক্ষের আঘাত এড়াবার ভঙ্গিটাতে একটা বীরাঙ্গনা ভাব ফুটে উঠত।

এই মনোমোহনবাবুর গুরু এলেন আশ্রমে। খেলা দেখালেন। শব্দভেদী বাণ মারা, কানের পাশ ঘেঁষে ছোরা ছুঁড়ে দেওয়া— অনেক-কিছুই দেখালেন, কিন্তু

একটা খেলা ভাবতে আজও বুক-পিঠটা শিরশির করে ওঠে। ভীষণ ভয়ানক লাগল সেদিন সে খেলা। সেগুন গাছের তলা ঘিরে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি, বিকেলবেলা, রুদ্ধশ্বাসে একটার পর একটা খেলা দেখছি ; শেষ খেলা— একটি পাঠভবনের ছেলে এসে শুয়ে পড়ল মাটিতে ; আজও ভাবি কী ডাকাবুকো ছেলেই ছিল সে। গুরু-ভদ্রলোক দর্শকদের ভিড়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে এখন যেখানে চৈত্তী— সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। দুচোখ তাঁর কাপড় দিয়ে বাঁধা। হাতে মোষ বলি দেবার প্রকাণ্ড ভয়ংকর এক খড়্গ। ভদ্রলোক সেখানে দাঁড়িয়ে ছেলেটির নাম ধরে ডাক দিলেন। ছেলেটি উত্তর দিল— এই যে। ভদ্রলোক স্বর শুনে শুনে এগিয়ে আসতে লাগলেন। তিনি একবার করে ডাকেন আর ছেলেটি বলে 'এই যে'। ছেলেটির খালি গা— চিত হয়ে সটান শুয়ে বুকের উপরে রাখা একটি পানের পাতা। ভদ্রলোক— 'এই যে' 'এই যে' শুনে ছেলেটির থেকে হাত-তিনেক দূরে এসে দাঁড়ালেন। হাতে উদ্যত খড়্গ। ভদ্রলোক ছেলেটির বুক বরাবর এক কোপ বসালেন। বুকের পানটা দু'অর্ধেক হয়ে গেল। ছেলেটি গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। বুকে একটু আঁচড়ও লাগে নি।

এর পরে এসেছিলেন তাকাগাকি। জাপানে যুযুৎসু বিখ্যাত। নানা প্রকারের মার প্যাঁচ শেখাতে লাগলেন তাকাগাকি আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের। মোটা সুতির ঢিলেঢালা কোট-পাজামা পরে একই সাজে যুযুৎসু শিখত ছেলেমেয়েরা। ঘুষোঘুষি নয়, কুস্তির লড়াই নয় ; স্থির ধীর আক্রমণ, স্থির ধীর প্রতিরোধ।

সেবার আর-একজন খুব নামকরা যুযুৎসু লড়িয়ে এসেছিলেন আশ্রমে বেড়াতে। সে বড়ো সুন্দর সভা হয়েছিল, যেন রাজদরবারে রাজার সামনে সভা জমেছে খেলা দেখতে।

সিংহসদনের মেঝেতে খুব মোটা পুরু গদি পাতা থাকত— যুযুৎসু শেখাবার জন্য। বেশির ভাগ প্যাঁচই প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছিটকে দূরে ফেলে দেবার তালে থাকে। তাই যুযুৎসু শিখবার জন্য প্রথম প্রথম এই রকম গদির প্রয়োজন হয়।

এক সন্ধ্যায় সিংহসদনের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হল। আমরা সবাই বসেছি মেঝের দু পাশে, মাঝখানে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়ে। গুরুদেব বসেছেন কাঠের উঁচু স্টেজটার উপরে। পাশে বিজয়মাল্য সুগন্ধিফুলের এক গোড়ে মালা।

ভেবেছিলাম না-জানি কী এক ব্যাপার হবে! সে-সব কিছু না। দু জনে সামনাসামনি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে— কে আগে কাকে কিভাবে আক্রমণ

করবেন সেই সুযোগের অপেক্ষায়। দু জনেই প্রস্তুত। একজন যেই আক্রমণ করছেন অন্যজন অন্য প্যাঁচ করে তাকে ছিট্‌কে ফেলে দিচ্ছেন। একঘণ্টার উপরে চলল এই খেলা। মনে মনে ভাবছি আমরা তাকাগাকি যেন জেতেন। তাই হল। তাকাগাকিই জিতলেন। খেলার শেষেও দু জনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলেন। দারুণ পরিশ্রম হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম চুল কপাল থেকে টস্‌টস্‌ করে গড়িয়ে-পড়া ঘাম বুকের ঘামের সঙ্গে মিশে দু পা বেয়ে মাটিতে পড়ে মেঝে ভিজিয়ে দিচ্ছে। এতটুকু নড়লেন না কেউ। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। গুরুদেব এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বেশ কিছুক্ষণ বললেন। বিজয়মালা তাকাগাকিকে পরিয়ে দিলেন। সকলে 'সাধু সাধু' বলে উঠলাম। হাততালি নয়, হৈ-হৈ রব নয়; অতি সুন্দর সংযত অনুষ্ঠান। আমাদের সব অনুষ্ঠানই এই রকম সুশৃঙ্খলায় হত। অথচ রসের কোনো অভাব থাকত না।

তাকাগাকি যুযুৎসু শেখান— কতখানি শিখল ছাত্রছাত্রীরা—একটা 'শো' দেওয়া হল তখনকার মেলার মাঠে। আশ্রমবাসীরা সকলে উপস্থিত সেখানে। মেয়ের দলও ঢোলা পাজামা কুর্তা পরে দাঁড়িয়েছে লম্বা সারি দিয়ে। গান হল,

'সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।

মনে হল যেন আমাদের একটা রুদ্ধ দিক খুলে গেল— যেখানে অজস্র আলো অবাধ হাওয়া। যেখানে দিন নাই রাত্রি নাই— খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে এই যে আমি আছি, ভয় নেই কারুর।

এই দিনের এই অনুষ্ঠানের জন্যই এই গানটি লিখেছিলেন গুরুদেব। এই গান এই উদ্দীপনা আজও ছড়িয়ে দিচ্ছে সকলের মনে।

নানা অনুষ্ঠানে গান দিয়ে ধরে দিতেন নানা ভাবব্যঞ্জনা গুরুদেব। সুরে কথায় গানে অনুষ্ঠানে সব মিলিয়ে তবেই আমরা পেতাম আমাদের মনের ভাবকে পরিষ্কার জানতে, পারতাম সঠিকভাবে ব্যক্ত করতে।

'হে আকাশবিহারী নীরদবাহন জল, এ গানটিও যেদিন গাওয়া হল এক বিশেষ অনুষ্ঠানে, সে স্মৃতি স্পষ্ট জাগে মনে।

রথীদার নানা রকমের শখ ছিল, তার মধ্যে পুরাতন যন্ত্রপাতি নিয়ে ছিল তাঁর প্রধান শখ। যখনই কলকাতায় যেতেন, ঘুরে ঘুরে পুরাতন লোহালক্কড় কিনে

আনতেন। রথীদার বাগানের পিছন দিকটা ভরে উঠেছিল এ-সবে। মিস্ত্রি লাগিয়ে এই ভাঙা যন্ত্রপাতির টুকরো হতে রথীদা নানা রকম যন্ত্রের উদ্ভাবন করতেন। এ ছিল তাঁর একটা নেশা।

যুদ্ধের সময়ে কাঁচের গেলাস নেই। রথীদা যন্ত্র বানালেন, সেই যন্ত্রে বোতল কেটে গ্লাস হত নিত্য ব্যবহারের। আমরাও বোতল পেলেই রথীদার কারখানায় গিয়ে যন্ত্রে বোতল লাগিয়ে থরথর করে হাতল ঘুরিয়ে গেলাস কেটে আনতাম। এমনিতরো কত কী যন্ত্র বানাতেন রথীদা তার সংখ্যা ছিল না।

একবার দেখলাম মস্ত একটা ড্রাম উল্টে পাল্টে কী যেন করছেন। বললেন, রান্নাঘরে রোজ কত ভাত রান্না হয়, কত সময় লাগে, কত কেন নষ্ট হয়ে যায়। এই ড্রামে পনেরো মিনিটের মধ্যে পঞ্চাশ জনের ভাত রান্না হয়ে যাবে, যেন নষ্ট হবে না একটুও। সেটা অবশ্যি আর কাজে লাগে নি, কেন কী জানি। কিন্তু এ-সব নিয়ে রথীদার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে নি কোনো দিন।

এই লোহালক্কড় কিনতে ও নাড়াচাড়া করতে করতে তাঁর আলাপ হয়ে যায় অমূল্যকুমার বিশ্বাস মশায়ের সঙ্গে। শুধু আলাপ নয়, প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। প্রায় সমবয়সী ছিলেন ওঁরা। অমূল্যবাবুরও ছিল নানা যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়ার 'হবি', এবং ছিল অসাধারণ মাথা এ-সব নিয়ে। ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা তিনি তাঁর শখ নিয়েই আয়ত্ত করেছিলেন। কোনো শিক্ষালাভ করেন নি এ নিয়ে কোনো বিদ্যালয়ে।

দিদির শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে একটা সম্পর্ক ছিল তাঁর সঙ্গে। সেই সূত্রে আমি সন্তানের বয়সী হলেও আমাকে তিনি 'মাসি' বলে ডাকতেন। বড়ো মিষ্টি লাগত তাঁর মুখে এই মাসি ডাক। অমূল্যবাবু শান্তিনিকেতনে এলে রথীদার কারখানা জমজমাট হয়ে উঠত। প্রায়ই রথীদার আমন্ত্রণে তাঁকে আসতেও হত। উদয়নে সন্ধ্যাবেলার ব্রীজক্লাব আরো জমে উঠত, অমূল্যবাবু নানা ঘটনার গল্প করতেন। অমায়িক ভদ্রলোক, দিলখোলা লোক। মুখে হাসি লেগেই আছে। হাসতে হাসতে নিজের সম্বন্ধেও গল্প বলে যান।

অমূল্যবাবু কলকাতায় মোটর সারাবার ছোটোখাটো কারখানা খুলেছিলেন একটা। বলতেন, মোটরটা কেউ দিয়ে গেলেই আগে সব পার্টস্‌গুলি খুলে ফেলা হত। তার পর ধীরেসুস্থে অবসরমত মেরামত করাতাম। দেরি হলেও কেউ তো রাগ করে মোটরটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। মোটরের অংশগুলি ছড়িয়ে

ছিটিয়ে মাথা হত। মোটরের মালিককে তাই ধৈর্য ধরে থাকতেই হত। ব'লে অমূল্যবাবু হো হো করে হাসতেন। বলতেন, একবার কি হয়েছিল মাসি— ব'লে অমূল্যবাবু হো হো করে হাসেন সে কথা মনে ক'রে। বলেন, একবার এই রকম এক ড্রাইভার একটা গাড়ি দিয়ে গেল, আমাকে বলে গেল গাড়িটা দিয়ে গেলাম, দেখবেন যেন তাড়াতাড়ি পাই। বললাম, নিশ্চয়ই— নিশ্চয়ই।

মিস্ত্রিদের কাছে মোটর দিয়ে যায় লোকেরা, তারা সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেলে, আমার নির্দেশই ছিল তাই। এ গাড়িও যথারীতি খুলে ফেলেছে জানি। দু দিন পরে গাড়ির মালিক এলেন, বললেন, আমার গাড়িটা? বললাম, হয়ে গেছে— তাড়াতাড়িই পাবেন। বললেন, পরশুই যেন পাই দেখবেন। বললাম, পরশুই এসে আপনার গাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন। তিনি পরশু দিন এলেন আবার। কে বসে তখন গাড়ি নিয়ে মাথা ঘামায়, আমার ঝোঁক চেপেছে পাখি শিকারের। যখন-তখন বেরিয়ে যাই কলকাতার বাইরে। ভদ্রলোককে বললাম, আর দুটো দিন, অল্প একটু বাকি আছে। ওটুকু হয়ে গেলেই একেবারে নতুনের মতো হয়ে যাবে গাড়িটা।

দু দিন পরে আবার এলেন, বললাম একটু ফিনিশিং টাচ্‌টা বাকি, আর সবই রেডি।

গাড়ির মালিক পর পর আরো কয়েকটা দিন এলেন, আমি কেবল আর-একটু বাকি, সামান্য বাকি বলে ঘুরিয়ে দিচ্ছি।

এর পর আবার যখন এলেন, তাকে আসতে দেখেই বলে উঠলাম কাল ঠিক এই সময়ে এসে আপনার গাড়ি নিয়ে যাবেন, সব রেডি থাকবে। ভদ্রলোক বললেন, না, আজ আমার গাড়ির ব্যাপারে আসি নি।

বললাম, তবে?

বললাম, এসেছি আপনার ঠিকুজিটা একটু দেখতে। দেখতাম কোন্ ক্ষণে আপনার জন্ম। আমি একটু ইতস্তত করছি, ব্যাপারটা কী তা ঠিক বুঝতে পারছি না। ভদ্রলোক বললেন, আমার গাড়িটা আপনার কারখানায় দেওয়াই হয় নি মোটে, আমার লোক পাশের কারখানায় গাড়িটা দিয়ে গিয়েছিল, আমি ভুল করে এতদিন আপনার কাছে এসেছি। ব'লে অমূল্যবাবু তাঁর প্রাণখোলা হাসিতে ঘর ভরিয়ে দিলেন। বললেন, জান মাসি, আমার কারখানার সামনে আমার নামের ফলক ছিল এ. কে. বিশ্বাস। পাড়ার লোকে বিশ্বাসের পরে লিখে রেখেছিল

'করিয়ো না'। অর্থাৎ এ. কে. বিশ্বাস করিয়ো না। ব'লে আরো হাসলেন।

আশ্রমে জলের বড়ো অভাব। কত গ্রীষ্মে জল শুকিয়ে যায় কুয়ো-ক'টার। এই কারণেই কতবার আশ্রম আগে আগে ছুটি হয়ে যায়। একটা ডিপ ওয়েল করাতে পারলে জলের সমস্যা দূর হয় অনেকটা।

দু-দুটো বিদেশী কোম্পানি পর পর এল, এই কাজে হাত লাগাল, শেষে নিষ্ফল হয়ে যন্ত্রপাতি ফেলে রেখেই রণে ভঙ্গ দিল। বহুকাল এই অবস্থায় সে জায়গাটা পড়ে রইল।

রথীদার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে অমূল্যবাবু দেখলেন একদিন সেই স্থান। ভাবলেন, বললেন, আমি একবার চেষ্টা করে দেখিই না?

নামকরা বিদেশী কোম্পানিরা যেখানে ব্যর্থ হল কাজে, সেখানে তা করা দুরাশা। ইনি দেখতে চান তা দেখুন।

অমূল্যবাবু লেগে গেলেন ডিপ টিউব ওয়েল তৈরি করা নিয়ে।

একদিন সারা আশ্রমে হৈ-হৈ, ছুটোছুটি পড়ে গেল। ঝলকে ঝলকে জল উঠছে মাটির সুদূর তলদেশ থেকে। জল দেখে হাসি সবার মুখে। লোহার খুঁটির উপরে জলভরা ট্যাঙ্ক বসল। সারি সারি কলের জলে ছেলেরা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে স্নান করতে লাগল। নল দিয়ে এখানে-ওখানে জল চলে এল। আশ্রমের এত কালের জলের দুঃখ এতদিনে ঘুচল।

গুরুদেব বললেন, যে এমন অসাধ্য সাধন করল তাকে সংবর্ধনা দেব, আয়োজন করো।

অমূল্যবাবু ধরা দেন না, পালিয়ে বেড়ান। সেই অমূল্যবাবুকে ধরা নয়, সত্যি সত্যিই পাকড়াও করা হল শেষে। লাইব্রেরির সামনে গুরুদেব যেদিন অমূল্য-বাবুকে সংবর্ধনা দিলেন, তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনো মহা দুষ্কর্মের আসামী তিনি। গুরুদেবের বাম দিকে পাশাপাশি বসানো হয়েছিল তাঁকে। ঘাড় গুঁজে বসে লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছিলেন।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষেই গান তৈরি করেছিলেন, গুরুদেব, 'হে আকাশবিহারী-নীরদবাহন জল।··· শেষে শ্যামল মাটির প্রেমে তুমি ভুলে এসেছিলে নেমে' যখন গাওয়া হচ্ছিল ভিতরটা যেন রনরনিয়ে উঠছিল।

অনেকদিন পর্যন্ত এই গানটি ছোটোবড়ো সকলের মুখে মুখে আশ্রম মুখরিত করে রাখল।

আজ আমাদের বাড়িতে বাড়িতে কলের জল, বাড়ি-বাড়িতে বাগান। সবুজের ছড়াছড়ি। এত সবুজ কোথায় ছিল তখন? বৃষ্টিও তখন হত না তেমন। এখন এই বনবনানীর জন্ত বৃষ্টিও হচ্ছে প্রচুর।

আগেকার দিনে একটু বর্ষার মেঘ করল, কি, আনন্দে ছেলেমেয়েরা শিক্ষকরা সবাই বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। যখন গিন্নিবান্নি হয়েছি তখনো ছেলেমেয়েরা ছুটে এসেছে, বৃষ্টিতে ভিজতে যেতে হবে। আধসেদ্ধ তরকারি কড়াইসমেত তেমনি রেখে বেরিয়ে পড়েছি। দল ভারী না করলে জমে না এ-সব ব্যাপার। আমার স্বামীও জড়ো করতেন দল, নন্দদা পর্যন্ত সঙ্গী হতেন।

ঝরঝর করে বৃষ্টি ঝরছে, সঙ্গে সঙ্গে কোরাসে গান চলছে। বৃষ্টির বেগ যত জোরে হচ্ছে আমাদের চলার গতিও তত বাড়ছে। বর্ষার জল আটকা পড়বার মতো ছিল না কোনো বাধা। ধূ ধূ মাঠ চারি দিকে। মাঠ পার হয়ে জল গড়িয়ে এসে পড়ল খোয়াইতে। লালমাটি ধোয়া জল খোয়াইয়ের লাল কাঁকড়ে মিশে গাঢ় গেরুয়া রঙ ধরল। খোয়াইয়ের নিচু-নিচু খাঁজ দিয়ে তোড়ে সেই জল বয়ে চলল। গতি গতিকে বাড়ায়, জলের তোড়ে বসে পড়ে আমরা গা ভাসিয়ে দিতাম। কোথাও বা ছুটে ছুটে চলতাম। এখন যেখানে বাঁধ তা ছিল পুরোটা খোয়াই। এইখানেই আমাদের জল-ঝাঁপাঝাঁপিটা হত বেশি। এই স্রোত ধরেই চলতে থাকতাম সামনের দিকে। চলতে চলতে পুল পেরিয়ে জলের স্রোত যেখানে কোপাইতে গিয়ে পড়ল, সেই পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতাম। পথে কেয়া, ঝাড়লণ্ঠন, সংগ্রহ করে আনতাম। বৃষ্টি থামত। আসতে আসতে কাপড়-জামাও শুকিয়ে আসত। সেই কাপড়েই কোনার্কের লাল বারান্দায় বসে চা মুড়িভাজা আর রসুন খেয়ে যে যার স্থানে চলে যেত। পাছে জর হয় সেজন্য জলে ভেজার পর রসুনটা আমরা নিয়ম করে খেতাম।

শ্যামলী, নয় পুনশ্চ, নয় উদীচী থেকে গুরুদেব দেখতেন। আমাদের সহজ আনন্দ দেখে খুশি হতেন। গুরুদেব অসন্তুষ্ট হবেন এমন কাজ আমরা জ্ঞানে করি নি কখনো, করতে পারতামও না।

কেয়া, ঝাড়লণ্ঠন, গুরুদেবের ঘরে সাজিয়ে দিতাম।

লাইব্রেরির উপরে ছোটো ছোটো দু-তিনটি ঘর, আর একফালি খোলা ছাদ নিয়ে ছিল বিদ্যাভবন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় বছরের পর বছর ধরে

মাটিতে বসে একটি ডেস্কের উপরে খাতা রেখে লিখে চলেছেন বাংলা সাহিত্যে তাঁর মহৎ দান সুবৃহৎ 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, শাস্ত্রীমশায়— বিদ্যার আধার এক-একজন, এক-একখানি আসনে বসে কাজ করে চলেছেন। মাঝে মাঝে খোলা ছাদটুকুর এক পাশে শাল-সেগুনের ছায়াতে এসে ক্লাস নিয়েছেন অপেক্ষারত ছাত্রছাত্রীদের। ক্লাসের সময়ে ছাত্ররা এসে নীরবে অপেক্ষা করত ছাদের কার্নিশে বসে। কাড়াকাড়ি করে বিদ্যা অর্জন করা যায় না, তখনকার তারা এ কথা জানত।

শাস্ত্রীমশায় থাকতেন লাইব্রেরির কাছেই খেলার মাঠের ধারে রাস্তার পাশে একখানা ছোটো মাটির কুটিরে— বাড়িখানার নাম 'বেণুকুঞ্জ'। এক ঝাড় বাঁশ ছিল কুটিরের পাশে। অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, নিজের হাতে রান্না করে খেতেন। ছোটখাটো হালকা মানুষটি, পায়ে খড়ম, খালি গায়ে একখানি চাদর জড়ানো, বগলে পুঁথিপত্র; শাস্ত্রীমশায় প্রতিদিন সকালে এসে দাঁড়াতেন বৈতালিকের সময়ে। বৈতালিকের পরে কোনো-কোনোদিন এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতাম, তিনি হাহা হাহা করে হেসে উঠতেন। তাঁর এই প্রাণভরা হাসিতেই কত আশীর্বাদ, কত স্নেহ ঝরে পড়ত। তাঁর হাসিই ছিল অট্টহাসি। বড়ো ভালো লাগত।

পূর্বে আশ্রম বলতে যা-কিছু সব ছিল পথের এ ধারে। বোলপুর স্টেশন থেকে সোজা পথ চলে গেছে গোয়ালপাড়া পর্যন্ত। এটাই এখানকার রাজপথ। পথের এ ধারে ছিল আশ্রম। ও ধারে তখন সবে উঠেছে নতুন হাসপাতাল— খান-দুয়েক ঘর। ডাক্তারবাবুর ক্লিনিক ডিস্‌পেন্‌সারি আর পাশে ছোটো একটা রান্নাবাড়ি —রোগীদের দুধবালি জ্বাল দেবার জন্য। হাসপাতালে থাকতে বিশেষ কেউ আসত না, ছেলেরা কচিৎ কদাচিৎ যদি-বা আসত, মেয়েদের অসুখবিসুখ হলে শ্রীভবনেই থাকত। ছোটো মেয়েদের ভার নিয়ে যিনি থাকতেন তিনি দেখতেন, বড়ো মেয়েরা দেখত। রোগিণীর সেবাযত্নের কোনো ত্রুটি হত না, নিঃসঙ্গ সে বোধ করত না। আমরা যারা যে যার সংসারের চাপ নিয়ে আছি— আমরাও যেতাম রোগিণীকে দেখতে। দেখতাম মেয়েরা ভিড় করে সে ঘরে গান করছে হাসছে, গল্প করছে। রোগিণীও হাসছে। দেখে কে বলবে রোগীর ঘর! বিশেষ গুরুতর রোগ হলে সে ভারও আমরা তুলে নিয়েছি হাতে। তখন নার্স আয়া বলে কেউ ছিল না, বহুবছরই ছিল না।

রাজপথের ওধারে ছিল শৈলবোঠানের বাড়ি, আর ছিল চিত্রলেখা বাড়ি, ঐ বাড়িই ঐ দিকের শেষ বাড়ি। পুবে ছিল দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত ধু ধু করা খোলা মাঠ। সন্ধে হতেই হেমন্তের কুয়াশা পড়ত সে মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি, যেন মাটির উপর শুয়ে আছে মেঘ লম্বা আঁচলখানা বিছিয়ে। কুয়াশার ভিতর দিয়ে পুবের আকাশের তারাগুলি দেখাত প্রদীপের ক্ষীণ আলোর মতো। মনে হত ঘরে ঘরে প্রদীপশিখাটি মিটমিট জ্বলছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম— মাটি আকাশ এক হয়ে থাকত পুব দিকটা জুড়ে। সে দৃশ্য আর দেখি না, আর দেখবও না।

পথের ও পারে আর ছিল আরো উত্তরে সরে এসে রতনকুঠি, তার একটু পুবে আর-একটা বাড়ি— ডাক্তারবাবু থাকতেন। রতনকুঠির পিছনে ছিল সুরপুরী— দিনদার বাড়ি।

পথের ওধারে ছিল এইটুকুই সংযোগস্থল, আর যা-কিছু সব ছিল পথের এধারে।

আশ্রমের কাজ আশ্রমের ক্লাস— এই নিয়েই ছিল সারাদিন আশ্রমের ভিতরে সকলের চলাফেরা। ঘরের প্রয়োজন ছিল সামান্যই। সবাই সবাইকে দেখছে, জানছে। অদেখা-অজানা কোথায় তখন ?

কচিৎতের ভাপসা গুমোট, ঘূর্ণি হাওয়া থাকত আর কতটুকু সময় ? গুরুদেব আছেন, নিশ্চিন্তে আছে সবাই।

এখনো যেন দেখতে পাই— ছোটখাটো, একটু স্থূল আমাদের তেজেশদা ঘুরে বেড়াচ্ছেন আশ্রমময়। কোন্‌খানে কোন্ গাছটায় জল দিতে হবে, কোন্ গুঁড়িটায় উই ধরল, কোথায় কোথায় কী কী গাছ লাগাবেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। বাগানের শখ ছিল তাঁর। ছাত্রদের ক্লাস নেবার আগে-পরে এই কাজ করে তিনি আনন্দ পেতেন। তখনকার সব গাছ তেজেশদারই লাগানো। তা ছাড়া কুয়োতলার পাশে যেখানে আজ জলের ট্যাঙ্ক, তার কাছে ছিল খানিকটা জমি। রান্নাঘর তখন আমাদের একটিই ছিল ; এখন বিভাগে বিভাগে রান্নাঘরের ছড়াছড়ি। আমাদের ঐ একটি রান্নাঘরের ভাতের ফেন, বাসন ধোওয়া জল নালা দিয়ে এসে জমা হত এই ফালি জায়গাটুকুর পাশে। তেজেশদা এই জলটুকুর উপর ভরসা রেখে এখানে সবজির খেত করলেন। নোংরা জলটুকুকে খেতের কাজে লাগালেন। জলের অভাবে সে সময়ে কারো নিজ নিজ আলাদা বাগান করবার উপায় ছিল না। তেজেশদার এইটুকু বাগানের তাজা সবজির জন্য উৎসুক হয়ে থাকতাম। তাজা

তরকারি যে কী অমূল্য বস্তু ছিল তখন আমাদের কাছে। অভাব না হলে কোনো কিছুর মূল্য বোঝা যায় না। এখন কত সবুজ, কত জল কত সবজি— কত বাগান। কিন্তু তেজেশদার সেই অতি যত্নের অতি কষ্টের সবজি বাগানটুকু ছিল যেন উৎফুল্লভরা একটুকরো স্থান আমাদের। যেদিন একটা কুমড়োর ডগা, কি দুটো ঝিঙে হাতে পেতাম— কখনো-বা লাউ হিসেবে গাঢ় হলুদ বর্ণের ঢলঢলে গোটা চারেক কুমড়ো ফুল, পেয়ে আমরা যত খুশি হতাম, তেজেশদার মুখেও হাসি ঝরে পড়ত।

তাঁর নিজের শখেই তিনি আশ্রমের বাগান পরিচর্যা করে বেড়াতেন। সপ্তাহে তখন দু দিন মাত্র হাট বসত বোলপুরে— বৃহস্পতিবার আর রবিবারে। এখন প্রতিদিনই তাজা সবজি পাওয়া যায়, গ্রাম-গ্রামান্তর হতে আসে— দু-এক স্টেশন দূর হতেও আসে ট্রেনে। বোলপুর হতে শান্তিনিকেতন অবধি পথের ধারে ধারে এখানে-ওখানে বহুলোক সবজি সাজিয়ে দোকান খুলে বসেছে। এখন কত রকমের সবজিও হয়। তখনকার দিনে কুমড়ো পটল লাউ খেড়ো ঝিঙা, এই-সব মামুলি তরকারিই হত বীরভূমের মাটিতে। চার দিনের তরকারি কিনে এনে আরেক হাট পর্যন্ত চালাতে হত। তরকারি কিনেই বেছে বেছে দেখতে হত কোন্‌টা শুকিয়ে যাবে, সেগুলি আগে খরচ করে বাকিটা ভিজে কাপড়ে ঢাকা দিয়ে রাখা হত। পরদিন আবার বাছা হত। টাটকা তাজা তরকারি খাওয়া ভাগ্যে জুটত না বেশি।

একবার মনে আছে— সে বছর দারুণ গ্রীষ্ম, অনাবৃষ্টি, জল নেই, সবজির অভাব, ছেলেমেয়েদের চুলকানি শুরু হল। ডাক্তার বললেন, সবুজ তরকারির অভাবে এ-সব হচ্ছে। সেবার তাড়াতাড়ি আশ্রম ছুটি হয়ে গেল। ছোটো অভিজিৎকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলাম। কলকাতার বাড়িতে দেখি, রোজ বাজার হতে আসছে তাজা তাজা সবজি। মা ডাঁটা কাটছেন, ডাঁটার পাতাগুলি খোসার সঙ্গে ফেলে দিচ্ছেন। আমি কাঙালের মতো তাকিয়ে থাকি, এমন তরতাজা পাতা ফেলে দেয় কেউ ?

পোস্ট-অফিসের কাছে পথে তেমাথায় তেজেশদার বিখ্যাত বাড়ি 'তালধ্বজ'। তাল গাছ ছিল একটা এখানে, সেই তাল গাছ ঘিরে মাটির বাড়ি তুললেন— ঘর-বারান্দা নিয়ে গোল আকারে। যেন গাছের গোড়া ধরে বালিকা তার চুল আঁচল এলিয়ে এক চক্কর ঘুরপাক খেয়ে নিচ্ছে। ছোটো ছোটো ঘর, এ ঘরে শুধু তেজেশদাই থাকতে পারেন। ছোটো বারান্দা, এ বারান্দায় নন্দদা, তেজেশদা,

আর অক্ষয়দা, বসে থাকেন। আমরা যেতে আসতে বারান্দার বেদীতে বসে:গল্প করে যাই। আর আসি তেজেশদার হাতের রান্না খেতে। তেজেশদা খুব ভালো রান্না করতেন, তাঁর খাবার তিনি রোজ নিজের হাতে করতেন। তিনি শুধু নিজে খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন না, যখনই যা রান্না করতেন একটু বেশি করেই করতেন, রেখে দিতেন। আমরা গেলে আমাদের হাতে হাতে চাখতে দিতেন। অতি সুস্বাদু স্বাদ পেতাম।

তেজেশদার মুখ হাসি ছাড়া দেখি নি কখনো।

হাসি ছিল আমাদের গোঁসাইজির মুখেও. আর তিনি হাসতেন সরবে।

অদ্বৈত মহাপ্রভুর ত্রয়োদশ বংশধর ইনি। অথচ গোঁড়ামি ছিল না কোনো। বৃন্দাবন, কাশী, কলকাতা, সিলোন, বার্মা সব স্থানে বিদ্যালাভ করে এলেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর বেশভূষা ছিল দেখবার মতো বস্তু। নানা সাজে নানা সময়ে সেজে থাকতেন গোঁসাইজি। কখনো পরতেন পেশোয়ারিদের মতো ঢলঢলে সালোয়ার পাঞ্জাবি, কখনো পাজামা-কুর্তা, কখনো ধুতি চাদর, কখনো গেরুয়া লুঙ্গি, কখনো বা দরবেশের মতো শত রঙের তালি দেওয়া সর্বাঙ্গ ঢাকা লম্বা জোব্বা। মুখেও ছিল তাঁর নানান পরিবর্তন— কখনো বা রাখতেন চাপদাড়ি, কখনো দাড়ি-গোঁফহীন মসৃণ মুখ। কখনো দেখতাম দাড়ি চলে গেছে আছে শুধু পাঠানি গোঁফ, কখনো বা দাড়িই থাকে শুধু— গোঁফ কামিয়ে সেজেছেন খোজা-মুসলমান— আমাদের গোঁসাইজি নিতাইবিনোদ গোস্বামী। গোঁসাইজির স্ত্রীকে যেদিন প্রথম দেখি মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে ছিলাম তাঁর দিকে।

আশ্রমে সব কাজই আমরা নিজের হাতে করি— কয়লা ভাঙা থেকে ফুলদানিতে ফুলসজ্জা অবধি। লোক রাখবার সামর্থ্য নেই, বড়োজোর একটি সাঁওতালি বা বাঙালি ঠিকে মেয়ে রাখি, উঠোন ঝাঁট দেয়, বাসন মাজে, ঘর মুছে দেয় ; চলে যায়। হাটবাজার সেই দু মাইল দূরে বোলপুরে, সেখান থেকে কেনাকাটা করে আনাতে খুবই অসুবিধের কথা। এখন রিক্সার ছড়াছড়ি, তখন তা ছিল না। থলি হাতে হেঁটে বোলপুরে যেতে আসতে কষ্ট তো বটেই— সময়ও অনেকখানি চলে যায়। আশ্রমে যদি একটা সবজির দোকান থাকত, তো, বড়ো ভালো হত।

বলাবলি করি সবাই এ নিয়ে। তখন 'কো-অপ' ছিল বেণু বীথির দক্ষিণে, খেলার মাঠের ধারে তেমাথার কোণটাতে! কর্তৃপক্ষরা ঠিক করলেন— তাই তো, একটা সবজির দোকান হলে বাড়ির মেয়েদের সুবিধে হয়। 'কো-অপ'-এর উপর

জেওয়া হল তার। 'কো-অপ' সপ্তাহে দুদিন ভোর ভোর গিয়ে বোলপুর থেকে হাট এনে বিছিয়ে দেয় 'দিনান্তিকা'র পাশে, আমরা থলি হাতে দাঁড়িয়ে থাকি, প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে কিনে-কেটে বাড়ি ফিরি।

সেদিনও দাঁড়িয়ে আছি আমরা মেয়েরা গিন্নিরা— আর-একটি নতুন মুখ এসে দাঁড়ালেন থলি হাতে। সঙ্গে সঙ্গে দু চোখ আমার আটকে গেল সে-মুখখানার উপরে। পানে রাঙা হাসি-হাসি দুখানি ঠোঁট, কোঁকড়ানো কালো চুল সিঁথির দু পাশ ঘিরে সুডোল কপালে বড়ো একটি সিঁদুরের টিপ, পরনে লালপাড় শাড়ি— পাড়ের লাল বেষ্টন করে আছে গৌরবর্ণের মুখখানি। পথের ধারে শিরীষ গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, যেন লক্ষ্মীমূর্তি একখানি।

শুনলাম ইনি গোঁসাইজির স্ত্রী, দ্বিতীয় পক্ষের। কিছুদিন হল এসেছেন, আছেন গুরুপল্লীতে।

বাড়ি ফিরে বললাম আমার স্বামীকে গোঁসাইজির স্ত্রীর কথা। যখন যা সুন্দর দেখি সবই বলি— এ-ও বললাম।

সে সময়ে হিন্দু মুসলমানের 'রায়ট' চলছে, নানা রকম ঘটনা রটছে ; হিন্দু মেয়ে মুসলমান নিয়ে যাচ্ছে— কত কী। গোঁসাইজির মুখে তখন খোজা-মুসলমানের দাড়ি।

পরদিন গোঁসাইজির সঙ্গে দেখা হতেই আমার স্বামী দূর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, গোঁসাইজি, শুনলাম আপনাকে নাকি পুলিস ধরে নিয়ে গিয়েছিল— সুন্দরী এক হিন্দুমহিলাকে ভাগিয়ে নিয়ে আসছেন বলে?

সুরসিক গোঁসাইজি বুঝলেন ইঙ্গিতটা ; প্রাণখোলা হাসিতে চারি দিক কাঁপিয়ে তুললেন।

সদানন্দ পুরুষ ছিলেন, ছিল তাঁর রসিক মন। তিনি ছিলেন উদারপন্থী। এ নিয়ে তাঁর বংশের সঙ্গে মতবিরোধ ছিল শুনেছি। তাঁকে তাঁরা সরিয়ে রেখেছিলেন। তাতেও দমেন নি গোঁসাইজি।

তাঁর মতো আমুদে মানুষ ছিল দুর্লভ। যেখানে হাসি, যেখানে আমোদ সেখানে সর্বাগ্রে এগিয়ে এসে যোগ দিতেন আমাদের গোঁসাইজি।

সরস্বতী পুজোর দিন ছিল আশ্রমের খেলাধুলোর দিন। স্পোর্টস্ প্রতিযোগিতা হয়, সারা আশ্রম ভিড় করে এসে সেদিন সারা দিন কাটায় খেলার মাঠে। ছেলেদের 'থ্রি লেগ্‌ড্ রেস' হচ্ছে— আমার স্বামী বললেন, গোঁসাইজি, আসুন আমরাও

একটা এই রেস লাগাই। গোঁসাইজি সঙ্গে সঙ্গে রাজি। কো-অপ ছিল কাছেই, দৌড়ে গিয়ে কো-অপ থেকে খালি বস্তা যে-ক'টা পেলেন নিয়ে এলেন। আরো-কয়েকজন শিক্ষকও এগিয়ে এলেন। একটা বস্তায় দু জনের দুটো পা ঢুকিয়ে আর দুটো পায়ে দৌড়তে হবে। দু জন করে জুড়ি। আমার স্বামী ও গোঁসাইজি এক বস্তায় পা ঢোকালেন, অন্যরা নিজ নিজ জুড়ি বেছে নিলেন।

রেস শুরু হল— থ্রি লেগ্‌ড্‌ রেস। সকলের হাসি হুল্লোড় চেঁচামেচিতে যেন মাঠ ভেঙে পড়ল। মরিয়া হয়ে ছুটছেন তাঁরা। কোনোমতে গোল ছুঁয়েই গোঁসাইজি দ্বিবেদীজি মাঠময় লাফাতে লাগলেন! তাড়াহুড়ো করে হাতের কাছে যে বস্তা পেয়েছেন— তাই নিয়ে আসা হয়েছিল— গোঁসাইজির বস্তাটা ছিল শুকনো লঙ্কার বস্তা— আর দ্বিবেদীজিদের বস্তাটা ছিল চিনির—বড়ো বড়ো লাল পিঁপড়ের ভরা।

গোঁসাইজির পর পর দুটি কন্যা হল। আলো আর ছায়া— দুই কন্যা দুই রূপোর ডালা। ছোটোটি জন্মাবার পরেই ওদের মা মারা যান। দুটি শিশুকন্যাকে নিয়ে গোঁসাইজি অসহায় হয়ে পড়লেন। পাশের বাড়িতে থাকেন মোহরের মা, তিনি এসে কন্যা দু-টিকে বুকে তুলে নিলেন। বললেন, আমার সাতটি সন্তান— এখন নয়টি হল। মোহরের বাবা তখন সহকারী লাইব্রেরিয়ান— কতই-বা আমাদের মাইনে ছিল তখনকার দিনে! কায়ক্লেশে চালাই সবাই। সেদিন মোহরের মা— মাসিমার প্রাণের ঐশ্বর্য দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। বাঁকুড়ার গ্রামের এক বধূ তিনি— তাঁর কাছে বারে বারে মাথা নত হয়েছিল শ্রদ্ধায়।

মাসিমা বলতেন, রানী, আমার থালা বাড়তে বাড়তেই দিন যায়। সকালে দশটা থালা বাড়ি— স্বামী সন্তানেরা খেয়ে স্কুল অফিসে যায়, ১টার সময়ে টিফিনে সবাই আসে— থালায় থালায় বেড়ে রাখি— খেয়ে যায়। দুপুরে খায়। বিকেলে স্কুল ছুটির পর খেলার মাঠে যাবে হুড়মুড় করে এসে খেতে বসে, আবার রাত্রে সারি সারি থালা বেড়ে দিই। ব'লে মাসিমা হাসতে হাসতে পান মুখে দেন, আমাকেও গালভরা পান খাওয়ান। এই পান খাওয়া নিয়ে মাসিমার সঙ্গে ছিল আমার এক মধুর ঘনিষ্ঠতা।

আমাদের শান্তিনিকেতন— আমাদের সব পাওয়ার দেশ। এখানে মা মাসি পেয়েছি, ভাই-ভগ্নী পেয়েছি। সখা-মিত্র পেয়েছি। 'পিতা'কে পেয়েছি— যিনি শুধু নিজের দিকে নয়— পরমপিতার দিকে মন উন্মুখ করিয়ে দিয়ে গেছেন। না পাই নি

কী ? এখনো দিনে দিনে পেয়েই চলেছি।

কোনো অভাব ছিল না আমাদের আশ্রমে, সব দিক দিয়ে পরিপূর্ণ ছিলাম। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী তখন প্রৌঢ়া, সংসারের সকল কাজে ব্যাপৃত থাকেন সারাদিন। বুধবার সকালে মন্দিরের সময়ে নিজেকে বের করে আনেন সংসার হতে কিছুক্ষণের জন্য। মন্দিরের পরে উত্তরায়ণে আসেন, গুরুদেবকে প্রণাম করেন। যাবার সময়ে প্রতিবার কোনার্কে ঢুকে আমাকে দেখে— ঘুরে ঘুরে আমার সংসার দেখে তবে যেতেন। যখন বৃদ্ধা হলেন, কোমর ভেঙে পড়ল, সোজা হয়ে হাঁটতে পারেন না ; তখনো এসে হাঁক দিতেন, কই রে রানী, কী করছিস ?

বীরেনদার মা— দু হাতে আমার সারা গায়ে মাথায় হাত বুলোতে থাকতেন —অসুস্থ অবস্থায় যখন শয্যাশায়ী ছিলেন তখনো। আমার হাতখানা টেনে নিয়ে দুঃখ করতেন— শাঁখা ছাড়া কেন আর-কোনো গয়না পরি না হাতে। আমার স্বামীকেও এ নিয়ে বলতেন, শেষে বলা ছেড়ে বকুনি লাগাতেন।

নববর্ষ আর বিজয়ায় আমরা দুজনে বাড়ি বাড়ি যেতাম পূজনীয়-পূজনীয়াদের প্রণাম করতে। তাঁদের আশীর্বাদ, তাঁদের আদর, তাঁদের সেই স্নেহমাখা স্পর্শ সর্বাঙ্গ যেন ধৌত করে দিত।

আমাদের ঠান্‌দি মনোরমাদি, সুধাদি, সুধীরা বোঠান, শৈল বোঠান— কার কথা বলব ? ঘরে ঘরে ছিলেন আমাদের মা-মাসিমা, তাঁদের স্নেহদৃষ্টি সতত ছিল আমাদের প্রতি। ছবি আঁকতাম, ঠান্‌দি এসে এসে দেখে যেতেন, খুশি হতেন। কোনো ছবি বেশি ভালো লাগলে বন্ধুদের কন্যাদের যেন ধরে ধরে নিয়ে এসে দেখাতেন। 'ঘরোয়া' যখন বের হল— ঠান্‌দিই প্রথম এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করলেন।

আমার জীবনের পরম দুর্দিনে—সাতাশি বছরের অতি বৃদ্ধা ঠান্‌দি এসে আমার মাথাটা কোলে টেনে নিয়ে বসে রইলেন। কোনো কথা নয়, কোনো সান্ত্বনা বাক্য নয়, কেবল তাঁর শীর্ণ আঙুলগুলি আমার মাথার চুলের ভিতর কেঁপে কেঁপে নড়তে থাকল।

ঠান্‌দি— আমার 'মা'।

'মৃন্ময়ী'তে মনের আনন্দে আছি, সহজ আনন্দে আছি। দলে দলে অতিথি আসেন, আত্মীয়-বন্ধু আসেন, বন্ধুদের বন্ধুও আসেন— ঐ একটি ঘরেই থাকা-খাওয়ার সব-কিছুর সংকুলান হয়ে যায়। আধখানা ঘর-জোড়া তিনটি খাটের ফরাশ, সেই মাপের মশারি আছে একটা টানিয়ে দিই,অতিথিরা পর পর অর্থাৎ পুরুষেরা ঘুমোন তাতে। আমি উত্তর দিকের কোনার খুপরিটাতে একটা কিছু মুড়িসুড়ি দিয়ে পড়ে থাকি। বিছানাপত্রের প্রাচুর্য ছিল না, শীতের রাত্রে ঠকঠক করে কেঁপেছি সারারাত, সকালে উঠে চুপি চুপি স্বামীকে সে কথা বলেছি আর হেসেছি। সুখের সংসার।

অপূর্বদা, সাহেদদা, সাহেদদার বন্ধু— নামকরা কত লোক এসে থেকেছেন এই ভাবে। সাহেদদার একটি কানবালিশ ছিল, আসবার সময়ে এটি সঙ্গে নিয়ে আসতেন, বলতেন, এটা আমার বউ, একে ছাড়া ঘুম হয় না আমার।

পাশের লাল বারান্দা থেকে গুরুদেব সব দেখতেন। কখনো তাঁর বারান্দায় এঁরা সকলে গিয়ে বসতেন, কখনো তিনি চলে আসতেন মৃন্ময়ীর বারান্দায়। এ-সময়ে খোশগল্পই হত বেশির ভাগ।

গুরুদেবের কোনার্কের বারান্দায় কত লোক যে আসতেন দেশ-বিদেশ থেকে।

এই বারান্দা আর মৃন্ময়ীর বারান্দায় হাত-কয়েকের তফাত। একটা শাড়ি আড়াআড়ি করে মেলে দিলে যতটা দূর হয়— ততটা। এ বারান্দা ও বারান্দা একই মনে হত তাই। কত রকমের কত বিদেশী আসতেন, গুরুদেব তাঁদের নিয়ে এই বারান্দায় বসতেন, কথা বলতেন। আমি এ বারান্দায় ঘুরছি-ফিরছি, নানা কাজ করছি; তাঁদের সকলের মুখ দেখছি— কথা শুনছি। কখনো কখনো গুরুদেব ডাক দিতেন, সেখানে গিয়ে বসতাম। গুরুদেব চা ঢেলে দিতে বলতেন, দিতাম। খাবার প্লেট ধরে দিতাম। বিশিষ্ট ব্যক্তি এঁরা সব, কিন্তু তা নিয়ে বিশেষভাবে সাজ করার কথা ভাবিই নি কখনো। যেমন আছি তেমনিই চলছি। এই সহজ জীবনধারাতেই গুরুদেব আমাদের 'ধনী' করে রেখেছিলেন।

জাপান থেকে এক বিশেষ অতিথি এলেন সস্ত্রীক। তাঁরা 'টি-সেরিমনি' করবেন গুরুদেবের জন্য। লাল বারান্দায় ফরাস পেতে ব্যবস্থা করা হয়েছে। গুরুদেব, নন্দদা, হরিহরণ আর জাপানি স্বামী-স্ত্রী দুজন শুধু, সেখানে আমিও আছি, খুব ধীর গম্ভীর শান্ত আবহাওয়া। জাপানি মহিলা যেন অর্ঘ্যথালা সাজিয়ে ধীরে অতি ধীরে

চায়ের সরঞ্জাম এনে নামালেন। থালায় কাঠ-কয়লার উনুনটি পর্যন্ত সাজানো। তিনি হাঁটু মুড়ে বসে উনুনে একটি-একটি করে কাঠ কয়লা দিচ্ছেন— যেন পুজোয় আহুতি দিচ্ছেন। আগুন ধরল— চায়ের জল ফুটল, চা তৈরি হল— ভদ্রমহিলা চা বানিয়ে বাটিটি অঞ্জলিতে নিয়ে গুরুদেবের কাছে এনে ধরলেন। আগাগোড়া সবটাই যেন একটা পুজোর ভাব। গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করার অঙ্গ এটা।

গুরুদেব ফরাসের উপরেই বসেছিলেন। খুবই কষ্ট হয় তাঁর এভাবে বসতে, তবু অতিথিদের সন্তোষবর্ধনের জন্য এই কষ্টটা তিনি করলেন। গুরুদেব সব সময়েই সুন্দর, তবু— সেদিন যে কী সুন্দর লাগছিল তখন তাঁকে। পিঠের কাছে থাম-বেয়ে-ওঠা মধুমালতী লতার গুচ্ছগুচ্ছ লাল সাদা ফুলগুলি হাওয়ায় দুলে দুলে গুরুদেবের গালে মুখে লাগছিল— 'টি-সেরিমনি'র পরিবেশটাই যেন মাধুর্যমণ্ডিত করে দিল মধুমালতী।

এই জাপানি ভদ্রলোক গুরুদেবের ফোটো তুললেন। গুরুদেবের এমন সুন্দর হাসিখুশি ভরা মুখের ছবি আর একটিও নেই।

একই ভাবে সাজানো ঘরে গুরুদেব থাকতে পারতেন না বেশি দিন। কয়দিন বাদে বাদেই ঘরের টেবিল, খাট, কোচ, চেয়ার এ দিক হতে ও দিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাখাতেন। কিছুদিন বাদে ঘরটাই বাতিল করে অন্য ঘরে চলে যেতেন। গুরুদেবের এই ঘর বদলানো বাড়ি বদলানোর কথা লিখেছি আমার 'গুরুদেব' বইটিতে। এখানে একটু শুধু ছুঁয়ে যাচ্ছি। যেটুকু বলা প্রয়োজন সেটুকুই শুধু বলি।

কোনার্কের বাড়ির ও-সব ঘর অদলবদল করা শেষ হয়ে গেল। এ-কোনা সে-কোনা বাকি রইল না কিছু। গুরুদেব কোনার্কের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। সারা-দিন প্রায় এখানেই কাটান।

বিশ্বভারতীর কাজে গুরুদেব আমার স্বামীকে মাদ্রাজ পাঠাবেন, আমাকে বললেন, তুইও যা-না— ঘুরে আয় কয়দিন। খরচ তো আমিই দেব, যা— ।

বেশ উৎসাহ দিয়েই বললেন। এমন করে বললেন যেন যাবার আনন্দে নেচে উঠি। উঠলামও নেচে। দেশ বেড়াতে কার না ভালো লাগে?

পরদিন স্বামীর সঙ্গে রওনা হয়ে গেলাম মাদ্রাজে।

দিন-কয়েক লাগল সেখানকার কাজ সারতে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে শহর ঘুরে দেখি, বন্ধুদের সঙ্গে এখানে-ওখানে যাই। একদিন এক দক্ষিণী-বন্ধু নিয়ে গেলেন আমাদের বালা সরস্বতীর ঠাকুরমার বাড়িতে। আগে হতেই বলে রেখেছিলেন,

এই শুক্রবার আর কোথাও যেয়ো না, আমি আসব, নিয়ে যাব তোমাদের।

বালা সরস্বতীকে আরো একবার দেখেছি, কাছাকাছি সময়েই সে যে কোন্ বারে— তা আজ আর পড়ছে না মনে। মাদ্রাজেই দেখেছি। বালা তখন পূর্ণ যুবতী। ভি. আর. ভি. চিত্রা শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র— অনেককাল আগে কলাভবনে ছিলেন, তখন মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে শিক্ষক। উদয়শংকর এসেছেন মাদ্রাজে, তাঁর তখন যশ খ্যাতি দেশ-বিদেশ জুড়ে। চিত্রা একদিন রাত্রের ভোজে অনেককে ডাকলেন বাড়িতে—উদয়শংকর, বালা সরস্বতীর বন্ধুবান্ধব অনেকে ছিলেন, আমরাও ছিলাম। বসবার ঘরে বসেছি সকলে। আমার পাশে বালা সরস্বতী তার পাশে উদয়শংকর। বালা সরস্বতী মাতৃভাষা জানেন শুধু। উদয়শংকর তার পাশে বসে বসে দু হাতের ভঙ্গিতে নানা রকম মুদ্রায় কী যেন বললেন, বালাও হাতের মুদ্রা দিয়ে তার উত্তর দিলেন। মুদ্রায় মুদ্রায় অনেক কথাই হল। আমি দেখছি দুজনকে, বালার মুখে সলজ্জ হাসি। ঘরভরা লোক, নানা কথা, কলরবের মাঝে তাঁরা দুজন কথা বলে গেলেন। সেইটুকুই চোখে ছবি হয়ে আছে আজও।

শুনেছিলাম, উদয়শংকর খুবই চাইছিলেন বালা সরস্বতীকে তাঁর নাচের দলে নিতে। বালার মা বললেন, বালার অভিভাবক, মা ও বালা— নিলে এই তিনজনকে নিতে হবে। একা বালাকে ছাড়বেন না।

কর্ণাটের নামকরা বীণা-বাদক বালা সরস্বতীর ঠাকুরমা। এঁর বীণা বাজানো ধনীরাই শুধু শুনতে পেতেন। এখন বৃদ্ধা হয়েছেন, বলেন, আর কতদিন বাঁচব, সবাইকে শুনিয়ে যাই বীণা। নিয়ম করলেন, তাঁর বাড়িতে প্রতি শুক্রবার পাঁচটা থেকে ছয়টা তিনি বীণা বাজাবেন; ধনী-দরিদ্র যে কেউ আসতে চায় এসে শুনে যাবে।

মাদ্রাজে যেমন হয়— ছোটো ছোটো ঘর, ছোটো আঙিনা, সরু সিঁড়ি, ছোটো ছাদ; সেই রকমেরই এক বাড়িতে ঢুকলাম। বালা সরস্বতীও নাচে তখন প্রসিদ্ধ। ঠাকুরমা নাতনী— একজন নাচে, একজন বীণায় কর্ণাটে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। চারি দিকে তাঁদের নাম।

বালা সরস্বতী দোরের সামনে প্রথম ঘরটায় দাঁড়িয়েছিলেন, বাড়ির আরো দু-চারজন রমণীও ছিলেন। বালা সরস্বতী আমার চেয়ে বয়সে কিঞ্চিৎ বড়োই হবেন। গোলাপ জলের ঝারি ছিটিয়ে অভ্যর্থনা করলেন, খোঁপায় ফুলের মালা

পরিয়ে দিলেন। তার পর আমাকে নিয়ে সরু সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় একটা ছোটো ছাদে নিয়ে গিয়ে বসালেন। পান সেজে দিলেন। দেবার ভঙ্গিটি কত সুন্দর, একটি রুপোর রেকাবিতে পানটি রেখে দু হাতের অঙ্গুলিতে রেকাবিটি সামনে ধরলেন, হাসলেন। 'দেওয়া' যখন এত সুন্দর 'নেওয়াটা' কি রুক্ষ হতে পারে তার ? দেওয়াই নেওয়া শেখায়।

বালা সরস্বতী হাসলেন। কে বলে ভাষা না জানলে কথার বিনিময় হয় না। কত কথা হয়ে গেল এইটুকু সময়ের মধ্যে। কথা বলতে সময় লাগে, না-বলা কথায় তা লাগে না। প্রিয়জনের মতো বালা সরস্বতী আমার পিঠ ঘেঁষে বসে রইলেন।

দক্ষিণী বন্ধুর কাছে আগে হতে শুনেছিলেন আমরা রবীন্দ্রনাথের আশ্রম শান্তিনিকেতন হতে আসছি। তাঁর নামেই পর এত আপন হয়ে কাছে আসে। নয়তো আমি তুমি কে ?

ছাদে আমার স্বামী, বন্ধুও এসে বসেছেন। আমরাই বোধ হয় প্রথম এসেছি। এক-দু মিনিট পর শ্রোতারা এক-এক করে আসতে লাগলেন, এসে নীরবে ছাদের উপরে খোলা জায়গাটিতে জোড়াসন হয়ে বসে পড়লেন। দেখতে দেখতে ছাদ ভরে গেল— প্রায় ঠাসাঠাসি হয়ে গেল। কারো মাথায় গলায় জরি পাড়ের পাগড়ি চাদর— ঝক্‌ঝক্ করছে জরি, কারো গলায় সাদা সুতির চাদর ঝোলানো। চাদর এরা ধনী দরিদ্র সবাই গলায় ঝোলায়।

ছাদের মাঝখানে রাখা আছে বীণাটি, যে-বীণা বালা সরস্বতীর ঠাকুরমা বাজাবেন এসে।

কখন আসবেন, কিভাবে আসবেন, কেমন দেখতে।— প্রথম দেখাটার জন্য কৌতূহল থাকে বড়ো। তাকিয়ে আছি সরু সিঁড়িটার দিকে, সিঁড়ির মুখে দরজাটার দিকে। এই পথেই তো আসবেন তিনি। পাঁচটা বাজল। সিঁড়ির দরজার কাঠের ফ্রেমটার উপরে সরু লিকলিকে শীর্ণ কয়েকটি আঙুল দেখা দিল। দরজার কাঠটা ধরে উঠছেন সিঁড়ির শেষ ধাপটা। উঠে এলেন।

অন্ধ মহিলা। পক্ব কেশ। পরনে সবুজ রঙের মাদ্রাজি সিল্ক। খোঁপায় ফুলের মালা।

জানা জায়গা, নিজেই এসে বসলেন নিজের জায়গাটি নিয়ে। কোলে তুলে নিলেন বীণা— ঝংকার দিলেন তারে, রনরনিয়ে উঠল এক ঝাঁক সুর তা হতে।

পাঁচটা থেকে ছয়টা— পুরো একঘণ্টা বাজালেন, গাইলেন। কী গাইলেন

বুঝলাম না, মনে হল গান গেয়ে গেয়ে কাঁদছেন, প্রাণ-নিঙড়ানো কান্না। পরে শুনেছি— রামায়ণের গান, গেয়েছিলেন সীতার বিলাপ, বাল্মীকির আশ্রমে লক্ষ্মণ যখন ছেড়ে দিয়ে গেল সীতাকে।

সেবার আরো একদিন গান শুনেছিলাম, তা আমাদের ঘর হতেই। এমন গান আর শুনি নি।

আমরা আছি এক বন্ধুর বাড়িতে, তেতলার একটা ঘরে। শহরে যেমন গা-লাগালাগি বাড়ি, তেমনি বাড়ি সব। একদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। শুনি সুমধুর একটি কণ্ঠস্বর, কে গান গাইছে।

শুয়ে থাকতে পারলাম না। উঠে এ দিকের জানালায় ওদিকের জানালায় দাঁড়িয়ে দেখছি— কোথা হতে আসছে সুর? দেখি, পাশের বাড়ির দোতলা হতে আসছে গান ভেসে। কে গায়? ও-বাড়ির দোতলার জানালা দিয়ে গলিয়ে আসা আলোটুকুরই আভাস পেলাম শুধু তেতলার জানালা দিয়ে। আর কিছু দেখা গেল না। বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম, শুয়ে থাকতে পারলাম না, আবার উঠে পড়লাম— আবার দোতলার জানালার শিক গলিয়ে আসা আলোটুকুই শুধু দেখলাম।

আবার এসে শুলাম। আবার উঠলাম। উঠি, জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াই, আবার এসে শুই। ছট্‌ফট্‌ করে কাটল রাতটা। সুর যে মানুষকে এভাবে টানে, এ আমার জানা ছিল না। মনে হচ্ছিল কচি এক কিশোরীর কণ্ঠস্বর। সেই স্বরে গানের সুর যেন এক হয়ে মিশে উতলা করে তুলেছিল সে রাত্রিতে।

সকালে গৃহস্বামীকে জিজ্ঞেস করলাম, কে আছে পাশের বাড়িতে? কে গান গাইছিল কাল রাত্রে?

বন্ধু বললেন, এক বৃদ্ধা বাঈজী। তিনি এসেছিলেন কাল রাত্রে গান গাইতে।

আমার স্বামী কাজে ঘোরাঘুরি করেন, আমার কাজ নেই, আর ভালো লাগছে না এখানে থাকতে। ভাবছি কতক্ষণে ফিরব আশ্রমে, কতক্ষণে গুরুদেবকে বলব এ-সব গল্প। তাঁকে না বলা পর্যন্ত কোনো দেখা, কোনো শোনাই যে সার্থক হয় না আমার।

শান্তিনিকেতনে কোনার্কের সামনে শিমুল গাছটার এদিকে পথের উপরে ছিল চামেলিবিতান। আগে বিতানটা ছিল কাঠের খুঁটির উপরে, বাঁধানো চাতাল হয়েছে অনেক পরে। উত্তরায়ণের গেটে ঢুকে চামেলিবিতানের ভিতর দিয়ে এসে

ঢুকি মৃন্ময়ীতে। মাদ্রাজ হতে কলকাতা হয়ে সন্ধের ট্রেনে এসে পৌঁছলাম শান্তিনিকেতনে। উত্তরায়ণের গেটে ঢুকলেই বরাবর দেখা যায় এই সোজা পথটুকু। একটা ঝরঝরে ট্যাক্সি ছিল আমাদের অর্থাৎ আশ্রমের। এই ট্যাক্সিতে করে আমরা বোলপুর স্টেশনে আসা-যাওয়া করি মাঝে-মধ্যে। এ দিনও আসছি এই ট্যাক্সিতে করে। উত্তরায়ণে গাড়ি ঢুকল, গাড়ির হেড-লাইটে দেখি চামেলিবিতানের তলায় একটা কোচে বসে আছেন গুরুদেব। পথের মাঝখানে তাঁকে বসা দেখেই দূরে গাড়ি থামিয়ে দুজনে নেমে পড়লাম দু দিকের দরজা খুলে। ছুটে এসে গুরুদেবকে প্রণাম করলাম। প্রণাম করে কাঁকরের উপরই দু হাঁটু মুড়ে বসে রুদ্ধশ্বাসে বলতে লাগলাম, গুরুদেব, মাদ্রাজে এই হয়েছিল, তাই হয়েছিল, বালা সরস্বতীর ঠাকুরমার বীণা— সে যে কী মধুর।

গুরুদেব বললেন—পরে শুনব, আগে নিজের ঘরে ঢোকো তো। হাতমুখ ধোও, বিশ্রাম করো। এতটা পথ এলে।

কিন্তু আমি যে এক্ষুনি না বলে থাকতে পারছি না। যতবার বলতে যাচ্ছি— গুরুদেব আমাকে থামিয়ে দিচ্ছেন,এখন নয়, পরে শুনব, সব শুনব, আগে ঘরে যাও।

বিষণ্ণ মন নিয়েই উঠলাম। আমি আরো ভেবে রেখেছি গুরুদেব শুনে কত খুশি হবেন। মনে মনে আমি সযত্নে সব ঘটনা, কথা গুছিয়ে রেখেছি যাতে বাদ না পড়ে কিছু।

মৃন্ময়ীর দিকে এগিয়ে গেলাম। খানিকটা গিয়েই 'আঁ-ক্' করে একটা চীৎকার দিয়ে উঠলাম। মৃন্ময়ী কই? মৃন্ময়ীর জায়গা জুড়ে এতখানি একটা আকাশ।

মুখ ঘুরিয়ে দেখি গুরুদেব মিটিমিটি হাসছেন। আবার এসে গুরুদেবের পায়ের কাছে কাঁকরের উপর বসে পড়লাম। গুরুদেব বললেন, মন খারাপ কোরো না। তোমাদের জন্য কোনার্ক সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মৃন্ময়ীতে একখানা ঘরে থাকতে, কোনার্কে তোমার কতগুলি ঘর। তুমি হলে রানী, তোমার কি গো সাজে মাত্র একখানি ঘরে? সান্ত্বনা দিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে মনটা একটু ঠিক করে দিয়ে গুরুদেব চলে গেলেন উদয়নে। আমরা ঢুকলাম কোনার্কে।

গাঙ্গুলিমশায় তখন দেখাশোনা করতেন গুরুদেবের বাড়িঘরের। গাঙ্গুলিমশায় এলেন সঙ্গে সঙ্গে। বললেন, বাপরে কী ঝামেলাই গেছে। গুরুদেবের কড়া আদেশ— ওদের একটি জিনিসও যেন নষ্ট না হয়। আমাদের উপরে বিশ্বাস নেই, নিজে এসে আবার ঘুরে ঘুরে দেখে গেছেন ঠিকমত রাখা হয়েছে কি না সব-কিছু।

সে রাত্রে আমরা বোঠানের কাছে খেলাম। কোথাও থেকে এলে উদয়নে বোঠানের কাছে খাওয়াই ছিল রেওয়াজ আমাদের। এ ব্যবস্থা ছিল গুরুদেবেরই। বলতেন, ওরা এসে রাঁধবে বাড়বে তবে খাবে, ওদের খাবার তুমি করিয়ে রেখো বৌমা।

খাবার টেবিলে বোঠানের হাসি আর ধরে না, রথীদাও মুচকি মুচকি হাসছেন। বোঠান বললেন, তোমরা তো চলে গেলে, বাবামশায় এসে ওঁকে বললেন, দেখ্‌ তোরা কারো সুবিধে-অসুবিধে দেখিস নে। রানীরা একখানা ঘরে থাকে, ওদের কাছে কত লোক আসে ; আর আমি একা মানুষ— আমার জন্য এতগুলি ঘর। এ কী করে হয় ? কোনার্কে ওরা এসে থাকুক, আমি বরং উদয়নে চলে আসব— কোনো-একটা ঘরে থাকব। আমি একা মানুষ— আমার আর কি ভাবনা।

কয়দিন পর গুরুদেব একদিন বললেন, সবারই থাকবার একটা স্থায়ী বাসস্থান আছে, কেবল আমারই নেই।

ডাক পড়ল সুরেনদার। গুরুদেব বললেন, দেখো সুরেনসাহেব, আমি ভাবছি কি, মাটির বাড়িতে খরচ বেশি লাগে না, মাটি তো কিনতে হবে না। যা লাগবে মজুরদের খরচাটা। তা এমন আর বেশি কি ? ছাদটাও ভাবছি মাটিরই যদি হয় তবে তো কোনো খরচই নেই ধরতে গেলে। মাটির ছাদ হবে না-ই বা কেন বলো ? একটু ঢালু করে যদি কর— জলটা গড়িয়ে পড়ে যাবে। জল দাঁড়ালেই তো ছাদের ভয় ?

সুরেনদা যেমন বলেন গুরুদেবের সব কথায়, তেমনি, 'আজ্ঞে হ্যাঁ' 'আজ্ঞে হ্যাঁ' বলতে লাগলেন।

সুরেনদার এই 'আজ্ঞে হ্যাঁ' কথাটা গুরুদেবকে খুব সন্তুষ্ট করত। অনেক সময়ে দেখেছি গুরুদেব আমার স্বামীকে বকছেন, বলছেন, তোদের কিছু বললেই তোরা প্রথমেই আপত্তি করবি— বলবি টাকা নেই, এই অসুবিধে, সেই অসুবিধে— কত কী। আর সুরেন দেখ তো— সব কথায় হ্যাঁ বলবে। কত ভালো লাগে। জানছি তো সেটা হবে না—কিন্তু সুরেনের মুখে 'না' নেই।

গুরুদেব সুরেনদাকে বললেন, কোথায় হবে বাড়িটা তাও আমি ঠিক করে রেখেছি, মৃন্ময়ীর সামনে পুব দিকটা দিয়ে হলে বেশ চারি দিক দেখা যাবে, কেবল মৃন্ময়ী পশ্চিম দিকটা একটু আড়াল করবে ওটা ভেঙে ফেললেই হবে।

সুরেনদা বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। গুরুদেব বললেন, তা হলে আগে মৃন্ময়ীটা

ভেঙে ফেলো, রানীরা ফিরে আসবার আগে। প্রথম সংসার পেতেছে ওরা— বাড়িটার উপর মমতা পড়েছে, রানী হয়তো কষ্ট পাবে ভাঙতে দেখলে।

সঙ্গে সঙ্গে মৃন্ময়ী ভাঙা হয়ে গেল। বোঠান বললেন, যখনই বাবামশায় একখানা ঘরে তোমাদের কষ্ট হচ্ছে— কোনার্কে তোমাদের থাকতে দেওয়া হোক— এই-সব বললেন, তখনই আমি এঁকে বললাম নিশ্চয়ই বাবামশায়ের একটা নতুন বাড়ির প্ল্যান মাথায় এসেছে।

আর এও আমরা বুঝলাম এইজন্যই গুরুদেব আমাকে দূরে মাদ্রাজে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

কোনার্কে এসে শুয়ে পড়লাম, মাটিতেই বিছানা পাতা ছিল। যে তিনটে তক্তা ছিল আমাদের তা দিয়ে সামনের বসবার ঘরে ফরাশ পাতা হয়েছে। 'বেড্‌রুম' বলে আমাদের আলাদা খাট চৌকি ছিল না তো কিছু।

শুয়ে শুয়ে দুজনেই প্রমাদ গুনছি, এ বাড়িতে চলাফেরার অভ্যেস করে নিতে লাগবে বেশ কয়েকটা দিন। এ ঘর সে ঘর এ বারান্দা, সিমেন্টের তাক-টেবিল খোপ-খুপরি— যতটা বাড়ানো সম্ভব বাড়ানো হয়েছে কোনার্কে। ফলে উঁচু নিচু ধাপ, সিঁড়ি হরেক লেভেলে। এক স্নানের ঘরেই কয়টা লেভেল। কী করে যে গুরুদেব চলতেন। প্রথমটায় এসে যে-কোনো নতুন লোকের মনে হবে— এ এক গোলোক ধাঁধা।

তাইতেই আমার স্বামী বলেছিলেন— গুরুদেব যখন পরদিন ভোরবেলায় এলেন আমাদের খবর নিতে, যখন বললেন, নতুন বাড়িতে রাত কাটল কেমন? তখন আমার স্বামী বললেন, ভালোই তো কেটেছিল গুরুদেব প্রথম দিকটায়— পরে একটু গোলমাল হয়ে গেল। একটা চোর ঢুকেছিল, কাপড়-চোপড়ের পুঁটলিও বেঁধেছিল— শেষে আমাকে ডেকে তুলল। বলল, বাবুমশায়, আমি দোষ করেছি, এ বাড়িতে ঢুকেছি। এবারে আমাকে বের হবার পথটা দেখিয়ে দিন।

গুরুদেব বেশ জোরেই হেসে উঠেছিলেন সেদিন— অনেকক্ষণ ধরে হেসেছিলেন। এ রকম হাসি ওঁর বার-কয়েকই শুনেছি মাত্র।

সেদিন গুরুদেব আর উদয়নে গেলেন না সকালের চা খেতে। কোনার্কের পুব দিকের লাল বারান্দার সামনেই ছিল একটা শিমুল গাছ। কচি গাছটা আপনা হতে উঠেছিল এক বর্ষার শেষে। গুরুদেব তাতে জল ঢালাতেন রোজ বনমালীকে দিয়ে। রথীদা একটু শঙ্কা প্রকাশ করতেন। বাড়ির সামনেই শিমুল গাছ— এ

গাছ বড়ো হয়— আর পল্‌কাও। ঝড়ে টিকবে না বৃক্ষ হবে যখন।

সেই শিমুল দেখতে দেখতে বড়ো হল, একদিন এক মালতীলতা গোড়া ঘেঁষে উঠল। গুরুদেব সযত্নে সেটি গাছের গায়ে জড়িয়ে দিলেন। সেই লতা গাছের গুঁড়ি ধরে পাকে পাকে জড়িয়ে উঠতে লাগল। গুরুদেব দেখতেন আর বলতেন, লতা হচ্ছে মেয়েদের মতো। একদিন হয়তো গাছকেই চেপে দেবে। বহুকাল পরে একবার গেলাম শিমুল গাছটিকে দেখতে। গাছের সেই সবল সতেজ বুকের ভঙ্গিটি নেই। ঝড়ে বোধ হয় মাথা ভেঙে গেছে, সেই মাথা ঝাঁপিয়ে মালতীলতার ঝোপ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের মতো ঘন সবুজে আচ্ছন্ন করে আছে।

এই গাছের তলায়ই সেদিন গুরুদেব বসলেন। বড়ো প্রসন্ন ভাব। বনমালী টেবিল-চেয়ার পেতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল। গুরুদেব ও তাঁর সেক্রেটারি চা খেলেন। পরে সেখানে বসেই গুরুদেব লিখতে লাগলেন রোদ কড়া না হওয়া পর্যন্ত। শিমুল গাছ তখন পূর্ণ যৌবনে পরিপূর্ণ, ঘন ছায়ায় শীতল করে রাখে তলাটা।

প্রায়ই গুরুদেব সকালে এইখানে এই শিমুলতলায় চলে আসেন, চা খান, লেখেন।

একদিন একটি লোক এল তসরের শাড়ির বোঁচকা নিয়ে। ইলামবাজারের তসর নামকরা। যেমন মিহি তেমনি ঠাস বুনানি। যত ধোয়া যায়, তত নরম হয়। যত পুরোনো হয় তত তার জেল্লা বাড়ে। টেঁকে বহু বছর। লোকটি গুরুদেবকে চেনে না, তবে ভেবে নিয়েছে ইনিই বাড়ির বড়ো কর্তা। সে তার বোঁচকা খুলে শাড়িগুলি এক এক করে গুরুদেবের সামনে মেলে ধরতে লাগল। শাড়ি দেখে আমিও এক-পা দু-পা করে এসে দাঁড়িয়েছি কাছে। লাল পাড় কালো পাড় আর ছিল একটা সবুজ পাড়ের শাড়ি। সবুজ পাড়ের শাড়িখানা মনে মনে আমার বড়ো পছন্দ হল। দু ইঞ্চি মতো চওড়া পাড়— ভারি সুন্দর লাগছিল দেখতে। দাম বলল পাঁচটাকা। অত দাম দিয়ে শাড়ি কিনব কী করে? এক পাশে দাঁড়িয়ে চুপ করে দেখলাম শুধু। পরে বাকি জীবনে কত একজিবিশনে কত দোকানে কত শাড়ি দেখেছি, কিন্তু ঠিক ঐ রকম সবুজ পাড়ের তসরের শাড়ি নজরে পড়ল না আর। ঐ একবারই— ঐ একটিমাত্র শাড়ি দেখে শখ জেগেছিল জীবনে।

তসরওয়ালা গুছিয়ে কথা বলতে পারে খুব। একটা করে শাড়ির পাট ভেঙে ভেঙে গুরুদেবকে দেখাচ্ছে, আর শাড়ির অতুলনীয় মহিমা অনর্গল বর্ণনা করে চলেছে।

থামে আর না। গুরুদেব চুপ করে শুনছেন। শেষে গম্ভীরভাবে সেক্রেটারিকে বললেন, তোর শিক্ষাবিভাগে একটি বাংলার শিক্ষকের দরকার আছে না?

গুরুদেবের কথায় এমন ভাবে হেসে উঠলাম যে, আমার তসরের শোক কোথায় উড়ে গেল— হাওয়ায় আকন্দের তুলো ওড়ার মতো করে।

শান্তিনিকেতনে কোনো কিছুর অভাবকে অভাব মনে হয় নি কখনো আমাদের। মনের আনন্দ সব-কিছু ডুবিয়ে দিয়ে রাখত, নয় ভাসিয়ে নিয়ে যেত। বিবাহের পরও আমার স্বামী যখন এখানেই থাকবেন স্থির করলেন, আমার শাশুড়িমা কেঁদে ফেলেছিলেন, তাঁর বড়ো পুত্রের ড্রাইভারও যে এর চেয়ে বেশি মাইনে পায়। বললেন, ওরা দু-বেলা পেট ভরে খেয়ে থাকবে কি করে?

ভাসুররা বকেছেন। দু-একবার যে বিচলিত না হয়েছি— তা নয়। তাঁদের উপদেশ ছিল আগে কিছুকাল বাইরে কাজ করে টাকা জমিয়ে তার পর থাকো আশ্রমে— 'আদর্শ' করো। এমনও বলেছেন— টাকা না থাকলে দাম্পত্য প্রেম দুদিনে উবে যাবে।

একবার তিন ভাসুর কলকাতায় একত্র হয়েছেন, আমাদের 'তার' করলেন যেতে। গেলাম। তিনভাই ছোটো ভাইকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসলেন। কী সব কথাবার্তা হল, খানিক পরে শুনি আমার স্বামী দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে আসতে বলছেন, 'তোমরা রানীকে বলো, রানীকে বলো—'

পড়ল আমার ডাক। তিন-তিন জাঁদরেল ভাসুর, তাঁদের কথায় যুক্তিতে পারব কেন আমি? চুপ করে বসে রইলাম। খুব ভালো একটা কাজের অফার এসেছে— আমরা রাজি হলেই হয়। অর্থাৎ আমিই যেন দোষী এর জন্য। চুপ করে শুনলাম, চুপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

পর দিন শান্তিনিকেতনে রওনা হলাম। সারা পথ দুজনেই চুপ করে ছিলাম। বোলপুরে নামলাম, শান্তিনিকেতনে ঢুকলাম, এগিয়ে চললাম। সবে বর্ষাকাল শুরু হয়েছে, দু-এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। উত্তরায়ণের সামনে মেলার মাঠটা ঘন সবুজে ঝক্‌ঝক্ করছে। দেখতে পেয়েই দুজনে যেন একই সঙ্গে বলে উঠলাম, কোথায় যাব এ ছেড়ে?

বলার সঙ্গে সঙ্গে বুকের পাথরটা নেমে গেল। আমার স্বামী কোনার্কে পৌঁছে মালপত্র ভিতরে রাখবারও তর সয় না— দৌড়ে পোস্ট-অফিসে গেলেন, দাদাদের

'তার' করে দিলেন— 'রিগ্রেট'।

সেই যে মন পাকাপাকি ভাবে স্থির হয়ে গেল আর কখনো এদিক-ওদিক হয় নি।

অপার্থিব এক মায়া শান্তিনিকেতনের। এ মায়া ঘর বাঁধায়, আবার ঘর থেকে বাইরেও টেনে আনে। দূর দিগন্ত কেবলই হাতছানি দেয়। এ কখনো পুরাতন হয় না।—

এই একই গাছের সারি, একই দিগন্তের রেখা, একই উন্মুক্ত আকাশ। কিন্তু অবিরতই সে নতুন।

ছুটিতে হয়তো কলকাতায় কি আর কোথাও কাটিয়ে এসে যেদিন ফিরে আসতাম শান্তিনিকেতনে, এখানকার আলো-ছায়া অপরূপ রূপ নিয়ে দেখা দিত। সেদিন ঘরে থাকতে পারতাম না। এ কি ঘরে থাকবার দিন? দুপুর-রৌদ্রে বেরিয়ে পড়তাম। আকাশে বাতাসে যেন আপনজনের সঙ্গে আলিঙ্গন করতে করতে পথ থেকে মাঠ, মাঠ থেকে খেত— পরে ঐ যে তালগাছগুলি— চল্ চল্ সেখানে, দৌড়ে গিয়ে উঁচু ঢিবিটায় উঠি। না, না, এখুনি ঘরে ফিরব কি, খোয়াইতে নেমে পড়ি। এই দিনটি বড়ো মধুর লাগে, প্রতিবারই লাগে। ফিরে ফিরে এই দিনটিকে পাবার জন্যই যেটুকু বাইরে যাই, নয়তো বোধ হয় যেতাম না।

গুরুদেব বলতেন, এ হচ্ছে এই রাঙামাটির টান— ঘরছাড়ার টান। দেখিস-না— এ দেশে কত বাউল। রাঙামাটির টানে সবাই বেরিয়ে পড়েছে। বলে গাইতেন : গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভোলায় রে।

লাল বলেও লাল! এখন সব পীচঢালা কালো সড়ক। তখন ছিল রাঙা ধুলোয় ভরা পথ। গোরুর গাড়ি যেত রাঙা ধুলোর মেঘ উড়িয়ে তো বটেই, আমাদের পায়ে পায়েও খণ্ড খণ্ড মেঘ উড়ত। পরনের শাড়ি সায়ার পায়ের দিকটা বেশ খানিকটা অবধি গেরুয়া রঙ ধরে থাকত। ধোবির আছাড়ে বিছাড়েও টলত না তা। আমাদের গোড়ালি অবধি ডুবে যেত ধুলোয়। ধুলোর মধ্যে চলতে চলতে একটা অভ্যেসও হয়ে গিয়েছিল— থপথাপ পা ফেলে ধুলো উড়িয়ে ভড়বড়িয়ে চলাটাই যেন আসল চলা, এমনিই মনে হত।

লম্বা ঢ্যাঙা মিস্ টেট যখন তার লম্বা লম্বা পা ফেলে রতনকুঠি হতে বেরিয়ে এই পথটুকু পার হয়ে উত্তরায়ণের ছোটো গেটটা দিয়ে ঢুকত— দু হাঁটু তার ধুলোয় মাখামাখি, মুখে একমুখ হাসি। এই হাসির জন্যই তাকে সুন্দর লাগত। নয়তো

সুন্দর ছিল না সে মোটেই। আর আমাদের সিভার ব্রুম— সে পারলে এই ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে টেরাকোটা মূর্তি হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। একেবারে পাগলী। তাকে সামলানোই এক কাজ ছিল আমার।

মিস টেট এসেছিল সিভার ব্রুমের অনেক পরে। আমেরিকান মহিলা, কিছুদিন থাকবে আশ্রমে। স্থির থাকতে পারে না, শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে অনবরত ঘুরে বেড়ায়। আজ এখানে, কাল কাশ্মীরে, পরশু দক্ষিণ ভারতে। প্রতিবার ফিরে আসে— সঙ্গে থাকে প্রচুর জিনিসপত্র। যেখানে যা দেখে কিনে আনে। জিনিস কিনতে দিক্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না যেন। কিনে কিনে রতনকুঠির ঘর-বারান্দা ভরে ফেলছেন। পাগলের মতো শখ সব-কিছু কিনবার। কিনে যত উল্লাস সেগুলি খুলে খুলে দেখাতেও তত উল্লাস। আমাদের ডেকে ডেকে নিয়ে দেখান, আবার মজুরের মাথায় ঝুড়ি-বাক্স চাপিয়েও নিয়ে আসেন দেখাতে। ওর এই জিনিসপত্র নিয়ে আশ্রমের কর্তাব্যক্তিদেরও টালমাটাল অবস্থা। যেখানেই যেতেন ফিরবার সময়ে 'তার' করতেন— আমি অমুক তারিখে আসছি, সঙ্গে অত মালপত্র আছে— প্লিজ, স্টেশনে লোক গাড়ি সব ব্যবস্থা রেখো।

সেবার নানা জায়গা ঘুরে রেঙ্গুনে গেলেন, সেখান থেকে আমার স্বামীকে 'তার' করলেন, আমি এ হার্‌ড্ অব্ এলিফেন্ট কিনেছি, অমুক তারিখে আসছি, ব্যবস্থা রেখো।

'তার' পেয়ে স্বামীর অবস্থা তো বজ্রাহতের মতোন। ছুটে রথীদার কাছে গেলেন। রথীদা সুরেনদাকে ডেকে পাঠালেন, তিনজনে বসে গেলেন— কোথায় এই হাতিগুলোকে রাখা হবে। কোথা থেকে খাবার জোগাড় করা যাবে? কে দেখবে —কে জানে হাতির যত্ন-আত্তি? মিস টেটের অসাধ্য কিছুই নেই— কিন্তু এই হাতিগুলি কি করে নিয়ে যাবে আমেরিকায়? সেখানে নেবার জন্যেই তো কিনেছে হাতিগুলো? তাও একটি-দুটি নয়— 'এ হার্‌ড্ অব্ এলিফেন্ট'।

সুরেনদার ঠাণ্ডা মাথা। ঠিক করলেন আপাতত মেলার মাঠটাতেই হাতিগুলো রাখা হোক। চার-পাঁচ জন লোকও ঠিক করে রাখলেন— দেখাশোনা করবার জন্য। আর তিনজনে এ-ও সিদ্ধান্ত নিলেন— যত তাড়াতাড়ি হাতিগুলো আমেরিকায় পাঠানো যায়— তার জন্য চাপ দিতে হবে মিস্ টেটকে।

নির্ধারিত দিনে মিস্ টেট নামলেন ট্রেন থেকে বোলপুরে।

—হাতি?

বললেন হাতি আসছে।

মিস্ টেট সোজা আমাদের বাড়িতে এলেন: হাতব্যাগ খুলে হাতির দাঁতের তৈরি একসারি হাতি টেবিলের উপর রাখলেন। রেখে বললেন, এই যে আমার 'হার্ড্ অব্ এলিফেন্ট'।

স্বামীর ভ্যাবাচাকা ভাবখানার দিকে চেয়ে মিস্ টেটের সেই মুখব্যাদন-করা হাসি ছিল দেখবার মতো সেদিন।

ছোটো-বড়ো কত কথা কতজনকে নিয়ে, ভিড় করে আসে সব ধরা পড়বার জন্য। ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেলেও কি শেষ আছে এর?

সিডার ব্লুম এলেন সুইডেন থেকে, শ্রীনিকেতনে ওঁদের দেশের তাঁতশিল্প শেখাতে। তাঁতশিল্পে নাম আছে তাঁর দেশে। বেশ গোলগাল— অথচ মোটা নয়, ভারি মিষ্টি দেখতে। হাসি-হাসি মুখ থলথল খিলখিল হাসি — দেখা হলেই। বেশ পাগলী পাগলী ভাব। সিডার ব্লুমের পাগলামির কিছুটা পরিচয় আগেই এসে পৌঁচেছিল আশ্রমের কর্তাব্যক্তিদের কাছে। সিডার ব্লুম জেদ ধরেছে— তার একটা ছোটো বোট আছে, সেটা নিয়ে আসছে জাহাজের সঙ্গে। সিলোন থেকে সে এই বোটে কলকাতায় আসবে। একা সে চালায় এই বোট, একাই আসবে। সকলেই প্রমাদ গুনলেন, একা মেয়ে সাগরপাড়ি দিয়ে আসবে ছোটো একটা বোটে করে— এ দায়িত্ব নেবে কে? তখন ব্রিটিশ আমল, তাদের সঙ্গে লেখালেখি করে বোট আনা আটকানো গেল। বোট সিলোনে রইল, বলা হল— যখন ফিরে যাবে এই বোট আনিয়ে নেওয়া হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আশ্রমে কয়েকদিনের মধ্যেই সিডার ব্লুম সকলের প্রিয় হয়ে উঠল। তাঁতশিল্পে ওস্তাদ সে— নতুন তাঁতে নতুন নক্শায় বেড-কভার টেবিল-ঢাকা সব হতে লাগল। দেখে আমাদের যত উল্লাস।

সিডার ব্লুমের যেন সবই ভালো ছিল। ওকে নিয়ে আমরা হাসি-তামাশায় কত সময় কাটিয়েছি। কোনার্কে থাকি তখন— লাল বারান্দায় এসেই দুটো ডিগবাজি খেয়ে নিত, নিয়ে নিজেই হাসত সকলের আগে। আমাদের বাড়ি যেন ওরও বাড়ি, এমনি সহজ ছিল ওর যাওয়া-আসা। লোকে বলে ভাষা না জানলে ভাব জমানো যায় না, সে কথা কি পারি মানতে? তখন প্যারিস থেকে মাদমোয়াজেল ক্রশ্চান বস্নেক্ এলেন, গুরুদেব তাঁকে শ্রীভবনের ভার দিলেন। বস্নেক শ্রীভবনের কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের কাছে চলে আসতেন। বলতেন, থেকে থেকে

কোলাহল হতে একটু তফাতে না এলে আমার চলে না। তিনি আমাদের কাছেই খেতেন দুবেলা। তাঁর পাকস্থলীর অবস্থা ভালো ছিল না, অপারেশন ইত্যাদি হবার পর আরো সঙ্গিন হয়। বিশেষ ভাবে হালকা কিছু রান্না করে দিতাম ওঁর জন্য। তিনিও আমাদের বাড়িরই একজন হয়ে গিয়েছিলেন।

বস্‌নেক যখন এলেন এখানে, শুধু ফরাসি-ভাষা জানতেন, সিডার ব্লুম তাঁর মাতৃভাষা ছাড়া কথা বলতে পারতেন না, আর আমি তো পুরোপুরি বাঙালি। আমরা তিনজনে মিলে কত সুখের মুহূর্ত কাটিয়েছি। আমার স্বামী একদিন রথীদা সুরেনদাকে নিয়ে চুপি চুপি এসে আড়ালে দাঁড়ালেন, শেষে বলে উঠলেন, ও রথীদা, এরা কথা বলে না, কেবল হাসে আর হাত নাড়ে।

এই কথা নিয়ে আমাদের সকলের হাসাহাসির অন্ত থাকে নি।

সিডার ব্লুম আমাদের বাঙালি রান্না ঝালে-ঝোলে— খুব পছন্দ করতেন, চেয়ে চেয়ে খেতেন। মাঝে মাঝে ওঁর ঘরেও নিমন্ত্রণ করতেন— বলতেন, একসঙ্গে চা খাব আজ। কিন্তু ওঁর ঘরে ঢোকাটাই ছিল একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। আশ্রমে নেড়ি কুকুরের ছড়াছড়ি। তার মধ্যে অর্ধেক হল রোঁয়া ওঠা ঘেয়ো কুকুর। সিডার ব্লুম যতগুলি পারতেন ঘেয়ো কুকুর ধরে ধরে তার ঘরে এনে বন্ধ করে রাখতেন পাছে অন্য কুকুররা কামড়ায় তাদের। হাসপাতাল থেকে গাদা গাদা মলম কাগজে মুড়ে নিয়ে আসতেন, কুকুরগুলির ঘায়ে লাগিয়ে দিতেন। আলাদা করে ভাত ডাল রান্না করিয়ে তাদের খাওয়াতেন। সিডার ব্লুম বড়ো ভালোবাসে আমাকে। যেখানেই দেখতে পেত— হয়তো বেশ দূর দিয়েই যাচ্ছি— সে ছুটে এসে 'লিল্লা রানী' 'লিল্লা রানী' বলে দু হাতের থাবায় আমার মুখ ধরত। কোনো-কোনো দিন দু হাত থাকত কুকুরের ঘায়ের রক্তে মাখামাখি। একটু আগে তাদেরও এই ভাবে আদর করেছে হয়তো সিডার ব্লুম।

কবে আশ্রম ছেড়ে চলে গেছে নিজের দেশে, আজও যেন তাকে হেসে হেসে ছুটোছুটি করতে দেখি এখানে।

মিস বস্‌নেক ছিলেন একেবারে অন্য ধরনের মহিলা। তাঁর কথা বলে শেষ করা যায় না। বিদেশিনী এই-কয়জন সবাই আমার বড়ো ছিলেন বয়েসে। বস্‌নেক ছিলেন সকলের বড়ো— আমার চেয়ে প্রায় বারো-চৌদ্দ বছরের বড়ো। শান্ত স্নিগ্ধ স্বভাব। হালকা লম্বা গড়ন। যতদিন আশ্রমে ছিলেন শাড়ি পরতেন, তাতে তাঁর কমনীয়তা আরো বেড়ে যেত। ইংরাজি তো দেখতে দেখতে শিখে গেলেন,

বাংলাও ভালো শিখলেন। দেশে গিয়ে গুরুদেবের 'ছেলেবেলা' ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করলেন। নাম হয়েছিল খুব। একটা মজার কথা মনে পড়ল— বস্‌নেক যখন বাংলা শেখা শুরু করলেন এখানে, একটি গুজরাটি ছেলে— বাংলা ভালোই জানত, সে বস্‌নেকের ঘরে এসে বাংলা পড়াত। ছেলেটিকে তিনি কিছু সাহায্যও করতেন— পারিশ্রমিক বাবদ। একদিন একটা লাইন ছিল— পঙ্গপাল এসে খেতের সব শস্য খেয়ে গেল। পঙ্গপাল মানে কি? ছেলেটিও জানে না কথাটার ঠিক অর্থ, একটু মুশকিলে পড়ল, ভাবল শিশুপাল, অমুক পাল, তমুক পাল, পঙ্গপালও বুঝি-বা তাই হবে। বললে পঙ্গপাল হল একজনের নাম।

বস্‌নেকের মনে ধরল না কথাটা। একটা লোক কী করে খেতের শস্য খেয়ে যায়? স্বামী যখন বুঝলেন— সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন গুরুদেবকে বলতে ঘটনাটা।

আশ্রমের অনুরাগী দানিয়েলো, বুরনিএ এই নামেই এঁদের ডাকতাম, আমরা— দুই ফরাসী বন্ধু থাকতেন এখানে। অভিজাত বংশের ছেলে এঁরা। দানিয়েলো ছিলেন সংগীতানুরাগী, সংগীত সম্বন্ধে বই লিখেছিলেন, এ নিয়ে তাঁকে বহু বছর কাজ করতে দেখেছি। শুনেছি সে বই বিদেশে খুবই খ্যাতিলাভ করেছিল।

বুরনিএ খুব ভালো ফোটো তুলতে পারতেন। অর্থের অভাব ছিল না এঁদের, বরং প্রাচুর্যই ছিল। বুরনিএ নেসেল্‌স্ ছিলেন নেসেল্‌স্ চকোলেটের নাতি। আমরা তাঁর পরিচয় দিতে এই ভাবেই দিতাম। দুজনেই এঁরা শিল্প-রসিক ছিলেন। একটা 'ক্যারাভ্যান' ছিল এঁদের— সেই ক্যারাভ্যানে শোবার জায়গা, বসবার জায়গা, রান্নাকরার জায়গা মায় বাথরুম সবই ছিল, অবশ্য ছোটো আকারে। এঁদের কাজ চলে যেত। এই ক্যারাভ্যানে করে এঁরা ভারতের নানা স্থান ঘুরে বেড়াতেন— কোথায় রাজস্থানে কোন্ মরুভূমিতে প্রকাণ্ড পাথরের মূর্তি পড়ে আছে— তুলে নিয়ে আসতেন। শিল্প সংগ্রহে এঁদের অদম্য উৎসাহ ছিল। পরে শেষের দিকে এঁরা পাকাপাকি ভাবে কাশীতে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। দুজনেই হিন্দু হয়ে গেলেন। টিকি রাখলেন। রোজ গঙ্গাস্নান করেন, পণ্ডিত রেখে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরনেও পণ্ডিতের মতো সাদা কুর্তা ধুতি।

কাশীতে গঙ্গার তীরে তীরে নানা রাজাদের প্রাসাদ, অসিঘাটে এই রকমই এক রাজপ্রাসাদ ভাড়া নিয়ে তাঁরা থাকেন। সেই বাড়িতেও গিয়েছি আমরা, আগাগোড়া দেশী চিক পর্দা মাদুর গালিচা দিয়ে বাড়িটি সাজিয়ে নিয়েছেন— যেখানে যা আর্টিস্টিক কিছু পেয়েছেন তাই দিয়ে প্রাসাদের হল অন্ধিসন্ধি সব ভরিয়ে ফেলেছেন। ঘুরে

ঘুরে দেখে অবাক হয়ে যেতাম। আমাদের দেশ, অথচ আমরাই জানি না এর কত-কিছুর সন্ধান।

এঁরা যখন আশ্রমে ছিলেন তখন শ্রীভবনের জন্য গুরুদেব একজন উপযুক্ত মহিলা পাওয়া যায় কি না— এ নিয়ে বলেছিলেন এঁদের। শুনে এঁরাই এঁদের বন্ধু মাদমোয়াজেল ক্রিশ্চান বস্‌নেককে আনিয়ে দিলেন। ক্রিশ্চানের ব্যয়ভারও এঁরাই বহন করতেন ; ক্রিশ্চান আশ্রম থেকে কখনো কোনো টাকা নেন নি। বরং নিজের মাসিক প্রাপ্য টাকাটাও নানাভাবে এখানেই খরচ করতেন।

বিদেশিনীরা থাকতে জানেন। শ্রীভবনের অতি সাধারণ ঘরখানা সামান্য জিনিস দিয়ে এমন সুন্দর করে রাখতেন ক্রিশ্চান— ঘরে ঢুকে মনটা তৃপ্ত হয়ে যেত। শ্রীভবনের ঘরে ঘরেও এই সৌন্দর্য তিনি এনে দিয়েছিলেন। মেয়েদের মনেও জাগিয়ে দিয়েছিলেন একটা সৌন্দর্যবোধ।

মেয়েরা সপ্তাহের ময়লা কাপড়গুলি খাটের তলায় ঘরের কোণে জমিয়ে রাখে, নোংরা লাগে দেখতে ঘর। ক্রিশ্চান নিজের খরচে শ্রীনিকেতন হতে রঙিন মোটা কাপড় কিনে প্রতি মেয়ের জন্য সুন্দর করে থলি বানিয়ে দিলেন— ধোবিকে দেবার ময়লা কাপড়গুলি তাতে ভরে রাখবার জন্যে। রঙিন থলিগুলি ঝুলত সাদা দেয়ালের গায়ে, দেখতে ভালো লাগত— শৌখিন দেখাত।

সহজ সুন্দর পরিচ্ছন্নতা শ্রীভবনের ঘরে ঘরে তখন বিরাজ করত। ক্রিশ্চান বস্‌নেক আমাদের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গিয়েছিলেন— তাঁকে ছাড়া আমাদের পরিবার পূর্ণ হত না, এখনো হয় না।

অভিজিৎ তাঁকে ডাকত তান্‌ত্‌ ক্রিশ্চান বলে। ১৯৪২ সালে যখন জেলে গেলাম, পাঁচ বছরের অভিজিৎকে তান্‌ত্‌ ক্রিশ্চান নিজের কাছে রাখবেন, এই নিয়ে আমার স্বামীর সঙ্গে একটু মনকষাকষি হয়ে গেল। স্বামী অভিজিৎকে ছাড়তে চাইলেন না নিজের কাছ হতে। ক্রিশ্চান দিনের মধ্যে কতবার করে আসতেন, মায়ের মতো অভিজিৎকে আগলে রাখতেন। এখন অভিজিৎ প্রায় মাঝ বয়সে এসে পৌচেছে, এখনো তার তান্‌ত্‌ ক্রিশ্চান তার কাছে তেমনই আছে। দু বছর আগে অভিজিৎ তার পুত্র অভীক ও স্ত্রী শিপ্রাকে নিয়ে গেল প্যারিসে— তার তান্‌ত্‌ ক্রিশ্চানকে স্ত্রী-পুত্র দেখাতে। দেখতে চেয়েছিলেন। প্যারিসে অভিজিৎ এই প্রথম গেল, তান্‌ত্‌ ক্রিশ্চানের কাছে রইল কয়দিন, কিন্তু প্যারিসের আর-কিছু দেখল না বেড়িয়ে। বলল, শুধু যে আমি তান্‌ত্‌ ক্রিশ্চানের জন্যই এসেছি— এটা

বোঝাতে পারতাম না নইলে।

কয়দিন আগে উমা গিয়েছিল বিদেশে, দেখা করেছে ক্রিশ্চানের সঙ্গে। ক্রিশ্চান তার হাতে চিঠি লিখে পাঠিয়েছে, লিখেছে উমা ফিরে গিয়েই তোমার সঙ্গে দেখা করবে— হাতে হাতে পাবে চিঠিখানা। সেইসঙ্গে পাবে আমার খবর তার কাছে, যেমন পেয়েছি তোমার খবর আমি। তোমাদের কথা এ জীবনে ভুলব না রানী। তুমি, অনিল ছিলে আশ্রমে বিদেশীদের বন্ধু। তোমাদের সাহায্যেই আমি ভারতকে জেনেছি; ভারতের লোকদের চিনেছি। সেই-সব স্মৃতি আমার কাছে অমূল্য সম্পদ।

অনেক বয়েস হয়ে গেছে ক্রিশ্চানের, হবেই তো। ফোটো পাঠিয়েছে— দেখলাম। আমিও তো আর সেই রানী নেই।

দিন দ্রুত পা ফেলে চলে।

১০

ভিজেমাটির সোঁদা গন্ধ আশ্রমে এসেই প্রথম পেলাম। ঢাকা বিক্রমপুরের মাটি জলসিক্ত আঠালো, সে মাটিতে এ সৌরভ নেই। প্রথম বর্ষার নতুন জল দু-চার ফোঁটা এখানে শুকনো লালমাটির উপর পড়ল, কি, জল-লাগা মাটির সোঁদা গন্ধটি ছড়িয়ে পড়ল চার দিকে। তখন বয়স কম, আঙিনায় নেমে দু হাত তুলে খুশিতে ছুটোছুটি করি— আঃ, এই তো ভিজেমাটির সেই সুগন্ধ।

শান্তিনিকেতনে চার দিকে যেন আনন্দের ছড়াছড়ি। খোয়াই-বেষ্টিত ডাঙা— এই শান্তিনিকেতন। এই খোয়াই-ই বা কত সুন্দর, কেবলই যেন ডাক দেয়, 'এসো এসো'। এই ডাক শুনেই একদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম খোয়াইয়ের বুকে, ভয়ও পেয়েছিলাম খুব। ভয়ে দিশেহারা হয়ে গিয়াছিলাম। সেই গেছে একদিন।

তখন আমরা সবে এসেছি আশ্রমে। এমনিতরো এক নতুন-বর্ষার দিনে আঙিনা হতে পথে, পথ হতে প্রায় নাচের তালে ছুটতে ছুটতে দু বোন এসে পড়লাম খোয়াইতে। পড়লাম তো আর আনন্দের পরিসীমা নেই আমাদের।

উঁচুনিচু শুধুই লাল কাঁকরের ঢিবি, এক ঢিবিতে উঠি আর নিজেকে আলগা করে ছেড়ে দিয়ে হুড় হুড় করে নেমে সেই নামার গতিতেই আর-এক ঢিবির মাথায় গিয়ে চড়ি। এ যেন লাল সমুদ্রের তরঙ্গ, একটা থেকে আর-একটা তরঙ্গের উপরে

উঠছি নামছি, আর দু বোনে হেসে একে অন্যকে পাল্লা দিচ্ছি।

বিকেলে দিনের আলো থাকতে বেরিয়েছি, খেয়াল নেই কখন চার দিক ঘিরে সন্ধে নেমে এসেছে। এ-সব দিকে তখন জনবসতি ছিল না। ছিল শুধু বহু দূরে দূরে ছোটো ছোটো সাঁওতাল গ্রাম দু-চারটা। ডাঙা থেকে খোয়াইয়ের লেভেল বেশ খানিকটা 'নামুতে'। খোয়াইয়ের ভিতরে দাঁড়ালে দেখা যায় না আশ্রমটা।

এতক্ষণে বড়ো ভয় হল। এই খোয়াইয়ের দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে এখন বের হই কিভাবে। কেমন করেই বা পথে উঠি? যে দিকেই ছুটি কেবলই খোয়াই। কেবলই অন্ধকার। অনেক পরে একটা টিমটিমে আলোর আভাস পেলাম, সেই আলো ধরে একটা ডাঙায় উঠলাম— একটা ছোটো সাঁওতাল গ্রাম। সেখানে দাঁড়িয়ে চক্রাকারে মাথা ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে দেখলাম দূরে পুব দিকে আলো কতকগুলি। ঐ-তো আমাদের আশ্রম। এবারে মরিয়া হয়ে ছুটতে লাগলাম, আশ্রমে এসে পৌঁছলাম। এতক্ষণে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম।

আর কখনো এমন করে খোয়াইতে যাই নি, গেলেও এভাবে পাগলের মতো ছুটি নি।

এখন সে রকম খোয়াই আর নাই। কত খোয়াইতে বন তৈরি হয়েছে। কত খোয়াই বাঁধ দিয়ে সরোবরের মতো জল ধরা হয়েছে। কত খোয়াইয়ের ঢিবির কাঁকর কেটে কেটে গোরুর গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে সরকারি পথ করেছে, নিচু জমি উঁচু করেছে। খোয়াইয়ের বুক চাঁছা সমতলভূমিতে এমন কত বাড়ি, বাগান উঠেছে।

বর্ষায় এর গা ধুয়ে এখন আর লাল জলের স্রোত বয়ে যায় না। শেষবেলাকার রোদটুকু এসে আর লাল কাঁকরের গায়ে হেসে লুটিয়ে পড়ে না। এখন হাসে শুধু আমাদের বাড়ি-বাড়িতে লাল কাঁকর ফেলা আঙিনাটুকুতে বর্ষার শেষবেলাকার আলো। তাও বা কতটুকু সময়ের জন্য?

আশ্রমে টাকার অভাব— অভাব বরাবরই, তবে যেবার একটু বেশি রকমের টানাটানি পড়ত— নাচ গান অভিনয়ের 'শো' দেওয়াই ছিল একটা ঝটপট টাকা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা। কলকাতাতেই 'শো' দেওয়া হত বেশির ভাগ, বাইরে থেকে আমন্ত্রণ এলেও যাওয়া হত।

জাপান থেকে আমন্ত্রণ এল। লোক এল। আমাদের ফোটো তুলল। জাপানের খবরের কাগজে ছাপা হল ফোটো, খবর রটল এঁরা আসছেন। সেই কাগজের কাটিং

আমাদের পাঠালেন। উদয়নের পশ্চিমের বারান্দায় রোজ রিহার্সাল হয়— দল তৈরি। শেষে কী কারণে যেন যাওয়া হল না মনে করতে পারছি না। এ-সব মনে রাখতেন আমার স্বামী, আমি শুধু দেখে গিয়েছি, ছবি ধরা আছে চোখে।

সেবারে সিলোন থেকে আমন্ত্রণ এল গুরুদেবের কাছে। বন্ধু উইলমট পেরেরা— গুরুদেবের ভক্ত, এসে ছিলেন বেশ কিছুকাল শান্তিনিকেতনে। এখন যেখানে কো-অপারেটিভ স্টোর, সেখানে ছিল খড়ের চালের এক চৌচালা মাটির বাড়ি। সেই বাড়িতে ছিলেন উইলমট সস্ত্রীক।

এঁর আগে ছিলেন বাকেসাহেব এই বাড়িতে। প্রকাণ্ড চেহারার স্বামী স্ত্রী, দেখতে রূপবান রূপবতী। বাকেসাহেব পরতেন পাজামা পাঞ্জাবি, পত্নী পরতেন শাড়ি— বাঙালি মেয়েদের মতো ঘুরিয়ে, শাড়ির আঁচলটি থাকত মাথার উপরে তোলা। পথ চলতেন দুজনে— রাস্তাটি জুড়ে চলতেন, এমনই মানানসই চেহারার ছিলেন এই দম্পতি। মুখে হাসি ছিল সর্বদা। রবীন্দ্রসংগীতের অনুরাগী ছিলেন। গানই তাঁদের নেশা। বোষ্টম-বাউলের গানও শুনতেন তাদের ধরে ধরে। একদিন এক রামায়ণ গাইয়ের দল গানের পালা সেরে কোথা থেকে যেন ফিরছিল এই পথ দিয়ে। বাকেসাহেব তাদের আটকালেন, বাড়ির আঙিনায় তাদের রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। শ্রীভবন ও এখানে-ওখানে খবর পাঠালেন— সন্ধেবেলা রামায়ণ গান হবে। আমরা সকলে এলাম। বাকেসাহেবের বাড়ির উঠোনে রামায়ণ গান হল— 'রাবণ বধ'। বাকে-পত্নী খুব আগ্রহ নিয়ে শুনলেন। তাঁদের আগ্রহ দেখে চামর হাতে মূলগায়েন লাফালাফি করে 'রাবণ বধ' দ্বিগুণ জমিয়ে তুলল।

এই বাড়িতেই পরে উইলমট ও এজ্‌মী এসে থাকে। তখনো আমি জানি না এঁদের। উত্তরায়ণের সামনে মেলার মাঠ— একা একা একদিন সাইকেল চড়া শিখছি। তখন লেডিজ সাইকেল দেখি নি তেমন, বলতে গেলে দেখিই নি। গৌরদার সাইকেলটা নিয়ে এসেছিলাম শ্রীনিকেতন হতে। দ্বিপ্রহর— জনশূন্য মাঠ; ধারে কাছে কেউ কোথাও নেই। পড়ে গেলে দেখতে পাবে না কেউ। নিশ্চিন্ত মনে সাইকেলে উঠতে যাচ্ছি, আর আছাড় খাচ্ছি। বার-কয়েক হল এই রকম। ছেলেদের সাইকেল— অনেকটা উঁচু। কিছুতেই কায়দাটা আয়ত্তে আনতে পারছি না। এমন সময়ে দেখি শ্যামবর্ণের ছিপছিপে এক যুবক-ভদ্রলোক হাসতে হাসতে এসে দাঁড়ালেন সামনে। মুখে অতি শুভ্র দাঁতের সারি ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। পরনে সাদা লুঙ্গি পাঞ্জাবি। সবই তাঁর ভালো— কিন্তু দাঁতের সারিটা না দেখালেই

পারতেন। বেশ অপ্রস্তুত লাগল আমার। কী আর করি। মেনেই নিই। তিনি সেই রকম হেসে হেসেই কোনো কথা না বলে সাইকেলটা দু হাতে ধরলেন, আমি চেপে বসলাম। তিনি সাইকেলটা ধরে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়লেন— খানিকটা গিয়ে সাইকেলটা ছেড়ে দিলেন, আমি প্যাডেল করতে করতে এ-কাত ও-কাত হতে হতে ধুপ করে পড়ে গেলাম। ভদ্রলোক আবার হাসতে হাসতে এসে সাইকেলটা তুলে ধরলেন, আমি আবার চাপলাম, আবার তিনি সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল ধরে দৌড়লেন— আবার ছেড়ে দিলেন। আবার পড়ে গেলাম। এই রকম ধুপধাপ পড়ে যেতে যেতে সেইদিনই সাইকেল চড়া শিখে ফেললাম। দূরে দেখি তাঁর স্ত্রী বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন। অঙ্গের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ হওয়ার দরুনই এঁদের শুভ্র দাঁতের সারি অনেক দূর থেকে দেখা যায়। এঁরাই উইলমট দম্পতি।

আমার বিয়ের পর উইলমট আমার সাইকেল চড়ার বর্ণনা দিয়েছিলেন আমার স্বামীকে— আমারই সামনে। দুষ্টু দুষ্টু হেসে বলেছিলেন যে, বারান্দায় বসে বসে দেখছি আর গুনছি রানী তেষট্টিবার পড়ে গেল সাইকেল থেকে। তখন আমি এগিয়ে গেলাম, বলে আরো হেসেছিলেন স্বামী-স্ত্রীতে মিলে।

তখনকার সিলোন ছিল বিদেশী সভ্যতায় ভরা। উইলমট শান্তিনিকেতনে এল। স্যুট পরা ছেড়ে দিলেন— জাতীয় সাজ লুঙ্গি ধরলেন। পরে যখন সিলোনে গিয়েছিলাম উইলমটের মা কত দুঃখ করলেন— আমার বিদেশে পড়া ছেলে, বিদেশে মানুষ, তোমাদের শান্তিনিকেতনে কী আছে, যে, আমার এমন সাহেব-ছেলে সে কিনা এখন এমনভাবে দেশী হয়ে গেল।

উইলমট শান্তিনিকেতন থেকে দেশে ফিরে নিজের এস্টেটে 'শ্রীপল্লী' নাম দিয়ে শান্তিনিকেতনের মতো স্কুল খুললেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এ কাজে নিজেদের উৎসর্গ করলেন।

এই উইলমটের আগ্রহেই সিলোন থেকে গুরুদেবের কাছে আমন্ত্রণ এল। সিলোনের কর্তাব্যক্তিরা এর আয়োজন করলেন।

বিরাট দল যাবে। এতদূরে এত বড়ো দল নিয়ে এই-ই প্রথম যাওয়া। শাপ-মোচন তখন তৈরিই ছিল, আরো রিহার্সাল দিয়ে তা আরো জমজমাট করা হল। শাপমোচনই প্রথম নৃত্যনাট্য।

সুরেনদা আগে চলে গেলেন সেখানে, বিধি-ব্যবস্থা করতে। এতগুলি মানুষ— কোথায় থাকবে, কী খাবে ; মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা, ছেলেদের ব্যবস্থা— গুরুদেব

কোথায় থাকবেন— কী কী তাঁর দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন— যাতে তাঁর কোনো কিছুতে অসুবিধে না হয়— এই-সব নিয়ে উইলমটরাই চেয়েছিলেন যে এখান হতে আগেভাগে কেউ গিয়ে ওঁদের এ বিষয়ে সাহায্য করে। সুরেনদা গেলেন। কিছু-দিন বাদে গুরুদেবের সচিবকেও ডেকে পাঠালেন— তিনিও গেলেন।

তার পর ওখানকার নির্দেশ অনুযায়ী একদিন গুরুদেব আমাদের নিয়ে রওনা হলেন। নন্দদা শৈলজাবাবু বোঠান মীরাদি হুটুদি নাচের মাস্টার ছেলের দল মেয়ের দল মিলে মস্ত দল। সবাই স্টিমারে উঠলাম— কলকাতা থেকেই উঠলাম।

জাহাজের কেবিনে ঢোকা এই প্রথম। গোল গোল পোর্ট-হোল দিয়ে দেখি জল, জলের ঢেউ — ভারি ভালো লাগল। অনেকেই বলে দিয়েছিলেন— আমার স্বামীও লিখে জানিয়েছিলেন, জাহাজে আসছ— 'সি-সিকনেস' হয়, সাবধানে থেকো। সি-সিকনেস কি রকম জানি না। রাত কাটল, পর দিন জাহাজ সাগরে পড়ল, উঠে তাড়াতাড়ি উপরে গেলাম। পার থেকে উঠেছি ; এখন পারাপার-ভাসা জল— শুধু জল। খুব ভালো লাগল। কিন্তু মাথাটা যেন গুলিয়ে উঠছে, কেন? খাবার জন্য ডাক পড়ল, গেলাম খাবার ঘরে। ঘর প্রায় খালি। মেয়েরা কেউ-ই নেই। হৈমন্তীদি ছুটোছুটি করছেন, বলছেন, সবাই সি-সিকনেসে বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছে, কিন্তু খেতে হবে, সবাইকে খেতে হবে। না খেলে আরো শরীর খারাপ হবে। হৈমন্তীদি খাবার নিয়ে মেয়েদের কেবিনে গিয়ে গিয়ে জোর করে খাইয়ে আসতে লাগলেন। আমি ভাবলাম— গা দোলে মাথা ঘোরে, মা দিদিরও এমনি হত নৌকোয় উঠলে। সি-সিকনেস কী আর এমন? না-না, ও-সব কিছু নয়। নিজের মনেই নিজে মাথা-ঝাঁকুনি দিলাম।

সি-সিকনেসে কয়দিন অনেকেরই বড়ো কষ্ট গেল।

গুরুদেব উপরের কেবিনে আছেন— তাঁর কাছে যাই থেকে থেকে। তিনি যেন একটু অন্যমনস্ক। চুপ করে থাকেন— কিছু লেখেন— দূরের দিকে তাকান। জোর করে যেন দু-একটা কথা বলেন, চলে আসি সেখান থেকে।

জাহাজের উপর-নীচ কেবিন-ডেক ঘুরে ঘুরে দিন-কয়টা কেটে যায়। সমুদ্রের নীল, উড়ুক্কু মাছ, সাদা ফেনা দেখে দেখে নেশাখোরের মতো ঝিম্ ধরে।

স্টিমার এসে লাগে কলম্বোর বন্দরে। সংবাদপত্রের ফোটোগ্রাফাররা উঠে আসে জাহাজে। এখন যেমন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে ফোটোগ্রাফাররা তখন কিন্তু এমনটা দেখি নি। কত নম্র কত সমীহের সঙ্গে আসতেন গুরুদেবের কাছে, কি

না, একটা-দুটো ছবি তুলবেন।

পৌঁচেছিলাম খুব সম্ভব রাত্রিবেলা, সন্ধেরাত্রি হলেও অন্ধকারটা মনে আছে। তাই বলছি রাত্রিবেলার কথা। জাহাজ থেকে বোট, বোট থেকে তীর, গুরুদেবকে কারা কিভাবে নিয়ে গেলেন দেখা হয় নি।

সমুদ্রের উপরে বিরাট প্রাসাদ— বিজয়বর্ধনের বাড়ি, গুরুদেব থাকবেন যাঁদের বাড়িতে তাঁরা গণ্যমান্য সজ্জন ধনী তো হবেনই। এঁদের বাড়ির সম্পূর্ণ একটা দিক গুরুদেবের জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সমুদ্রের মুখোমুখি বারান্দা, ঘর, বসবার ঘর, বাথরুম— গুরুদেবের জন্য। তার পরের ঘরখানায় রইলেন বোঠান, তার পরের ঘরে সেক্রেটারি হিসাবে আমার স্বামী ও আমার স্থান, এর পরেরটায় থাকেন সুরেনদা। এই ঘরগুলির সামনে চওড়া লম্বা প্রকাণ্ড ঢাকা বারান্দা, আলো-হাওয়া নারকেল পাতার দোলায় ভরা।

শহরের আর দুই বিরাট বাড়িতে আছেন আমাদের দলের সবাই।

নতুন দেশ, নতুন ব্যবস্থা— সবাই খুব ব্যস্ত হয়ে আছেন। তাঁরা আরো ব্যস্ত হয়ে পড়লেন গুরুদেবের থমথম করা মুড দেখে। থেকে থেকেই গুরুদেব উষ্মা প্রকাশ করেন। মেয়েরা কোথায় আছে? কে তাদের দেখছে? একা মীরু পারবে কেন?

সুরেনদা বোঠান গিয়ে গিয়ে সব দেখেশুনে আসেন, এসে গুরুদেবকে খবর দেন, নিখুঁত সুন্দর ব্যবস্থা, তিল ত্রুটি নেই কোথাও।

গুরুদেবের তবু যেন কেমন কেমন ভাব। বারান্দায় বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকেন, গুরুগম্ভীর মুখ। কাছে কেউ যেতে সাহস করেন না, অথচ না গেলেও নয়। সব-কিছুই তো তাঁকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে, প্রোগ্রাম ঠিক করতে হবে।

একদিন তো অতি সামান্য কারণে রুষ্ট হয়ে উঠলেন— একটা খাতা চাই, এক্ষুনি, এই মুহূর্তে। কেন আমার কাগজপত্র আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে না— এ-সব কেন কেউ খেয়াল রাখবে না।

আমার স্বামীর উপরে বেশ রাগ করে উঠলেন। গাড়ি করে দোকানে যাওয়া —খাতা কিনে আনা— আসা-যাওয়ায় একটু সময় তো দরকার? কিন্তু কে বলে এ কথা তাঁকে? আমার কাছে ছিল একটা নতুন খাতা— স্কেচ করবার জন্য, আশ্রমের রঙ— কমলা রঙের মলাট, সেখানা তাড়াতাড়ি নিয়ে রাখলাম গুরুদেবের সামনে।

স্বামী বাজারে ছুটলেন। বোঠান স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন ঘরে। বললেন,

বাবামশায় নিশ্চয়ই কোনো ক্যারেকটার নিয়ে মুশকিলে পড়েছেন, তাই তাঁর এই রকম ভাব।

বোঠান তাঁর বাবামশায়কে ভালো করে জানেন। এতকাল এত কাছে আছেন, গুরুদেব কখন কিভাবে থাকেন ধরতে পারেন। জাহাজেই দেখেছিলাম কী যেন ভাবছেন, কী যেন লিখছেন।

অনেক খাতা কাগজ এসে গেল। গুরুদেব লিখে চলেছেন। মনও তাঁর হালকা হয়ে এসেছে। বক্তৃতা, নৃত্যনাট্য হতে লাগল দিনের পর দিন। গুরুদেব সন্তুষ্ট হলেন— অডিয়েন্সদের সন্তোষ দেখে। খুব ভিড় হতে লাগল প্রতিটি শোতে। টাকাও বেশ উঠতে থাকল।

এ বাড়ির মেয়ে-বউদের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। যখন-তখন তাঁরা আমাকে তাঁদের মহলে নিয়ে যান, গুরুদেবের কথা জিজ্ঞেস করেন, আশ্রমের কথা জানতে চান।

এঁদের সাজ আমার বড়ো সুন্দর লাগে। শুনেছি আমাদের দেশে যেমন ব্রিটিশের ইনফ্লুয়েন্স, এখানে তেমনি ডাচ্‌দের ইনফ্লুয়েন্স। ধনী-জ্ঞানীদের ঘরে সিলোন-এর নিজস্ব সংস্কৃতি তেমন কিছু পাওয়া যায় না— সবই বিদেশীভাবাপন্ন। মেয়েদের গায়ে লম্বা হাতার সুন্দর কাট-এর ফিট করা টাইট ব্লাউজ কোমর অবধি, কোমর থেকে পা পর্যন্ত লম্বা গাউন। সাদা কাপড়ের সাজ-ই বেশি, ব্লাউজে একটু ছিটেফোটা বুটি কখনো। লেসটা খুব ব্যবহার করা হয় পরিধেয় বস্ত্রে, সেজন্য আরো সুন্দর শৌখিন লাগে। পা-লুটিয়ে-পড়া গাউন, মেয়েদের চলনেও তাই বেশ একটা রানী-রানী ভাব।

আমাদের ঘর থেকে এক তলায় এঁদের রান্নাবাড়িটার অনেকখানি স্পষ্ট দেখা যায়। দেখতাম ঝিদের— অনেক ঝি-ই কাজ করত বাড়িতে, তারাও এই রকম টাইট-ফিটিং জামা আর লম্বা গাউন পরা, কালো রঙের দেহে সাদা সাজ নিয়ে চলা-ফেরা করত, বড়ো সুন্দর লাগত। বউ-গিন্নীদের চেয়ে ঝিদের দেহের গড়ন বেশি সুন্দর। পরে সিলোন-ভ্রমণের সময়েও দেখেছি— পল্লীবাসিনীরা যেন বেশি সুন্দরী। যেমন মুখের কাট্‌, তেমনি দেহের গড়ন। খেতে-খামারে কাজ করছে তাদেরও এই সাজ।

এই বাড়িতেই প্রথম দেখলাম লম্বা লাঠির ডগায় বাঁধা ঝাঁটা দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝাঁট দিচ্ছে ঝিরা। সোজা ঋজু দেহ, লম্বা লাঠি ধরে ঝাঁট যে দিচ্ছে বেঁকতে

হচ্ছে না একটুও। অনায়াস ভঙ্গি। এও যেন সেই রানীর মতো চলে-চলে-যাওয়া ভাব। দেখতাম, দুপুরে খাবার সময় তারা প্লেটে ভাত নিত, মাছ-তরকারিও নিত নিশ্চয়ই, বাঁ হাতে প্লেট ধরে ডান হাতে ভাত তুলে তুলে খেত— রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে বা ঘুরে-ফিরে। বসে খেতে দেখি নি একদিনও।

এদের খাবার খেতে খেতে পরে ভালো লেগে গিয়েছিল। সকালে দিত ইড্‌লি —স্ট্রিং ইড্‌লি— এর নামটা ভুলে গেছি— সরু সরু ম্যাকরনী দিয়ে যেন ইড্‌লির আকারে এক রকম পিঠের মতো। এটা খেতে খুবই ভালো লাগত। অতি সুস্বাদু খেতে। নারকেলের দুধ দিয়ে মাখা হত চালডাল বাটাটা। জল ছোঁয়াত না। প্রচুর নারকেল— প্রচুর তার দুধ। এর সঙ্গে থাকত নারকেল কোরা। এই ইড্‌লির সঙ্গে খেতে দিত ডাল মাছ আরো কত কী। সকালের খাবারই এক পর্ব। তার পর দুপুর বিকেল রাত্রের খাবার তো আছেই। দুপুরে রাত্রে থাকত ভাত আর প্রচুর মাছ— নানা রকমে রান্নাকরা মাছ। কেবল একটুখানি অসুবিধে লাগত প্রথম দিকটায়, পরে এও সয়ে গিয়েছিল— অভ্যেস এসে গিয়েছিল। এরা রান্নার জন্য যখন মসলা বাটে— হলুদ লঙ্কার মতো শুঁটকি মাছও বাটে এক থাব্‌লা। সবেতেই এই মসলা দেয়। আবার আরো বেশি সুস্বাদু করবার জন্য ইড্‌লি ইত্যাদির উপরে হাতকুরনি রেখে এক চাকা শুঁটকি মাছ এক-দুবার ঘষে দেয়। গুঁড়োটা ক্রীমের মতো ছড়িয়ে থাকে খাবারের উপরে। এটা না হলে রান্নার ফিনিশিং টাচটা হয় না— অসম্পূর্ণ থাকে। সমুদ্রের বড়ো বড়ো মাছ, তার শুঁটকি— এক-এক টুকরো ইটের মতো। এই টুকরোগুলি এই কাজেই লাগে।

গুরুদেবের জন্য বিলিতি খাবারের বরাদ্দ ছিল। বোধ হয় এই শুঁটকি মাছের গন্ধ এড়াবার জন্যই।

এই বাড়ির সব চেয়ে বড়ো আকর্ষণ হল সমুদ্র। দিবারাত্রি সে চোখের উপরে। ধূ ধূ সমুদ্রের রূপ আলাদা, উদাস করা রূপ। এ সমুদ্রও ধূ ধূ সমুদ্র, ও পারের পারাপার নেই, তবু এ সমুদ্র উদাস করে তোলে না মন। নারকেল গাছের সারির ভিতর দিয়ে জেলে-ডিঙিগুলি ঘরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেয়। নারকেল পাতার ফাঁকে ফাঁকে সাগরের ঢেউগুলিতে জলতরঙ্গ বাজে। গুরুদেব যে-বারান্দায় বসে লেখেন সেখান থেকে দেখা যায় দূরে-চলে-যাওয়া সমুদ্রকে। মেঘের ছায়ায় রোদের আলোয় সে কখনো কাছে আসে, কখনো দূরে চলে যায়। ছুটোছুটি খেলা জমায়। বড়ো সুন্দর। সিলোন জায়গাটাই সুন্দর। সকল সবুজ সকল নীল যেন ঢেলে দিয়েছে এখানে।

গুরুদেব এসেছেন, শহর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যতই গুরুদেবের বক্তৃতা হয়, নৃত্যনাট্য হয়— খবর আসে এখনো অনেকে দেখতে পায় নি, শুনতে পায় নি। আবার এক-দুদিন বাড়িয়ে থেকে যেতে হয় সেখানে।

দিনের বেলা আমরা শহর ঘুরে ঘুরে দেখি। এখানকার গোরুর গাড়িগুলিও কত সুন্দর— যেন রথ এক-একটি। হাতের কাজ দেখে লোভ হয়— কিছু-কিছু করে সংগ্রহ করি। ঘাসের ঝুড়ি ব্যাগ— শৌখিন বস্তু। নরম ঘাস রঙ করে নানা নক্‌শা তুলে বোনা। পিতলের বাসনে অপূর্ব নক্‌শা সব খোদাই-করা। কী যে করি— কী যে কিনি ; নিশপিশ করি।

কলম্বো ছেড়ে পর পর সিলোনের কত জায়গা ঘুরলাম, দেখলাম। এক-এক জায়গায় দিনকতক করে রইলাম। সিগিরিয়া হিলে ওঠা হল না আমার, দুঃখ থেকে গেল। উঁচু পাহাড়ের অনেকটা উঠে আরো অনেকটা উপরে একটা গুহায় অতি পুরাতন ফ্রেস্‌কো। সেই গুহাটা একেবারে খাড়া সোজা পাহাড়ের মাথায়। বাঁশের মইয়ের মতো লোহার মই বেয়ে উঠতে হয়— এই লোহার মইটিও প্রায় খাড়া। দলের ছেলেরা কয়েকজন উঠে গেল, নন্দদা মইয়ের মাঝখানটা অবধি উঠেছেন— তার পরে আমি উঠছি। মনে হল যেন শূন্যে আছি— হু-হু করা তীব্র হাওয়া। নন্দদা ভয় পেলেন আমার জন্য— হয়তো ছিটকে পড়ে যাব হাওয়ার দাপটে। বললেন, তুমি আর উঠো না, নেমে যাও তাড়াতাড়ি। নন্দদারও কেমন বেগতিক ভাব। তাড়াতাড়ি আমি নেমে পড়লাম। নীচে দাঁড়িয়ে হাঁ করে উধ্বর্মুখী হয়ে রইলাম— যদি একটু দেখা যায় ফ্রেস্‌কো। তা কি যায় ?

ফাঁকে অবসরে গ্রাম-গ্রামান্তর দেখেছি এজ্‌মীর সঙ্গে। উইলমট, এজ্‌মী আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে। দেখেছি চা বাগান, রবার বন। এজ্‌মী বলেন, আমরা মেয়েরা বিয়ের সময় পিতামাতার দেওয়া কিছুটা জমি-জায়গা পাই। জমি-জায়গা হল চা বাগান, রবার বন। এটা আমাদের নিজস্ব এস্টেট। কাজেই জানো, মেয়েরা আমরা এখানে স্বামীর মুখাপেক্ষী নই। বলে, এজ্‌মী হেসে উইলমটের দিকে তাকায়।

আজ চলেছি এজ্‌মীর এস্টেট দেখতে। পায়ে হেঁটে চলেছি। মাটি না ছুঁলে যেন ছোঁয়া যায় না দেশকে। দূরে মোটর রেখে নেমে পড়লাম পথে। অদূরে একটা গ্রাম, গ্রামের পরে উঁচু জায়গাটায় রবারের বন— বড়ো বড়ো রবার গাছ ভরা। ওটাই এজ্‌মীর এস্টেট। পায়ে চলা পথ ধরে ঢালু জমিটুকু পার হচ্ছি—

জমিভরা সবুজ লিকলিকে ধান খেত। এই আজ প্রথম দেখলাম— ধানের খেতে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলা। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। দেখেছি, অনেক ধানখেত দেখেছি, ধানখেতের উপর দিয়ে হাওয়ার আলোড়ন দেখেছি, মেঘের ছায়া দেখেছি কিন্তু খেলা দেখি নি। ঠিক জিনিসটি ঠিকভাবে দেখা দেয় অকস্মাৎই। আজও চোখে লেগে আছে ধানখেতের সেই ঢেউয়ের দোলা, সেই আলোছায়ার খেলা ; সেই লুটোপুটি ছোটাছুটি। এই ধরে ধরে— ফস্‌কে যায়। হেসে হেসে লুটিয়ে পড়া ধানের ডগাগুলি মাথা তুলে দেখে মেঘ কোথায় গেল? সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ছুটে আসে, কচি ধানের অঙ্গ স্পর্শ করেই পালিয়ে যায় দূরে।

দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটুকরো এই সবুজ উপত্যকায় ছোটো এই ধানখেতটুকু এতকাল বুঝি অপেক্ষা করে ছিল লুকোচুরি খেলার রূপটি তার দেখাবার জন্যই।

এখানকার বিশেষ বিশেষ শহরে শান্তিনিকেতনের দলের জন্য প্রোগ্রাম বাঁধা ছিল সিলোনের এ-মাথা হতে ও-মাথা। মোটরেই গিয়েছি বেশির ভাগ— গুরুদেবের সঙ্গে। সবুজ সমারোহের পথ। পথের দু ধারের নারকেল পাতা জাফ্‌রি বুনে রেখেছে মাথার উপরে। আকাশ দেখা যায় সেই জাফ্‌রির ভিতর দিয়ে। আকাশের গায়ে নারকেল গাছ, নীচের মাটিতে ধানখেত। এখানে কৃষকরাও অবস্থাপন্ন। যেতে যেতে দেখি একদিন— এক মাটির দাওয়ায় বসে আছে এক কৃষক একটা ইজিচেয়ারে হাত-পা এলিয়ে। পরনে লেংটি, গায়ে কুর্তা, মাথায় মস্ত একটা ছড়ানো 'হ্যাট'। খেতে কাজ করতে করতে এসে আরাম নিচ্ছে একটু নিজের দাওয়ায় বসে। আমাদের দেশের চাষীদের দেখে আমার অভ্যেস, একে দেখে মনে হল যেন খানদানি ভাব। বড়ো ভালো লাগল, চাষ করাটাকে আর আহা, উহু— বড়ো কষ্টের— বড়ো ঝঞ্ঝাটের বলে মনে হল না।

খেতে, উঠোনে কাজ করছে মেয়েরা— লম্বা সাদা ধবধবে গাউন পরনে, কাজ করতে করতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়, পথচারীদের দেখে, সবেতেই একটা শ্রম লাঘবের ভাবভঙ্গি।

ক্যাণ্ডির নাচ সিলোনে বিখ্যাত। পুরুষেরা নাচে। গুরুদেবকে দেখালো তারা নাচ। বাগানে খোলা জায়গায় একদল লোক নাচল। পরনে লুঙ্গি, খালি গা, কুচ্‌কুচে কালো রঙের বুকের উপরে শুভ্র কড়ির চওড়া মালা আড়আড়ি ক'রে পরা, কাঁধে বাহুতে কড়ির মালার সাজ, কোমরে কড়ি-গাঁথা চওড়া বেল্ট। নাচের সঙ্গে কড়িগুলি ঝমর ঝমর বাজে। সুন্দর নাচ— বলিষ্ঠ নাচ, দৃপ্ত পদক্ষেপ, বীরত্ব-

ব্যঞ্জক ভঙ্গি। গুরুদেব খুব খুশি হলেন নাচ দেখে। শান্তিনিকেতনেও এ নাচ চালু হয়েছিল পরে। ওখান থেকে শিখে এসেছিলেন কয়েকজন। গুরুদেব যেখানে যা ভালো দেখেছেন, ভালো পেয়েছেন— বরাবর তা শান্তিনিকেতনের জন্য আহরণ করে এনেছেন।

সিলোনের হিলস্টেশন ক্যাণ্ডি। শীত নেই বললেই চলে, তবে গরমও নেই। এই ক্যাণ্ডিতে মোটরে করে উপরে উঠবার সময়ে দেখেছি গাছগুলি কী লম্বা। যেন যে যতটা পারে একে তাকে ঠেলেঠুলে উপরে উঠতে চেয়েছে। কাঁঠাল গাছ, ব্রেড্‌ফ্রুট গাছ— লিকলিকে লম্বা হয়ে তালগাছের মতো উঁচু দিকে মাথা তুলেছে। আলো হাওয়া পাবার জন্যই বোধ হয় এই আকুলতা। ব্রেড্‌ফ্রুট একটা বিশেষ খাদ্য এখানে। কাঁঠালের মতো বড়ো বড়ো ফল, অজস্র ধরে থাকে গাছে গাছে, যেমন ফল তেমনি বড়ো বড়ো পাতা। কেমন যেন সৌষ্ঠবহীন গাছ, কেবল ফলনটাই আছে। ব্রেড্‌ফ্রুট সিদ্ধ করে ভাতের বদলে খায় অপেক্ষাকৃত গরিবরা। পেটভরা খাবার।

কত রকমের নারকেল এখানে, সোনালি নারকেল, সবুজ নারকেল; ছোটো নারকেল, বিশাল আকারের নারকেল। নারকেল গাছও কত রকমের, বেঁটে, আকাশচুম্বী, মোটা, সরু— নানা জাতের। নারকেল দুধের তাই এত ঢালাঢালি রান্নাঘরে।

অনেক শহর নগর ঘুরে পানাদুরায় এলাম। চলতি স্রোতটা যেন থিতিয়ে গেল একটু। উইলমটের ইচ্ছে ছিল পানাদুরায় গুরুদেব সবাইকে নিয়ে থাকবেন কয়দিন —বিশ্রাম নেবেন। তাই হল। এখানে এসে সবাই যেন গা এলিয়ে দিল।

উইলমটের মার বাড়ি এটা, তাঁরই এস্টেট। পিতা নেই, মা একা থাকেন এখানে। বিরাট বাড়ি— দোতলা। কত যে ঘর, বারান্দা ব্যালকনি হিসাব করে কে? এই একই বাড়িতে দলের আমরা সকলেই আছি। গুরুদেব যেদিকটায় আছেন — সেই দিকটা আলাদা শুধু তাঁরই জন্য। তার পর বোঠান মীরাদি নুটুদি— তাঁদের আলাদা ঘর। সেক্রেটারির ঘরও আলাদা। নন্দদা শৈলজাবাবু— বড়ো যাঁরা আছেন তাঁদের থাকার ব্যবস্থাও আরামদায়ক— আলাদা আলাদা। এর পরে আছে ছেলের দলের থাকার একটি বিরাট হলঘর, আছে মেয়েদের মহল। তার উপরে বাড়ির লোকেরা তো আছেনই। আছে অগুনতি দাসদাসী।

একেবারে সমুদ্রের উপরেই বাড়ি, বাড়ির সামনে নারকেল বন, বন বলতে মন

চায় না— বলতে চায় নারকেল বাগান। এমন সুন্দর পরিষ্কার ঝরঝরে বাগান— কেবলমাত্র বুঝি নারকেলেরই হয়। তলায় একটি কুটোটি পড়ে নেই। সমুদ্রের ঢেউ এসে অনবরত নারকেল গাছের গোড়াগুলি ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ঢেউয়ের সাদা ফেনার রাশি পাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনেকখানি উপরে এসে কুর্নিশ করতে করতে বালির উপর দিয়ে নেমে চলে যায়। আবার আসে আবার যায়। সাদা ঝক্‌ঝকে বালির উপরে নারকেল গাছের গুঁড়িগুলি ঘুরে ঘুরে নারকেল পাতার হাওয়া খেয়ে মনে হয়, স্বপ্নে-ঘেরা কোন্ প্রবালদ্বীপে এসে পড়েছি যেন।

এইখানেই দেখেছিলাম— একদিন সকালবেলা গুরুদেব তাঁর ঘরে বসে লিখতে লিখতে কলম থামিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে উদাত্তস্বরে গেয়ে উঠলেন— ভৈরবীর সুরে একটি ক্লাসিক্যাল গানের দুটিমাত্র লাইন। এ রকম আত্মভোলা হয়ে গেয়ে উঠতে তাঁকে দেখি নি আর কখনো।

সেইদিনই গুরুদেব দলের বড়োদের ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। সেই যে জাহাজ হতে একটা লেখা শুরু করেছিলেন— যা লিখতে লিখতে এসেছেন এতটা পথ, সেই পুরো উপন্যাসটি পড়ে শোনালেন। উপন্যাসের নাম 'চার অধ্যায়'।

এতদিনে বুঝলাম কলম্বোতে গুরুদেব কেন এমন উত্ত্যক্ত, উদাসীন ছিলেন। বোঠান হেসে বললেন, বলি নি আমি? এখন দেখলে তো কী ক্যারেকটার নিয়ে বাবামশায় নাড়াচাড়া করছিলেন।

উপন্যাসটি শুনিয়ে গুরুদেব খুশি হলেন, হাসলেন। আমরাও মনের পাখা মেলে হেসে নেচে বেড়াতে লাগলাম। একতলায় হলে নানা গল্প গান মজলিস হতে লাগল। শৈলজাবাবু সিলেটি ভাষায় গল্প বলে মাতিয়ে রাখলেন। নাচের শিক্ষক তাঁর যুবক পুত্রের জন্য 'গোরুর দুধ গোরুর দুধ' বলে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নাচে ছেলে — দুধ না খেলে ছেলের দেহ ভেঙে পড়বে। দুধ এখানে দুষ্প্রাপ্য। নন্দদা বললেন, দাঁড়াও, আমি ব্যবস্থা করছি। বলে, শিক্ষকমশায়ের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন, গল্পের মাঝেই বললেন, এখানকার লোকের স্বাস্থ্য ভালো হবে না তো কি? সব তো হাতির দুধ এখানে?

শিক্ষকমশায় চমকে উঠলেন, বললেন, হস্তীদুগ্ধ?

এর পর সিলোনে বাকি পথ আর তিনি বলেন নি পুত্রের জন্য দুধের কথা।

কলাভবনের শিল্পীদের আঁকা ছবিও আনা হয়েছে এইসঙ্গে। স্থানে স্থানে এই ছবির একজিবিশন হয়েছে, লোকেরা আগ্রহ নিয়ে দেখেছে, কাগজে প্রশংসা করেছে।

কলম্বোতে যে প্রদর্শনী হয়েছিল তাতে প্রেস-রিপোর্টাররা এসে অনেক ফোটো নিল। আমার আঁকা কলসি-কাঁখে সাঁওতাল মেয়ে— সিল্কের উপরে— বড়ো ছবি, তার ফোটো নেবে শিল্পীসমেত, খুঁজছে শিল্পীকে। আমি তখন নেই সেখানে, আমাদেরই একজনকে ধরে এনে ছবির সামনে দাঁড় করিয়ে ফোটো তোলা হল ; কাগজে ছাপালো 'শিল্পী ও তার ছবি'। এই ছবিটা দেখলেই আমার স্বামী চটে উঠতেন। ছেলেরাও মজা পেয়ে গেল। বারে বারে স্বামীর দৃষ্টিপথে খবরের কাগজের কাটিংটা টানিয়ে রাখত।

মহা আনন্দে পানাদুরার দিনগুলি কেটে গেল।

জাফনায় দক্ষিণ-ভারতীয়দের বসবাস বেশি। জাফনায় আন্-কাট রুবির গহনার ছড়াছড়ি। দোকানে দোকানে পুরাতন গহনা বিক্রি হয় অতি সস্তা দরে। মেয়েরা অনেকে কিনল গহনা। জাফনায় গুরুদেব বৃক্ষরোপণ করলেন ওখানকার কালেক-টারের আঙিনায়।

সিলোন থেকে ফিরলাম আমরা স্থলপথে, দক্ষিণ ভারতের নানা মন্দির দেখে দেখে।

পকেটের নোটবুকে পাই-পয়সার হিসাব রাখতেন সুরেনদা। একটা পয়সার কোনো কিছু তাঁর কাছ থেকে আদায় করা ছিল দুরূহ ব্যাপার। ট্রেনে চলেছি, গরম, তখন এক বোতল লেমনেডের দাম ছিল ছয় পয়সা। হাজার কাকুতি করেও সুরেনদার কাছ হতে আমরা মেয়েরা এক বোতল লেমনেড আদায় করতে পারি নি। যেন ছিনিয়ে নেবে কেউ— এই ভয়ে ডান হাত দিয়ে বুকপকেট চেপে ধরতেন— হেসে বলতেন, আচ্ছা পরের স্টেশনে দেব'খন কিনে। পরের স্টেশনও পার হয়ে যেত— লেমনেড আর খাওয়া হত না।

১১

বটতলা বলতে আশ্রমের মোড়ে ঐ বটটিকেই জানি। এই বটতলার ধারে কবে কোন্ কালে পুকুর খোঁড়া হয়েছিল জলের আশায়, জল পাওয়া যায় নি, তাই শুকনো ক্ষতটাও আর ভরে উঠতে পারে নি। তবু নামটা আছে পার ধরে ধরে 'পুকুর পার'। এই পুকুর পারের একদিকে ছিল লম্বা একটা খড়ের দোচালার নীচে একসারি ছোটো ছোটো মাটির ঘর। এরই একটা ঘরে থাকত সোনাবেন তার

বুড়ি মাকে নিয়ে। বালবিধবা সোনাবেন, মা ছাড়া আর কেউ নেই সংসারে। গুজরাটি। সোনাবেন এসে কলাভবনে ভর্তি হলেন। প্রায়ই যাই তাদের ঘরে। বুড়ি মা রান্না করেন, রুটি ভাত আর ঘোলের কাঢ়ি— এ রোজই হয়, উপরি হয় একটু সবজি। সবই পরিমাণে এত কম, আদর করে খাওয়ান যখন মনে ভয় হয়, এই রে, সবই বুঝি খেয়ে ফেললাম। ভাতের পরিমাণ দেখে ভাবনা হয়— এইটুকু ভাত একটি শিশুই খেয়ে নিতে পারে। দেখে দেখে পরে বুঝেছি ভাত এরা কমই খান, সব-কিছু খাবার পরে একটু ভাত আর কাঢ়ি দিয়ে খাওয়া শেষ করেন।

মণিভাই প্যাটেলের বাড়িতেও দেখেছি ভাত কম খান, তবে শৌখিন চালের ভাত খান। কমলাবেন প্রায়ই আমাদের নিমন্ত্রণ করত। দেরাদুন চালের লম্বা লম্বা ভাতগুলি দেখতে যত সুন্দর— খেতেও তত সুস্বাদু। একবার ভাবলাম আমরাও এই চাল কিনি কিছু। মণিভাই বাইরে থেকে আনাতেন চাল, বললাম আমাদের জন্যও আনিয়ে দেবেন। বললেন, দাম বারোটাকা মণ। শুনে দমে গেলাম। আর ঐ চাল খাবার আগ্রহ রইল না। আমাদের তো আর মুঠো মেপে চাল রান্না করলে চলবে না।

কমলা-মণিভাই দুজনেই এখানকার ছাত্রছাত্রী ছিলেন। মণিভাই তখন বিদ্যাভবনে, বিয়ে ঠিক হল, কমলাও এল ছাত্রী হয়ে। ছোটো ফুটফুটে মেয়েটি, যেমন কচি তেমনি সুন্দরী, তেমনি তার গায়ের গৌরবর্ণ। সকলেই তাকে ভালোবাসত। দিনদা, অধ্যাপকরা কমলাকে পথেঘাটে দেখতে পেলেই বিয়ে নিয়ে ঠাট্টা করতেন, আর কমলা লজ্জায় মরে যেত। বিয়ের পর বহুদিন ওরা ছিল আশ্রমে। এই কমলার কাছেই প্রথম খেয়েছি— ভাতের থালায় অন্য সব ডাল-তরকারির বাটির সঙ্গে দিয়েছিল একবাটি আমগোলা— আধপোয়াটাক গরম ঘি ঢালা তাতে। বললে, এ খুব ভালো লাগে, আমরা খুব পছন্দ করি আম এভাবে খেতে।

এত ঘি আর লেংড়া আমের মতো আমের এই গোলা ক্বাথ— দেখে মায়া লাগল আমটার জন্য। কি করি, দিয়েছে যখন আদর করে, খেতেই হল ; খেলাম —ঐ পর্যন্ত। স্বাদ কিছু বুঝলাম না। পরে অবশ্য বোম্বেতে গুজরাটে এদিকে-ওদিকে এ অভিজ্ঞতা আরো হয়েছে— প্রতিবারই খেতে হয় খাচ্ছি— এই ভাব নিয়ে খেয়েছি।

গুরুদেব শুনে বলেছিলেন, মাদ্রাজে পিঠাপুরমের রাজার অতিথি হয়ে আছি, খাবার সময়ে রাজা এসে বসতেন কাছে। আমাকে সেরা আম খাওয়াবেন— গোল

গোল বেশ বড়ো বড়ো আম, ওখানকার নামকরা আম— রাজা সেগুলি নিজের হাতে নিয়ে টিপে টিপে নরম গলগলে করে দিত। বলত, এবারে খোসায় ফুটো করে চুষে খান। আমি তাঁকে বুঝিয়ে উঠতে পারতাম না, যে, আমটা থাকুক, আমি কেটে কেটেই খাব। গুরুদেব হাসতেন, বলতেন, ভালো ভালো আমগুলি নষ্টই হত।

ফলের মধ্যে দেখেছি গুরুদেব আমটা খেতে খুব ভালোবাসতেন। এই-একটা ফল খুব আগ্রহ নিয়ে খেতেন। গোটা-কয় আম সাজিয়ে দেওয়া হত টেবিলে, গুরুদেব নিজে কেটে নিতেন। দু-তিন রকম করে কাটা আমাকে শিখিয়েছেনও। ছুরি চালিয়ে এক রকম করে কাটতেন— শুধু আঁটিটুকু থাকত, দুদিক থেকে দুভাগ আম খোসাসমেত সবটা দুটো বাটির মতো কাটা হয়ে যেত। গুরুদেব চামচ দিয়ে আমটা তা হতে তুলে তুলে খেতেন। কোনো রস গড়িয়ে পড়ত না, হাতে আঙুলে লাগত না।

বটতলার তলা দিয়ে পুকুর ধার ঘেঁষে সরু পায়ে-চলা পথ— শর্টকাট করতে এই পথে যাওয়া-আসা করি। পথের মোড়েই বড়ো চৌচালা একটি মাটির বাড়ি, এটা ছিল আগে হাসপাতাল। নতুন হাসপাতাল হবার পরও এই বাড়ির এই নাম থেকে যায়, বলি পুরোনো হাসপাতাল। এই পুরোনো হাসপাতালে তখন থাকে কলাভবনের ছাত্র কয়েকজন। আলাদা করে বা বিশেষভাবে তৈরি করা কোনো ডরমিটরি ছিল না ছাত্রদের জন্য। এ বাড়িতে ও বাড়িতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকত তারা। রামকিঙ্করবাবু নিশিকান্ত আরো কয়েকজন থাকতেন তখন এ বাড়িতে। নিশিকান্তর বরাবরের ঝোঁক ছিল, রান্নাঘরের প্রতি। নিজেই বসে রান্না করত। আমরা যেতে-আসতে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে যেতাম। নিশিকান্তর দৃষ্টিপথে বেশিক্ষণ থাকতাম না। সে-সময়ে সে 'চুট্‌কি' কবিতা লিখতে শুরু করেছিল, যে-কোনো মেয়ে নজরে পড়ত তার নামেই কবিতা লিখত; ভালোও লিখত, ঠারেঠোরেও লিখত। কাজেই ভয়েই থাকতাম। তবু রেহাই পাই নি, অন্য ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠেছে, ও রানী তোমার পেঁয়াজ রঙের শাড়ির কবিতা হয়ে গেছে। নিশিকান্তর কবিতার উপর ছেলেরা হুমড়ি খেয়ে পড়ত— কী কী লেখা হল, কাকে কাকে নিয়ে লেখা হল।

এই ছাত্র-কয়টি নিজেরা রান্না করে খায়। নন্দদা একদিন দেখতে এলেন। এ-সব কথা আমার বিয়ের আগের ঘটনা। শর্টকাট করে বাড়ি ফিরছি, নন্দদাকে দেখে

রান্নাঘরের দোরে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছেলেরা সবাই খুব ব্যস্ত, আজ ভালোমন্দ খাওয়া হবে, নন্দদার সুপারভিশনে রান্না হবে। ছুটোছুটি ব্যস্ত-সমস্ত ভাব সকলের। নন্দদাও খাবেন এখানে। নন্দদা পিঁড়ি পেতে বসে একটা লাউ নিয়ে কাটবার চেষ্টা করছেন আর হাসছেন। সকলের ভাব দেখে মনে হল বিয়েবাড়ির ভোজ হবে আজ।

বিকেলবেলা সে পথ দিয়ে কলাভবনে যাবার বেলা আবার গিয়ে দাঁড়ালাম পুরোনো হাসপাতালের আঙিনায়। কী রান্না হল? কী খাওয়া হল সবার?

নিশিকান্ত বললে, ও ভাই, আজ যা খেয়েছি— অনেকগুলি পদ হল তো? এখনো আইঢাই করছি। লাউ দিয়েই সব রান্না হল— চার রকমের। এক রকম রান্না হল আদা-গন্ধ, আর-এক রকম 'পেঁয়াজ গন্ধ', আর-এক পদ 'হলুদ-গন্ধ', আর-একটা তরকারি হল 'জিরে-গন্ধ'। চার রকম তরকারি দিয়ে আমরা আজ ভাত খেয়েছি।

পরে শুনলাম, রান্নার জন্য ভাঁড়ারে সেদিন থাকবার মধ্যে ছিল শুধু একটা লাউ। ঐ লাউ দিয়েই কত রকম রান্না করা যায়— নন্দদা ছেলেদের নিয়ে তারই এক্‌সপেরিমেণ্ট করলেন। নানান আকারে লাউ কাটা হল, এক-একটাতে এক-একটা মসলা দেওয়া হচ্ছে আর সেই নামেই তরকারিটা অভিহিত হচ্ছে। হলুদগন্ধ তো—তাতে হলুদই দেওয়া হয়েছে— আর-কিছু নয়। রঙ আর গন্ধ দিয়েই একটা লাউ হতে রকমারি রান্না হয়েছে।

হাসি হাসি মুখে নন্দদা বললেন, খেতে তো পেলে না, নইলে দেখতে— রান্নাতে আজ তোমাদের হার মানতে হত।

নিশিকান্তকে গুরুদেব খুব স্নেহ করতেন। নিশিকান্ত তখন থেকেই খুব কবিতা লিখত। গুরুদেব খুশি হতেন তার কবিতা পড়ে। খেতে খুবই ভালোবাসত নিশিকান্ত। দেখতাম, গুরুদেব প্রায়ই খাওয়াতেন তাকে। ভালো কিছু রান্না হলে গুরুদেব নিশিকান্তকে খবর পাঠাতেন, নিশিকান্ত হেলতে দুলতে আসত। উত্তরায়ণের গেট দিয়ে ঢোকার ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারতাম আজ নিশিকান্ত খেতে আসছে— খাবার জন্য ডাক পড়েছে তার। খুব খেতে পারত সে, তিন দিনের খাবার একসঙ্গে খেয়ে নেবার ক্ষমতা ছিল। খেয়ে তার পর পড়ে একটানা ঘুম লাগাত। ঠেলেঠুলে সঙ্গীরা তাকে তুলত ঘুম থেকে। নিশিকান্তর ছবি আঁকাতেও ছিল একটু নতুনত্বের ছাপ। নন্দদা তাকে ছেড়ে দিতেন, তার নিজের পথে চলতে

দিতেন, অথচ সর্বদা নজর রাখতেন। বলতেন, আঁকুক ও ওর নিজের মতো করে, এখন হাত দেব না ওতে।

নাদুস-নুদুস নিশিকান্ত— গাল-দুটি ছিল ফোলা-ফোলা, একটু ভুঁড়িও ছিল। আর ঠোঁট থাকত সব সময়ে খোলা, কথা বলবার সময়ও ঠোঁটে ঠোঁট লাগত না। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে শব্দ উচ্চারণ করত, তাই তার কথা বলার ভঙ্গি, চলার কায়দা— সবেতেই বেশ-একটা আদুরে-আদুরে ভাব ছিল।

ছড়া বানাতে নিশিকান্তর জুড়ি ছিল না, কথায় কথায় ছড়া, তার ছড়া দিয়ে ছাত্রদের বিভাগে বিভাগে কত সাহিত্যসভা জমে উঠত। আশ্রমের এখানে-ওখানে যখন-তখন দল জমে যেত, কাছে গিয়ে দেখতাম নিশিকান্ত কবিগানের মূল গায়েনের মতো পেটের নীচে চাদর জড়িয়ে বেঁধে দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হেলেদুলে ছড়া গাইছে, আর অন্যরা দোহারকি দিচ্ছে। পুজোর ছুটির আগে প্রতি বছর 'আনন্দমেলা' হয় শালবীথিতে। ছেলেমেয়েরা নানান খাবারের দোকান দেয়, নানান কৌতুকের আয়োজন করে, প্রদর্শনী খোলে। চার পয়সায় চার লাইন কবিতা সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিয়ে, অমিতাভ এই রকম কবিতার দোকান প্রথম খুলল একবার আনন্দমেলায় ওদের কালে। অর্থাৎ নানা রকম ভাবে আনন্দ বিতরণ হয় এই মেলায়। টাকা-পয়সা যা ওঠে সব-কিছুর লাভের অংশ জমা দেওয়া হয় অফিসে, 'পুওর ফণ্ডে'।

এই আনন্দমেলায় সেবার নিশিকান্ত এক প্রসেশনেই মাৎ করে ফেলল। সে আমলে কোথাও বন্যা দুর্ভিক্ষ হলে শহরে গঞ্জে পথে পথে হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে গান করে করে ছেলের দল বের হত চাঁদা তুলতে, চারজন ধরে থাকত একটা সাদা চাদরের চার-কোনা, যার যা দান সেই চাদরে ছুঁড়ে দেয়— কেউ দেয় পথে দাঁড়িয়ে, কেউ দেয় দোতলা-তেতলা হতে। তেমনিতরো একবার আনন্দমেলায় দেখি গান গাইতে গাইতে মস্ত একটা দল শালবীথিতে এগিয়ে এল। আগে আগে নিশিকান্ত, পিছনে ছেলেরা। নিশিকান্ত গাইছে 'জানো না জানো না— এ বইল্যে জানাই শোনো না—। কি শোনাবে নিশিকান্ত।' গুরুপল্লীর গুরুদের নিয়ে গান বেঁধেছে নিশিকান্ত। গুরুপল্লীতে এক সারি মাটির বাড়ি, গুরুরা থাকেন, প্রথম বাড়িখানায় থাকেন নন্দদা, ঐ একটিমাত্র মাটির দোতলা বাড়ি— আরগুলি সব চৌচালা। নন্দদার বাড়ি ধরে শুরু হল গান। নিশিকান্ত গাইল, 'মাস্টারমশাইয়ের দোতলা বাড়ি···, পিছু বাগে গিয়ে দেখ রামচেঁড়সের বাগানখানা'। সেবার সুধীরা

বৌদি ঢেঁড়স ফলিয়েছিলেন মস্ত মস্ত। তার পর— পর পর বাবুক্ষিতি, বাবুসত্য, বাবুনেপাল— কেউ বাদ পড়েন নি। এক-একজনের নামে গান হয় আর সকলে ধুয়ো ধরে 'জানো না জানো না, বইল্যো জানাই শোনো না।' শেষ বাড়িখানা ছিল লাবণ্যদির। নিশিকান্ত গাইল— 'তার পরেতে দিদি লাবণ্য, বাড়িটি তাঁর অতি জঘন্য, কোনায় কোনায় নতুন করলেন— ভাড়া দেবার বাসনা— জানো না, জানো না— ।'

এক-একজনের নামে গান হচ্ছে আর সকলের হাসিতে সে জায়গার হাওয়াটা যেন ফেটে চৌচির হচ্ছে। জমজমাট গান। সহজ কৌতুকে ভরা গান। যাঁদের নামে গান— তাঁরা কেউ কিছু মনে করলেন না। বরং ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে শুনলেন, হাসলেন। এ গান এতকাল পরেও মুখে মুখে চলে এসেছে। গুরুদেবকেও শোনানো হয়েছিল এ গান। এই গান শোনাবার জন্যই সিংহসদনে এক সাহিত্য-সভার আয়োজন করা হল। গুরুদেব এলেন। নিশিকান্ত দলবল নিয়ে মনের আনন্দে নেচে দুলে গানটা গাইল। গুরুদেব হাসিমুখে শুনলেন।

আমাদের যে-কোনো কৌতুক আমোদ তাঁকে আড়াল করে হত না।

কী যে হল নিশিকান্তর, তেইশ বছর বয়সে সে একদিন পণ্ডিচেরি চলে গেল। গুরুদেব চেষ্টা করেছিলেন আটকাতে— পারেন নি। পণ্ডিচেরি থেকে আর নিশিকান্ত বাইরে আসে নি। চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর বাদে আমি একবার গেলাম পণ্ডিচেরিতে আমার বিরানব্বই বছরের দাদাজী দোরাই স্বামীকে দেখতে। তাঁর কাছেই ছিলাম, আমাকে অতিশয় স্নেহ করেন। দাদাজী বললেন, তোমাদের জানাশোনা শান্তিনিকেতনের অনেকেই তো আছে এখানে, কার কার সঙ্গে দেখা করতে চাও বলো, খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। বললাম, সব সময়টুকু আপনার কাছেই থাকব বলে এসেছি, শুধু নিশিকান্তকে একবার দেখে যেতে ইচ্ছে করছে।

দাদাজী খবর পাঠালেন, খবর এল সে হাসপাতালে ছিল কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না তাকে। বাড়িতেও নেই। খবর নিতে যাঁরা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন সকলেই হাসি-হাসি মুখে ঐ একই খবর নিয়ে এলেন। নিশিকান্তকে নিয়ে সকলেরই এক উতলা ভাবনা, এক গভীর ভালোবাসা। নিশিকান্তর দেহ-ভরা রোগ, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু রাখা যায় না, কোথায় কোথায় বেরিয়ে পড়ে। কী রোগ নেই তার? টি. বি., প্রেসার, উদরী, ডায়াবেটিস— লিভার কিডনির শেষ দশা; আরো কত কী। নিশিকান্ত হাঁটতেও পারে না ঠিকমত।

দাদাজী খবর করছেন, আশ্রমের লোকেরা চারি দিকে খুঁজছে নিশিকান্তকে খবর পেয়ে পরদিন নিজেই এল সে দাদাজীর বাড়িতে। ঠিক সেই চেহারা, একটু ফুলেছে শুধু, আর হাতে লাঠি। সেই লাঠি ঠক্‌ঠক্ করে চার আঙুল তফাত পদক্ষেপ ফেলে নিশিকান্ত সারা আশ্রম— আশ্রমের বাইরে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। এতকাল পরে দেখা, মনেই হল না যে, মাঝখানে এতগুলি বছর পার হয়ে গেছে। এত রোগ নিয়ে এ মানুষ হাসছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে— এমন-কি বেঁচে আছে কী করে, এই ভেবে কূল পায় না লোকে।

নিশিকান্ত অনেকক্ষণ বসে রইল, আশ্রমের গল্পই হল— সেই সে-সমস্ত পুরোনো দিনের কথা। যে-কয়দিন ছিলাম পণ্ডিচেরিতে রোজ আসত নিশিকান্ত। একদিন বলল, বাঙালির মেয়ে, কাল এসে একটু মাছ ভাত খাও আমার বাড়িতে। বোন রান্না করবে। বললাম, খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা কেন, এমনিই যাব। বিকেলের দিকে মনটা কেমন লাগল, এমন আন্তরিক ডাক— তাড়াতাড়ি খবর পাঠালাম কাল যাব খেতে।

আশ্রম থেকে দেওয়া বেশ সুখ-সুবিধের বাড়ি, বড়ো বড়ো ঘর, সামনে বাগান। এক খুড়তুতো বোন আছেন এখানে, নিশিকান্তর খাওয়া-দাওয়া দেখাশোনা করেন। নাতিও আছে বোনের একটি— সে এখানে পড়ে। গোটা বাড়িটাই নিশিকান্ত এদের ছেড়ে দিয়েছে। বারান্দার এক পাশে— চারহাত ছয়হাত সরু একফালি জায়গা নিয়ে সে আছে। প্রায় বেঞ্চির মতো উঁচু একটা তক্তা পাতা— শুলে পাশ ফেরাফেরি করা যায় না, পুরোটায় রবার ক্লথ পাতা, সেটাই তার বিছানা। দেখে মনে ইচ্ছে জাগল এই মাপের একটা শীতল পাটি ফরমাস দিয়ে বানিয়ে পাঠাব, আর তার সময় পাওয়া যায় নি।

নিশিকান্ত বলল, জানো ভাই, এই অয়েল ক্লথের বিছানাই ভালো, ধুলো ময়লা হাত দিয়েই ঝেড়ে ফেলা যায়।

সরু খাটটার মাথার দিকে পায়ের দিকে ও পাশটায় নানা আকারের খুপরি-খাপরি দেওয়া সস্তা কাঠের শেল্‌ফ। নিশিকান্ত হাত বাড়িয়ে বলে, এই দেখো, এই এক জায়গায় বসে আমি সব-কিছু হাতের নাগালে পাই। এইখানে থাকে আমার ছবি রঙ তুলি কাগজ, এই আমার লেখার তাক, এই ওষুধপত্র। একটা গোল টিন হাতে তুলে বলে, এই দেখো, এতে থাকে আমার পাঁউরুটি। ভাগনি এসেছিল —সে এর গায়ে তেল মাখিয়ে দিল, বললে পিঁপড়ে উঠতে পারবে না গা বেয়ে।

এইটুকু জায়গার মধ্যে নিশিকান্তর প্রয়োজনীয় সর্বস্ব। খাটের এ দিকটায়— যে দিকে সে কোনো রকমে খাটে ওঠে— খাবার টেবিল। পাশে চেয়ার-কমোড। নিশিকান্তর এমন অবস্থা হয় থেকে থেকে, উঠে গা-লাগা বাথরুমে যাবারও শক্তি থাকে না। এত স্বল্পপরিসর স্থান নিজের জন্য কেন যে বেছে নিয়েছে— সেই জানে। নিশিকান্ত ছাড়া সেই ঘরে ঢুকে বসে গল্প করে কেউ, এমন স্থান অকুলান। অথচ অন্য ঘরগুলি কত বড়ো আর কত খোলামেলা। সামনে বড়ো আঙিনা, আঙিনায় প্রকাণ্ড একটা বকুল গাছ ঘন সবুজ পাতায় ঠাসা। তলায় কালো ছায়া।

সেদিন অনেক গল্প হল নিশিকান্তর সঙ্গে। তার নিজের গল্প— নিজের অভিজ্ঞতার নানা গল্প। খাবার সময়ে সামনে বসে রইলাম— রুগীর পথ্য, সামান্যই খেল।

পণ্ডিচেরি থেকে চলে আসবার আগের দিন বিকেলে এল নিশিকান্ত। এ-কয়দিন রোজই এসেছে, গল্প করেছে, এখানে-ওখানে নিয়ে যেতে চেয়েছে— কোথায় কী কী কাজ করেছে দেখাতে চেয়েছে। কাছাকাছি দু-একটা জায়গায় গিয়েছি তার সঙ্গে, তার উৎসাহে বাধা দিতে পারি নি। শেষ বিকেলে সে যখন বিদায় নিল, যাবার সময়ে তাকে পথে খানিকটা এগিয়ে দিলাম। নিশিকান্ত বললে, আমাকে এই ফুটপাথ হতে ঐ ফুটপাথে তুলে দাও। হাত ধরে তাকে রাস্তা পার করে ঐ ফুটপাথে তুলে দিলাম। নিশিকান্ত দাঁড়াল। মনে মনে কেবলই মনে হচ্ছে আর হয়তো দেখা হবে না নিশিকান্তর সঙ্গে। বিদায়-মুহূর্ত বড়োই বিষণ্ণ।

নিশিকান্ত বলল, আবার এসো। হয়তো আমি থাকব না। এসো। অমাবস্যার গভীর রাত্রে আমার বাড়ির আঙিনায় বকুল গাছের তলায় একা এসে দাঁড়িয়ো।

সুরটা হালকা করে তুলতে জোর করে হাসলাম, বললাম, হ্যাঁ আসি, আর তুমি ঐ অন্ধকার রাত্রে আমাকে ভয় দেখাও।

নিশিকান্ত ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়ল— তার চিরকালের অভ্যেসমত আধখোলা মুখে দাঁতে দাঁত ঠেকিয়ে অস্ফুটস্বরে বললে, না, না, ভয় দেখাব না, ভয় দেখাব না— বকুল ঝরাব।

নিশিকান্ত লাঠি ঠুকে ঠুকে চার আঙুল দূরত্বে পদক্ষেপ ফেলে ফুটপাথ ধরে চলতে লাগল।

সেই নিশিকান্তও আজ নেই। কত জন যে চলে গেল। যাকে ধরতে যাই— সে-ই দেখি চলে গেছে। এত দেরিতে আজ তাদের নিয়ে মনের মহলে সভা

ডেকেছি— বক্তার স্থানে দেখি শুধু আমিই দাঁড়িয়ে আছি। যাঁর উপর ছিল আমার সকল নির্ভর— যাঁর কাছে জমা ছিল আমার সকল ভাণ্ডার— সেই স্বামীও আজ পাশে নেই সভা সরস করে তুলতে। একা আমি কেমন করে সভার কাজ চালাই শেষ পর্যন্ত! পারব কি?

১২

মানুষ আর কত খেলা জানে?

প্রকৃতির খেলার অন্ত দেখি না— এই আশ্রমের মাটিতে, আকাশে। গাছের তলায় শুকনো পাতার ভিড় জমে থাকে, কালবৈশাখীর হাওয়া ছুটে আসে, শুকনো পাতার দল ছোটে তার সঙ্গে। কে আগে যাবে— হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। দু-চারটে ঘূর্ণি হাওয়া আবার তাদের নিয়ে উপরে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পাতাগুলি দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে।

দিনে দিনে দেখি খেলা। হঠাৎ চমকে উঠি— শিরীষ গাছগুলির মাথায় যেন হালকা সবুজের তুষার পড়ে আছে। এই তো দেখলাম একটি-দুটি ফুল ফুটতে আরম্ভ করেছে, পলক ফেলতে-না-ফেলতে গাছ ছাপিয়ে তারা ফুটে উঠল সকলে? নন্দদা বলতেন, এরা ঠিক সময়েই আসে, এদের সময়ের ব্যতিক্রম হয় না। মানুষ পারে না এদের সঙ্গে, মানুষ প্রস্তুত হতে হতেই সময় পার করে ফেলে।

শিরীষ কুরচি কাঞ্চন গুলঞ্চ — এরা আগেও ছিল তবে সংখ্যায় এখন বেশি। পাতাঝরা গুলঞ্চের গাছে গাছে ফুলের বাহার উপচে উঠছে, লাল কাঁকরের উপর ছড়িয়ে পড়েছে কত। কাঠ-টগর— অবহেলা করে একে অন্যত্র — এর সৌরভ নেই বলে; আমাদের এখানে এর কত আদর। কী শুভ্র এর রঙ। গুরুদেব একবার বলেছিলেন, এ'কে কাঠ-টগর না বলে বলা উচিত, 'মহাশ্বেতা'। এই টগর যখন ফুটে থাকে গাছে, যখন তলার সবুজ ঘাসের উপর বিছিয়ে থাকে শুভ্র তারাগুলি— কী সুন্দর, কী সুন্দর।

সেবার বসন্তোৎসবে আম বাগানে সাদা মাটি দিয়ে লেপা জায়গার এক ধারে বেদী— বেদী ঘিরে আলপনা দেওয়া হয়েছে আগের দিন বিকেলে। সাদা মাটির আঙিনার উপরে আলপনার শুভ্রতা— যেন হেসে হেসে উঠছে। নন্দদা খুব খুশি দেখে। ভোরে আবার এসেছেন— উৎসব শুরু হবার আগে বেদীর উপরে আসন

বিছোতে— গুরুদেব বসবেন তাতে। দেখি আলপনা, আঙিনা, বেদী ছেয়ে হলুদ রঙের পাকা আমপাতা পড়ে আছে এক রাশি। রাত্রে হাওয়া দিয়েছিল জোরে কয়েকবার।

পাকা পাতাগুলি তুলে ফেলতে যাব, নন্দদা বললেন, থাক্ থাক্, তুলো না। এও যে এই উৎসবের অঙ্গ, আলপনার বাহার। এমনিই থাক্।

সেদিন দেখলাম উল্টেপাল্টে পড়া পাকা পাতার কী সৌন্দর্য! তার পর থেকে আশায় থাকতাম— উৎসবের আলপনার উপরে গাছ মুকুল ঝরাক, পাতা ছড়াক; তারাও হাত লাগাক।

শুধু কি মানুষই উৎসব করে? মানুষ কতটুকু করে? গাছ ডালভরা ফুল দেয়, নব কিশলয় দেয়, নানা সুরভি ঢেলে মানুষের মন নাড়া দেয়— তবে তো মানুষ সামগ্রী সংগ্রহ ক'রে উৎসব করতে বসে।

লোকে বলে শান্তিনিকেতন আর আগের শান্তিনিকেতন নেই, বদলে গেছে। মানুষ যা করে তা বদলায়। কিন্তু যখন পশ্চিম আকাশ আবীরে মাখামাখি হয়, মেঘের ধারে ধারে আলো সোনা দিয়ে রেখা আঁকে, বৃষ্টিতে ভেজা লাল কাঁকর যখন সে-আলোয় খিলখিল হাসে; সেই মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে মনের দেহ কতবার রাঙিয়ে তুলেছি— এখনো তুলি। এর তো আর বদল হয় না কখনো।

আকন্দের ছড়াছড়ি এখানে। অনাদরের গাছ, যেখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে ফুল নিয়ে। আশ্রমে যখন ফুলের অভাব ঘটে, প্রখর রৌদ্রের তাপে সব যায় শুকিয়ে— উৎসব-অনুষ্ঠান হবে, মালার দরকার, তখন এই আকন্দই একমাত্র ভরসা। হালকা বেগুনি রঙের 'ডেকোরেটিভ' ফুল, এ ফুল যেন তৈরি হয়েই আছে মালায় গাঁথার জন্য। একে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতে হয় না, সুতোয় গাঁথলেই হল। এমন সুন্দর মালা আর-কোনো ফুলে হয় না বড়ো।

সুধীরা বৌদি এই আকন্দ ফুল দিয়ে অতি সুন্দর ফুলের গহনা তৈরি করতেন। ফুলশয্যার রাতে কনেবউ তাঁর তৈরি ফুলের গহনা দিয়েই সাজত এখানে বরাবর। দিদির ফুলশয্যায় সুধীরা বৌদি আকন্দের যে গহনা বানিয়ে দিয়েছিলেন, দিদি পরে তা কাগজের পাটে পাটে যত্নে তুলে রেখে দিয়েছেন। সে আজ পঞ্চাশ বছর আগের কথা।

আশ্রমের মেয়েদের নিত্যকার সাজও ছিল আশ্রমের ফুল দিয়েই। বাবলা ফুল রঙ্গন ফুল কানে দিয়ে কানপাশা তুচ্ছ করেছি। পদ্ম ফুলের ভিতরের ঝালর দেওয়া

হলুদ বীজটা ঢেঁড়ি ঝুমকোর মতো ঝুলত দু কানে। কেয়ার পাপড়ি পাট করে নন্দদা একদিন দিলেন যমুনাকে খোঁপায় পরতে। কালো চুলে দেখালো যেন হাতির দাঁতের গহনাটি। ঘাসের বালা, বীজের মালা— আমাদের অভাব ছিল কিসের? সে-সব দিন মনে পড়ে আজও, যেন এই বয়সে মনে মনে শালফুলের গুচ্ছ খোঁপায় গুঁজে নেচে নেচে ঘুরে বেড়াই আশ্রমে।

বলি— এই তো এখানে এই শালবীথির তলায়ই তো ছিল সেই লম্বা দোচালা ঘর— সেই প্রথমবার এসে দেখেছিলাম— সেই যখন ছাত্ররা ব্রহ্মচারীর মতো জীবন যাপন করত— মাটির লম্বা বেদীর উপরে মাটির বালিশ মাথায় দিয়ে শুত। দিনেরাত্রে পেতে-রাখা মাটির সে বিছানা ছিল এই বাড়িতে। তার চালে ঝরে পড়ত শালফুলের পাপড়ি— তলায় বিছানো থাকত পাপড়ি কার্পেট। বাতাসে গুঞ্জন ছড়াত ভোমরা-মৌমাছি।

শালবীথির এদিকে ছিল আর-একটা লম্বা দোচালা, সেও আর নেই। আছে সেই মাধবীলতা-বেয়ে-ওঠা গেট। আদি বাড়ি গেস্ট হাউস দিয়ে এই গেটের ভিতর দিয়ে সোজা পথ ধরে পৌঁছে যেতাম গুরুপল্লীতে। নেপাল রোডের কোনায় সেই শিমুল গাছ— রক্তরঙের শিমুল নয়— গেরুয়া রঙের শিমুল ধরে এই গাছে। এই শিমুল গাছের গোড়ায় ছিল একটি কুটির— এক সময়ের সংগীতভবন।

নেপাল রোডের পাশে চীনভবন উঠল, মনে হয় এই সেদিনের কথা। প্রফেসর তান সাহেব এলেন ভারতের সঙ্গে চীনের চিরন্তন বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করতে। আর নিজেকে উৎসর্গ করবেন গুরুদেবের কাজে তাঁর আদর্শে।

প্রথমে প্রফেসর তান একাই এসেছিলেন, পরে মাদাম তানকেও নিয়ে এলেন; সঙ্গে দুটি শিশুসন্তান— পুত্র তান্‌লি, কন্যা তানওয়েন। বড়ো মেজো দুটি পুত্রকে রেখে এলেন দেশে আত্মীয়দের কাছে।

চীন দেশ থেকেই টাকা তুললেন প্রফেসর, প্রাসাদতুল্য 'চীনভবন' গড়লেন। বই আনালেন চীন থেকে, বিরাট লাইব্রেরি হল। চীনভবনের বাগানে রাশি রাশি ফুল ফুটল। ঘরে ঘরে বৌদ্ধসন্ন্যাসীর বস্ত্রের উজ্জ্বল কমলা রঙে আলো ঝলমল করে উঠল। চীনে পণ্ডিত, চীনে শিল্পী, ছাত্র-শিক্ষকে বাড়ি ভরে গেল। ধীর গম্ভীর এক প্রাণ-সঞ্চারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল চীনভবন।

তখনকার দিনে উদয়নের পরেই ছিল বিরাট বাড়ি এই চীনভবন। চীনভবন আমাদের গর্ব। অতিথি-বন্ধু যাঁরা আসেন— সবাইকে নিয়ে আসি চীনভবনে।

সে সময়ে বিশ্বভারতীর অর্থসাচ্ছল্য ছিল না। প্রথম দিকে মাদাম তান শিক্ষকতা করে প্রফেসরের এখানকার খরচ চালাতেন। পরে যখন তিনিও চলে এলেন শান্তিনিকেতনে প্রফেসর তান নিজ দেশের কিছু-কিছু জমিজমা বিক্রি করে খরচ চালিয়েছেন বহু বছর। তার পর 'রেড্ চায়না' হল— প্রফেসরের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল— তখন বিশ্বভারতী হতে তাঁকে কিছু করে অর্থ দেওয়া হত; তাও বা কতটুকু? শুধু খরচটুকু চালাবার মতো।

চামেলির জন্ম চীনভবনে। প্রথম চীনে-কন্যা জন্ম নিল আশ্রমের মাটিতে।

বিদেশ বিভুঁই— মাদাম তান ভাষা জানেন না এদেশের। স্বামী-স্ত্রীর প্রাণে নানা আশঙ্কা। তাঁদের রীতিনীতি আলাদা, আমাদের আলাদা। শান্তিনিকেতনে তখন 'মেটারনিটি হোম' বলে কিছু ছিল না; ছিল না আশেপাশে ধাত্রী, লেডি ডাক্তার কেউ। আমাদের ঠান্দি— তাঁর দরদী অন্তর নিয়ে এই সংকটে এগিয়ে আসতেন আসন্ন-প্রসবা মায়ের পাশে। নিজের ইচ্ছেতেই এ জ্ঞান তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। ঠান্দি এখানে আসার পরে প্রায় সব শিশুরই জন্ম ঠান্দির হাতে। প্রফেসর তানের কাতর আহ্বানে ঠান্দি এসে দাঁড়ালেন মাদাম তানের পাশে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হল। সদ্যোজাত শিশুকে সর্বপ্রথম তুলে নিলাম আমার কোলে। অন্যরা রইলেন ব্যস্ত মাকে নিয়ে। একবারও মনে হয় নি বিদেশী বলে, মনে হয় নি ভাষা জানি নে কেউ কারো।

যেদিন মাতা-পিতা কন্যাকে নিয়ে দেখালেন গুরুদেবকে, গুরুদেব নাম রাখলেন তার 'চামেলি'। বললেন, চীনভবনের চামেলি। (শানমেই)

সেই চামেলি এখন দু সন্তানের জননী। তার চার বছর বয়সে একবার দেশে গিয়েছিল মা-বাবার সঙ্গে, সেই প্রথম ও এখনকার মতো শেষ চীনদেশে তার যাওয়া, সেখানে গিয়ে মেয়ে কান্নাকাটি করে অস্থির করে তুলল, আমাদের দেশে চলো, আমাদের বাড়িতে চলো। সেই সুর এখনো তার দেহে মনে। বড়ো বোন তানওয়েন আমেরিকায় গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল, সবাই চিন্তায় আছি, যে যখন খবর পাই একে অন্যকে জানাই। চামেলি আগে খবর পেল— লিখল, দিদি ভালো হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন। ভগবান আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন। এবারে ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরে এলেই নিশ্চিন্ত হই। ভারতবর্ষই আমাদের দেশ।

প্রফেসর তানের সাধনা সার্থক হয়েছে। তাঁর সন্তানরা ভারতীয় হয়েছে।

যে শিশুকন্যাকে নিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে করে, সেই তানওয়েন বিশ্বভারতীতে বাংলায় এম. এ.-তে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হল যেদিন গর্বে আমরা যেন উন্মাদ হয়ে উঠলাম। এ তো আমাদেরই মেয়ে। যেদিন দিল্লির ইন্দ্রপ্রস্থ কলেজে শিক্ষকতা নিয়ে গেল বাংলা পড়াতে, সুযশ তার ছড়িয়ে পড়ল। আনন্দে উদ্‌বেল হয়ে উঠলাম। আর যেদিন আমার স্বামী তানওয়েনকে নয়াদিল্লির প্রসিদ্ধ কালীবাড়িতে নিয়ে গেলেন— তানওয়েন বিরাট জন-সমক্ষে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দর্শন সম্বন্ধে বাংলায় বক্তৃতা দিল— মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে কথার পর কথা বলে গেল— সেদিন আত্মহারা দু চোখ আমার জলে ভরে গেল। এই তো আমাদের শান্তিনিকেতনের মেয়ে, আমাদের শান্তিনিকেতনের তৈরি সম্পদ। প্রফেসরের সন্তানরা সকল বিষয়ে গুণী— সাহিত্যে, রবীন্দ্রসংগীতে, ছবি আঁকায়, খেলাধুলায় সব সময়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, দ্বিতীয় হতে জানে নি। চামেলির পরে আরো দুটি ভাই— অজিত আর অর্জুন, তাদেরও জন্ম চীনভবনে।

তখনকার দিনের চীনদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পী জু্যঁ পিও এলেন শান্তিনিকেতনে। অনেকদিন ছিলেন। প্রফেসর তানের বন্ধু। থাকতেন চীনভবনেই, নামেই শুধু থাকতেন সেখানে; বেশির ভাগ সময় কাটাতেন আমাদের কাছে। প্রিয়দর্শন— প্রিয়ভাষী পুরুষ, সুমধুর ব্যবহার। প্যারিসে ছিলেন অনেকদিন, ফরাসী ভাষা জানেন— ইংরাজি নয়। আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর কথার আদানপ্রদান হয়, আমার সঙ্গে হয় হাসির বিনিময়।

জু্যঁ পিও ছবি আঁকেন, আমি দেখি। তাঁর টেকনিক দেখান বোঝান আমাকে। আমি ছবি আঁকি, জু্যঁ পিও বসে থাকেন পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বড়ো ছবি আঁকতে গেলে আমরা মেঝেতে ছবির কাগজ মাউণ্ট করে নিতাম। অত বড়ো বোর্ড— ইজেলের ব্যবস্থা ছিল না আমাদের। মেঝের উপরে বসেই ছবি আঁকতাম, জু্যঁ পিও মেঝেতেই বসতেন। আমরা করতাম টেম্পারা পেন্টিং; জু্যঁ পিও করতেন অয়েলে, আর কালি দিয়ে তুলির টানে। দেখে মনে হত— আমরাও বুঝি বা পারি এই রকম আঁকতে; কিন্তু ঐ একটি টান যে কতদিনের সাধনার ফল— তা তো জানি।

জু্যঁ পিও গাছ লতা ফুল মানুষ আকাশ— সব-কিছুই দু চোখ মেলে দেখতেন, কেবল দেখতেন। কত যে দেখতেন, তাঁর সেই দেখা দেখে ভাবতাম আমিও যদি তাঁর মতো করে দেখতে জানতাম। কোনার্কে আমাদের বাড়ির সামনে যে

শিমুল গাছ ছিল— অফুরন্ত ফুল ফুটত ; জুঁ্য পিও ভোর না হতে শিমুল গাছের তলায় এসে দাঁড়াতেন। 'আমরা সকালে উঠে দরজা খুলেই দেখতাম এ দৃশ্য। জুঁ্য পিও একটি-একটি করে শিমুল ফুল কুড়িয়ে বাঁ হাতে জমাতেন। বাঁ হাতের মুঠি ভরে যেত ঘন টুকটুকে লাল ফুলে। অনেকক্ষণ সেই ফুলগুলি ঐভাবে ধরে থাকতেন। দেখতেন। শেষে একসময়ে তলায় ছিটিয়ে দিয়ে ঘরে চলে আসতেন। আমরা একসঙ্গে প্রাতরাশ করতাম।

না-বলার মধ্যেই জুঁ্য পিওর সঙ্গে একটা যেন বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল— সকালে আর দুপুরে আমাদের সঙ্গেই খেয়ে নিতেন। এমন হল যে, পরে আর মনেই হত না— তিনি আমাদের পরিবারের একজন নন। সহজ-ভাবেই মিশে অতি সহজে আপনার হয়ে গিয়েছিলেন। কতদিন এমন হয়েছে— আমি কলাভবন থেকে এসেছি, এগারোটা বেজেছে, দুপুরের ছুটির ঘণ্টা পড়েছে, দেখি, ভিতরের ঘরে মেঝের উপরে বসে শিশু, অতিশিশু আমার অভিজিৎকে জুঁ্য পিও ছবি এঁকে এঁকে খেলা দিচ্ছেন। তুলির দরকার পড়ে নি, রঙের বাক্সয় একটু জল দিয়ে আঙুলে করে রঙ নিয়ে আঙুল দিয়েই কাগজে ছবি এঁকে দেখাচ্ছেন অভিজিৎকে। কখনো বা নখ দিয়ে সরু লাইন টেনে চোখ নাক ফোটাচ্ছেন। অভিজিৎ দেখে দেখে বলে উঠছে, পা-খি। জুঁ্য পিও খুব খুশি। অভিজিৎ বলছে, কুকু-র। জুঁ্য পিও আরো খুশি। এমনিভাবে গাছ ফুল— কাগজের পর কাগজ এঁকে যাচ্ছেন, আর অভিজিৎ উপুড় হয়ে দেখছে। এই ছবির কয়েকখানা এখনো আছে আমার কাছে।

জুঁ্য পিও শান্তিনিকেতনের কত ছবিই-না এঁকেছিলেন। গান্ধীজী এসেছিলেন— তাঁর স্কেচ করলেন, গুরুদেবের করলেন। শালবীথি আমলকীবীথির ছবি আঁকলেন। রান্নাঘরে একজন খুব মোটা আর প্রকাণ্ড ভুঁড়িওয়ালা ঠাকুর ছিল, তার ছবি আঁকলেন। আমারও এঁকেছিলেন।

চীনে যখন গেলাম তখন জুঁ্য পিও আর ছিলেন না। মস্ত বাড়ি, আঙিনার পর আঙিনা ঘিরে ঘরগুলি সব জুঁ্য পিওর ছবি আর স্মৃতি দিয়ে সাজানো। সরকার থেকেই খরচপত্র করে সাজিয়ে রেখেছে সব। তাঁর স্ত্রী দেখালো জুঁ্য পিওর ছাপানো ছবির অ্যালবাম— দেশে গিয়ে এখানকার ছবি দিয়ে অ্যালবাম বের করেছিলেন। অ্যালবামের ছবিগুলি দেখে দেখে আশ্রমের সেই সেই দৃশ্যগুলি মনে পড়তে লাগল, বলে উঠলাম, এই তো সেই পারুলডাঙায় যাবার পথ, এই তো আমাদের বৈতালিকের দল।

শান্তিনিকেতন থেকে জুঁ পিও একবার কলকাতায় এলেন কয়েকদিনের জন্য। সারাদিন কেবল চিড়িয়াখানায় কাটালেন। আশ্রমে ফিরে এসে আমাকে বললেন, একটা বড়ো আকারের সিল্ক মাউন্ট করে দিতে— ছবি আঁকবেন। তৈরিই ছিল মাউন্টটা ঘরে, জুঁ পিও অনেকখানি চাইনিজ ইঙ্ক গুলে মোটা তুলি দিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে এঁকে ফেললেন— প্রকাণ্ড একটা ঈগল পাখি। কী তার চোখ, শ্যেন দৃষ্টি যাকে বলে। বুঝলাম চিড়িয়াখানায় এই পাখিটিই দেখতে গিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন— ঈগলের চোখ দুটিই দেখতে। আঁকা হয়ে গেলে ছবিটি আমাকে দিলেন।

দেশে ফিরে যাবার দিন ঘনিয়ে এল। আমি শ্যামলীর একখানা বড়ো ছবি এঁকেছিলাম— টেম্পারায়, কলকাতায় একজিবিশনে দিয়েছিলাম, জুঁ পিও দেখেছেন। বললেন, আমাকে ঐ ছবিখানা দাও। আর আমি তোমাকে শিমুল ফুলের একটি ছবি পাঠাব, সিঙ্গাপুরে আমার এক বন্ধু আমার চেয়ে ভালো শিমুল ফুলের ছবি আঁকতে পারে— তার আঁকা ছবিই পাঠাব।

মাসখানেকের মধ্যেই পেয়েছিলাম সেই ছবি।

আজও মনে হয় জুঁ পিওর কথা, মনে হয় যেন সেই বয়সেরই আছেন এখনো, দূরে আছেন এই যা।

চীনভবনের আঙিনায় কত উৎসব, অনুষ্ঠান হয়েছে। গুরুদেব আসতেন, অবনীন্দ্রনাথ আসতেন, সরোজিনী নাইডু, পণ্ডিতজী— আরো যাঁরা বিখ্যাতজন আশ্রমে এসেছেন সবাই আসতেন। আশ্রমের আমরাও সকলে জড়ো হতাম সেখানে। চীনভবনের বিরাট হলে আজও নানা উপলক্ষে কত সমাবেশ হয়। চীনভবন আমাদের সম্পদ।

চীনদেশ থেকে আরো কত গুণী-জ্ঞানীরা এসেছেন আশ্রমে। চীনের এক ধর্মগুরু এলেন— সৌম্য প্রশান্ত মূর্তি। গুরুদেব তখন আর ছিলেন না আমাদের মধ্যে, তবু তাঁর উদ্দেশে তাঁর আশ্রমকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেলেন। চীনদেশীয় লোকদের হাত— হাতের আঙুলের বড়ো সৌষ্ঠব, কিন্তু এতখানি সৌষ্ঠব না দেখলে বুঝতে পারতাম না। ধর্মগুরু প্রফেসর তানের সঙ্গে আশ্রমে ঘুরে ঘুরে সব দেখছিলেন, প্রফেসর তাঁকে কোনার্কে আমাদের বাড়িতেও নিয়ে এলেন। সর্বক্ষণ হাতের মালা জপে চলছেন তিনি। আমার স্বামী দেখে দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলেন, আর বলছিলেন, রানী, দেখো দেখো, কী সুন্দর হাতের আঙুলগুলি।

গুরুদেব থাকতে দেশ-বিদেশের বিখ্যাত, গুণী-জ্ঞানী, মনীষী, মহারাজ— কত এসেছেন। সহজভাবে তাঁরা এসেছেন থেকেছেন দেখেছেন। আমরাও সহজভাবেই তাঁদের দেখেছি, পেয়েছি।

গুরুদেব যাবার পরে বিশেষ মাননীয় অতিথি প্রথম আশ্রমে আসেন বোধ হয় চিয়াং কাইশেক। গুরুদেব নেই, সে যেন এক বিরাট দায়-দায়িত্ব সবার, সর্বব্যাপী হৈ-চৈ গোটা ব্যাপারটা জুড়ে।

একদিন দুপুরবেলা শুয়ে শুয়ে আমার স্বামী অভ্যেসমাফিক খবরের কাগজ পড়ছেন, দেখেন মাঝের পাতায় বড়ো বড়ো হরফে ছাপা সংবাদ মার্শাল চিয়াং কাই-শেক সস্ত্রীক ও সদলে দিল্লিতে উপস্থিত হয়েছেন। স্বামী আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন, কারণ চীনের সঙ্গে আমাদের বিশ্বভারতীর যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। চিয়াং কাইশেককে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। তিনি নিশ্চয়ই আসবেন শান্তিনিকেতনে। যদিও জানা যাচ্ছে চিয়াং কাইশেক এই সময়ে দেশ-ভ্রমণে বা জাপানী বোমার ভয়ে আসেন নি। রাজনৈতিক সমরনৈতিক অনেক কিছু আলাপ-আলোচনা নিশ্চয়ই ঘটবে দিল্লিতে। তবু যেন স্থির বিশ্বাস— সময় করে তিনি আসবেনই আমাদের এখানে।

স্বামী তখনই ছুটে রথীদার কাছে গেলেন। রথীদাও ততক্ষণে কাগজে খবরটা দেখেছেন, চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। বললেন, এখুনি প্রফেসর তান সাহেবের কাছে যাচ্ছি— তুমিও চলো।

তান সাহেবেরও সমান উত্তেজনা। তিনজনে মিলে কথা বলে ঠিক হল তখুনি বিশ্বভারতীর তরফ থেকে 'তার' পাঠিয়ে তাঁদের সাদর নিমন্ত্রণ করা হল। রথীদা আশ্রমের কর্তাব্যক্তিদের ডেকে পাঠালেন উদয়নে। 'তার'-এর কথা জানালেন, কি-ভাবে সব ব্যবস্থা হবে আলোচনা চলল। ঠিক হল আজকের শেষরাত্রে তান সাহেব কলকাতায় যাবেন, চীন-রাজদূতের কাছে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় কিনা সে খবর জানতে।

তান সাহেব বললেন, মার্শাল নিশ্চয়ই আসবেন আমাদের আশ্রমে। অন্য কোথাও না গেলেও রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য তিনি নিশ্চয়ই শান্তিনিকেতনে আসবেন।

পরে আমার স্বামীকে একান্তে ডেকে বললেন, কয়দিন আগে কনসাল আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, যেন আমি দিন-কয়েক বাইরে কোথাও না যাই, কারণ আমার পরিচিত কয়েকজন চীনদেশীয় অতিথি এদেশে আসবেন, তাঁরা

শান্তিনিকেতনেও আসবেন।

তান সাহেব বললেন, আমি স্বপ্নেও আশা করি নি যে অতিথিরা হচ্ছেন স্বয়ং মার্শাল আর তাঁর দলবল।

পরের দিন তান সাহেব কলকাতা থেকে ফিরে এলেন, কিন্তু বিশেষ কোনো সংবাদ আনতে পারলেন না। কনসাল ছিলেন না— দিল্লিতে গেছেন মার্শালের সঙ্গে। তবে জানলেন— দূতাবাসের কর্মচারীদের ধারণা মার্শাল আশ্রমে আসবেন নিশ্চিত। আর এটাও তাঁদের কাছ হতে জেনে এসেছেন মার্শাল কলকাতা পৌঁছেই শান্তিনিকেতনে আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু আদব-কায়দায় অর্থাৎ প্রোটোকলে বাধবে বলে আগে দিল্লি যেতে তাঁকে প্ররোচিত করেছেন সরকারি কর্তারা।

টাই চি টাওয়ের বেলায়ও ঠিক এমনি ঘটেছিল। নিজের বিশেষ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে আগে গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে হয়েছিল, গুরুদেবের সঙ্গে পরে।

যা হোক, এখানে তোড়জোড় তখুনি আরম্ভ হয়ে গেল। মোটামুটি কাজের একটা বিধিব্যবস্থা হল। অভ্যর্থনার অভিভাষণটা প্রস্তুত হয়ে রইল।

পরদিন দুপুরে রথীদা একটা চিরকুট লিখে পাঠালেন স্বামীকে— এইমাত্র লাটের বাড়ি থেকে তাঁর Assistant Comptroller ফোনে জানালেন দিল্লি থেকে সংবাদ এসেছে মার্শাল সদলবলে ১৮ তারিখ অর্থাৎ দু দিন পরে এখানে আসবেন, দু-একদিন থাকবেন। দলে থাকবেন পঁচিশ জন ইত্যাদি ইত্যাদি। তুমি এখুনি একবার এসো আমার কাছে।

স্বামীর সঙ্গে আমিও ছুটলাম। আমার তো সবেতেই মজা। দায় নেই, দায়িত্ব নেই— কাঁধে নেই বোঝার ভার। কর্তাদের গুরুগম্ভীর মুখগুলি দেখি আর এক-একবার হেসে উঠি।

রথীদার এমনিতেই শরীর ভালো থাকে না, একটু উদ্‌বেগ উত্তেজনায় আরো কাহিল হয়ে পড়েন। শোবার ঘরে রথীদা আধশোওয়া অবস্থায় শুয়ে আছেন. পেটের উপরে হট ওয়াটার ব্যাগ, মুহুর্মুহু ফোন করছেন। ইতিমধ্যেই কলকাতায় ভোলাবাবুর কাছে জিনিসপত্রের ফর্দ চলে গেছে ফোনে। লাটের Comptroller-এর কাছ থেকে অতিরিক্ত পেট্রলের জন্য অনুমতিও নেওয়া হয়েছে। স্বামীকেও অনেকগুলি আদেশ নির্দেশ দিলেন রথীদা। স্বামী তখুনি যথা আদিষ্ট সুরেনদার সঙ্গে দেখা করলেন। জনা-কয়েক তাঁরা এদিক-ওদিক ছুটোছুটি লাগালেন। সন্ধ্যায় বিভাগীয় কর্তারা আবার উদয়নে জমায়েত হলেন। কিভাবে কে কী ব্যবস্থার ভার

নেবেন ঠিক করা হল। এমন সময়ে সুধীরবাবু এসে বললেন এইমাত্র আবার ফোন এসেছে যে মার্শাল আসতে পারবেন না। তাঁদের দেশে সংকটজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘটেছে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা জরুরি 'তার'ও এল যে, মার্শাল আমাদের আমন্ত্রণে অভিনন্দনে বিশেষ আপ্যায়িত হয়েছেন। তাঁর পক্ষে শান্তিনিকেতন আসা সম্ভবপর হলে আনন্দের সীমা থাকত না। কিন্তু বিশেষ কারণে বর্তমানে আসা অসম্ভব।

সব উৎসাহ সব কর্মব্যস্ততার উপর যেন নিমেষে ঠাণ্ডা জলের প্রবাহ বয়ে গেল। সকলেই কেমন মিইয়ে গেলেন। তান সাহেবের মুখখানা বড়োই করুণ ঠেকল। ঠাকুরদা অভ্যর্থনার মন্ত্রগুলি বেছে বেছে সংগ্রহ করেছিলেন, বললেন, বাঁচা গেল। এই-সব বাজে কাজে এত সময় নষ্ট হয়, মন্ত্র বাছাই করা যে কী কঠিন কাজ। কত সময় নষ্ট হয়। যাই, এখন নিজের কাজে ফিরে যাই।

তান সাহেব শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন ভোরের গাড়িতে কলকাতায় যাবেন. যদি সেখানে মার্শালের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারেন।

সভা ভাঙল।

বাড়ির পথে চলতে চলতে তান সাহেব আমার স্বামীকে বললেন, তুমিও আমার সঙ্গে চলো। হয়তো বর্ধমানেই আমরা মার্শালের 'স্পেশাল' ধরতে পারব, সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করে নেব। কারণ কলকাতায় গভর্নমেণ্ট হাউসের দেউড়ি পেরিয়ে মার্শালের কাছে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। তা ছাড়া হয়তো তিনি কলকাতা পৌঁছেই চীনে ফিরে যাবেন।

শীতকালের ভোরবেলা, অনিশ্চিত ট্যাক্সির উপর নির্ভর করে এক মিনিটের জন্য বর্ধমানে মার্শালকে সেলাম দিতে আর কৌতূহল মেটাতে ততখানি উৎসাহ ছিল না যদিও, তবু সোজাসুজি 'না' বলাও অসম্ভব। স্বামী বললেন, যেতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু বাইরের দিক থেকে হয়তো ভালো দেখাবে না। আমি নিজের থেকে বিশ্বভারতীর প্রতিনিধি হয়ে গিয়ে মার্শালকে বর্ধমানে সংবর্ধনা করে আসতে পারি না।

তান সাহেব তখুনি ছুটে গেলেন রথীদার কাছে। রথীদাও সহজেই স্বীকৃত হলেন যে বর্ধমানে আমাদের তরফ থেকে কারো যাওয়া উচিত, অনিলই যাক। রথীদা ডেকে তাঁকে নির্দেশ দিলেন। না গিয়ে আর উপায় রইল না।

ভোরবেলা, এত ভোরে, কন্‌কনে শীত, কিন্তু ভাগ্য তাঁর প্রসন্ন। কলকাতায়

লাটবাড়িতে ফোন করে জানা গেল মার্শালের 'স্পেশাল' দুপুরবেলা দেড়টায় কলকাতা পৌঁছবে। তাই ভোরের গাড়িতে না গিয়ে সকাল আটটার গাড়িতে গেলেও চলবে। তবে Comptroller ভদ্রলোকটি খবর বললেন যে বর্ধমানে ট্রেন শুধু একমিনিটের জন্য থামবে। তিনি অবশ্যি আশ্বাস দিলেন সেখানকার পুলিসের কর্তাদের বলে রাখবেন যেন সেই 'স্পেশালে'র কাছে যেতে অনুমতি দেওয়া হয় এঁদের।

গাড়ির মোটামুটি সময়-তালিকা পেয়ে তান সাহেবকে স্বামী খবর দিতে চললেন যে, ভোরের গাড়িতে না গিয়ে আটটার গাড়িতে গেলেই চলবে আমাদের। কে শোনে কার কথা? তান সাহেব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বললেন, এ হতেই পারে না, আমরা 'স্পেশাল' ধরতে পারব না। কলকাতায় ওরা নিশ্চয়ই ঠিক খবর জানে না। তুমি ইংরাজদের চেনো না। মার্শাল যদি মাঝে পথ থেকে উড়োজাহাজে চলে যান— ইত্যাদি ইত্যাদি।

পারলে তান সাহেব এখনি বর্ধমানে চলে যান, মোটর বা আর-কোনো বাহনের সুবিধে নেই— সেই এক বাধা। নইলে একরাত্রি বর্ধমান স্টেশনে মশার কামড় খাওয়া কিছুই না— মার্শালের সঙ্গে দেখা তো নিশ্চিত হবে।

তান সাহেব আমাদের পরম বন্ধু— স্নেহে মমতায় বড়ো ভাইয়ের মতো। তাই সময়ে সময়ে আমার স্বামীর জোরজবরদস্তি সহ্য করেন, চুপ করে মেনে নেন অনুরোধ-আবদার। স্বামী যখন তাঁকে বললেন, সংবাদ খোদ লাট বাড়ি থেকে সংগ্রহ করা, তা সত্ত্বেও মার্শাল যদি মাঝে পথ থেকে উড়োজাহাজে দেশে ফিরেই যান তবে ভোর চারটেই বা কি, আর সকাল আটটাই বা কি। আমাদের দর্শনলাভ ঘটবে না। আর তা যদি না হয় খবর যদি ঠিকই থাকে তবে মার্শালের 'স্পেশাল' কলকাতা পৌঁছবে বেলা দুটোর সময়ে, বর্ধমানে আসবে দশটার আগে নয়। আটটার ট্রেনে গেলেও আমাদের হাতে থাকবে অনেকখানি সময়।

তর্কের ধাক্কায় তান সাহেব চুপ করে রইলেন— আটটার ট্রেনেই যেতে রাজি হলেন। তবে প্রসন্নচিত্তে নয়।

সকালবেলা রথীদা গুরুদেবের আঁকা একখানা ছবি, একখানা 'চিত্রলিপি' ও 'বিচিত্রিতা' একখণ্ড পাঠিয়ে দিলেন আমার স্বামীকে— বর্ধমানে রথীদার হয়ে মার্শালকে উপহার দিতে। ইতিমধ্যে ছুটোছুটি সাধ্যসাধনা করে নীলমণিবাবুর বাসখানা তাঁদের স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্য রাজি করানো গেল। সকালে

তান সাহেব বারে বারে তাড়া দিয়ে লোক পাঠাচ্ছেন— ট্রেনের সময় পেরিয়ে গেল বলে। কোনোমতে একটা বাসে একপ্রস্থ কাপড় জামা, রথীদার দেওয়া উপহার নিয়ে বাসে চেপে রওনা হলেন স্বামী চীনভবনের উদ্দেশে। তান সাহেবের নিশ্চল আশঙ্কা এঁর গাফিলতি আর গড়িমসিতে ট্রেন নিশ্চয়ই মিস্ করবেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু হয়েও ছিল সেই উপক্রমই। ভুবনডাঙার কাছে গিয়ে ভাঙা বাস থক্ থক্ করে জবাব দিয়ে বসল— আর যাবে না। নীলমণিবাবু লাফ মেরে নেমে নানা তুক্তাক্ করলেন, নানা যন্ত্রপাতি বের করে নানা প্রক্রিয়া-উপক্রিয়া করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। এদিকে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলল।

আমার স্বামী পরে এ ঘটনা বলতে গিয়ে বলেছিলেন— প্রফেসরের মুখের দিকে তখন আমার তাকাবার সাহস হচ্ছিল না। মরিয়া হয়ে ছুটে গিয়ে ধীরাদার বাড়িতে উপস্থিত হলাম, তাঁর গাড়িখানা চেয়ে নিয়ে ধাঁ করে মালপত্র তুলে ঘাড়-ভাঙা গতিতে স্টেশনে পৌঁছলাম। ট্রেনও ধরলাম। নইলে জন্মের মতো প্রফেসর আমাকে ক্ষমা করতেন না।

আর, হয়তো মার্শালেরও এ যাত্রা আর শান্তিনিকেতনে আসা হত না।

প্রফেসরকে আমার স্বামী খুবই ভালোবাসতেন— এটা দু পক্ষেরই ছিল। এখন যে একজন নেই— তবু তান সাহেবের সেই ভালোবাসা আমাদের গোটা পরিবারে ছড়িয়ে আছে। আমি তাঁকে 'দাদা' ডাকি— আমার ছেলের ছেলে তাঁকে ডাকে 'দাদু'। এই ভালোবাসার অধিকারেই তানদাদাকে নিয়ে রস-রসিকতা করতে ছাড়তেন না আমার স্বামী। তানদাদাও হাসিমুখে মেনে নিতেন সব। সেই দিনের সেই গল্পই করতে করতে স্বামী বলছিলেন : ট্রেনে উঠে চেপে তো বসলাম। বসে ধীরেসুস্থে প্রফেসরের তল্পিতল্পার দিকে দৃষ্টিপাত করে আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। সিন্দুক-সমান বড়ো একটি হলদে রঙের স্যুটকেস, একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ, একটা চামড়ার কেস, খদ্দরের ঝোলাঝুলি কয়েকটা, একটা বোঁচকা, কয়েকটা প্যাকেট, খান-কয়েক মোটা বই আর তাঁর ভীমের গদাসম এক লাঠি। আমার মনে সন্দেহ হল— এইসঙ্গে না প্রফেসর চুংকিং-এ চলে যান। তবে তিনি আশ্বাস দিলেন এমন কোনো মতলব তাঁর নেই। এগুলি সব উপহারে ভরা। পরে দেখেছি তিনি দলের সবাইকে এক-একটি উপহার দিয়েছেন। স্বয়ং মার্শালের জন্য এনেছেন শ্রীনিকেতনের একখানা চামড়ার কুশন। এ-সব জিনিস তাঁদের খুব পছন্দ হয়েছিল। যখন শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন দেখেছি শিল্পভবনের তৈরি জিনিসপত্র

তাঁরা কাড়াকাড়ি করে কিনে নিয়ে গেছেন। যা হোক, বইগুলির মধ্যে একখানা বই ছিল প্রফেসর তানের হাতে— নতুন কেনা— Sven Hedin-এর লেখা মার্শালের জীবনী। সেটা তক্ষুনি চেয়ে নিলাম ওঁর কাছ হতে, মনে বাসনা রইল সম্ভব হলে মার্শাল ও মাদাম দুজনের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে রাখব বইতে।

স্বামীর আশা সফল হয়েছিল। আর অপত্য স্নেহের বশবর্তী হয়ে পুত্রের অটোগ্রাফ খাতাখানাও সঙ্গে নিয়েছিলেন— সেখানাতে তাঁদের সই জোগাড় করতে পেরেছিলেন।

এ-সব গল্প-কথা আমরা শুনেছি আমার স্বামীর মুখে মার্শালের আসা-যাওয়া হয়ে যাবার পরে। তখনো যেন রেশ কাটে নি। এক উত্তাল উন্মাদনায় ছিলাম যেন সকলে।

এবারে আমার স্বামীর কথাতেই কথা বলে যাই। এটুকু কথা তাঁর কথাতেই থাক্। জীবনে যা কখনো করেন নি, কি জানি কী মনে হয়েছিল— একটি পুরানো এক্সারসাইজ খাতায় দেখি পর পর কয়েকপৃষ্ঠা লিখে রেখেছেন মার্শালের আশ্রমে আসার কাহিনীটিকে নিয়ে। তাও অসমাপ্ত।

ভাবছি— তবুও তো লিখেছিলেন এটুকু? তবুও তো কিছু নিখুঁত বর্ণনা পেলাম ঘটনার।

থাক্ তাঁর এই লেখাটুকু মিশে এই বইটিতে। আর তো লিখবেন না।

তিনি লিখেছেন: "আমি বোলপুর থেকেই ফোনে আসানসোলের স্টেশন-মাস্টারকে জানিয়ে রেখেছিলাম— মার্শালের ট্রেন পৌঁছলে তাঁর সেক্রেটারিকে যেন বলে দেওয়া হয় যে আমরা দুজনে শান্তিনিকেতনের প্রতিনিধি হয়ে বর্ধমানে মার্শালের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। এই একটু বুদ্ধির কাজে আমাদের খুব সুবিধে হল। কারণ পরে জানলাম আমাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে কলকাতা থেকে কোনো আদেশ বা উপদেশ আসে নি।

আমাদের গাড়ি ক্রমে বর্ধমান পৌঁছল। আমরা আমাদের মালপত্র বিশ্রামাগারে রেখে স্টেশন-মাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। চমৎকার ভদ্রলোক, ভারি সুন্দর এঁর আচার-ব্যবহার। কোনো ইউরোপীয় লোককে বিশেষ করে রেল কর্মচারীকে এমন ভদ্রভাবে আলাপ-সালাপ করতে আমি অন্তত দেখি নি। স্টেশন-মাস্টারকে আমাদের পরিচয় দিয়ে বললাম, বলে দিন কোন্ সময়ে গাড়ি বর্ধমান আসবে। আমরা তা হলে ধীরেসুস্থে হাতমুখ ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকি। উনি

বললেন, আমি পুলিস থেকে এখনো কোনো খবর পাই নি, সুতরাং আপনাদের কোনো খবরই দিতে পারব না। আপনারা অপরাধ নেবেন না।

আমি তখন চললাম পাব্লিক টেলিফোন অফিস থেকে পুলিস সাহেবের সঙ্গে আলাপ করতে, কারণ পরিষ্কার বোঝা গেল এ পুরোদস্তুর মিলিটারি ব্যাপার, গোড়া ঘেঁষে কোপ না দিলে কিছুই হবে না। সারা স্টেশনে গুর্খা সৈন্য ভর্তি, মাঝে মাঝে কতকগুলি লালমুখো সার্জেন্ট কর্তৃত্ব করে বেড়াচ্ছে।

ইতিমধ্যে স্টেশন-মাস্টার একটি দূত পাঠিয়ে খবর দিলেন প্রফেসর তানকে ট্রাঙ্ক কলে তলব করা হয়েছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধরে জানা গেল কলকাতা থেকে চৈনিক Consulate তাঁকে জানাচ্ছেন যে মার্শাল আজ কলকাতা ফিরে যাচ্ছেন, এবং তাঁর পক্ষে শান্তিনিকেতনে যাওয়া সম্ভব হবে না। প্রফেসর তান যেন কলকাতায় এসেই মার্শালের সঙ্গে দেখা করেন।

আমরা আবার স্টেশন-মাস্টারের ঘরে ফিরে এলাম। স্টেশন-মাস্টার বললেন, আপনাদের এখন লাইন ক্লিয়ার, কারণ আসানসোল থেকে পুলিস তাদের ফোনে জানিয়েছে, আমরা দুজন মার্শালের সঙ্গে দেখা করব, আমাদের যেন মার্শালের ট্রেনের কাছে উপস্থিত থাকতে দেওয়া হয়।

পুলিস সাহেবও আমাদের আলাদা করে খবর পাঠালেন 'আমাদের রোড ক্লিয়ার'।

এবারে স্টেশন-মাস্টার একগাল হেসে confidential চিহ্নিত একটা খাম খুলে বললেন— এগারোটা পঁচিশ মিনিটে pilot train যাবে, আর এগারোটা সাতচল্লিশ মিনিটে 'স্পেশাল' আসবে, থাকবে আট মিনিট। স্টেশন-মাস্টার আরো বললেন, যথাসময়ে তিনি আমাদের প্ল্যাটফরমে নিয়ে যাবেন, আমাদের মালপত্রের জন্য লোক ঠিক করে রাখবেন।

আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ওয়েটিং-রুমে এসে স্নান সেরে ধড়াচুড়া পরে কিছু খেয়ে নিলাম। দু পেয়ালা কড়া কফি পান করলাম। পরে কম্পিত বক্ষে প্রস্তুত হয়ে বসে রইলাম।

খানিক পরে পাইলট ইঞ্জিন চলে গেল। আমরাও স্টেশনে এসে উপস্থিত হলাম। স্টেশনে তখন বাইরের লোক একটিও নেই। দুইধারে বন্দুক হাতে সৈন্যরা ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

স্টেশন-মাস্টার আমাকে বললেন, আমার একটি উপকার করুন, এই আমার

মেয়ের অটোগ্রাফ খাতা— যদি মার্শাল আর মাদামের স্বাক্ষর জোগাড় করে দেন— ।

হেসে বললাম, তাই হবে। We fathers are all the same. আমিও আমার ছেলের বইটা সঙ্গে এনেছি। বলতে বলতে ট্রেনের ধোঁয়া দেখা দিল, ধীরে ধীরে স্পেশাল প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়াল। মাঝখানে সাদা দুখানা composition— বাংলার লাট তাঁর গাড়ি দুখানা মার্শাল-দম্পতির ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন। গাড়ির সামনে ও পিছনে কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর গাড়ি। এরই একটা থেকে প্রথমেই নামলেন কলকাতার নতুন চৈনিক কনসাল Dr. Pao, আরো একজন। পরে জেনেছি এই ভদ্রলোক মন্ত্রী শ্রেণীর লোক, বেশ ক্ষমতাশালী। ইনি ইংরাজি বেশ জানেন, লণ্ডনে State School of Arts-এ শিক্ষালাভ করেছেন। দুজনেই খুব হৃদ্যতার সঙ্গে আমাদের করমর্দন করলেন। দেখলাম তান সাহেবের সঙ্গে এঁদের বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে। তাঁরই সঙ্গে এঁদের চীনা ভাষায় খানিক আলাপ হল, বোঝা গেল প্রফেসর ব্যবস্থা করছেন আমরা এঁদের সঙ্গে কলকাতা যাব, তা হলে তিনি মার্শালের সঙ্গে নিরিবিলি কিছু আলাপ-আলোচনা করে নিতে পারবেন। প্রথম থেকেই প্রফেসরের মনে এই প্ল্যান ছিল। তাড়াতাড়ি আমাদের সব মাল সামনের গাড়িতে তোলা হল। সকলে তখন দলবেঁধে সাদা গাড়িগুলির দিকে এগুতে লাগলাম, উদ্দেশ্য মার্শালকে সেলাম দেওয়া। মাঝপথেই বাধা পেলাম, একজন এসে জানালেন, মার্শাল প্রস্তুত নন এখনো।

আমরা আগের গাড়িতে ফিরে এলাম। জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়ে বসবার আয়োজন করে সিগারেট কেস একে অন্যের কাছে চালনা করছি এমন সময়ে হঠাৎ বাইরে একটু সোরগোলের সাড়া পড়ল। শুনলাম আমরা এসেছি শুনে মার্শাল নিজে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। তাড়াতাড়ি একলাফে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম— সামনেই মার্শাল। লম্বা পাতলা তাঁর দেহ, মাথায় মোটা বিরাট এক সোলাটুপি, অনেকটা pigsticking hat-এর মতো বিশালকায়। পরনে নিতান্ত সাদাসিধে নীলরঙের চীনে লম্বা কুর্তা। পায়ের জুতো মোজা লক্ষ্য করলাম— সবই আটপৌরে।

প্রফেসর খুব নুয়ে তাঁদের প্রথানুযায়ী অভিবাদন করলেন, ও পরে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমিও খুব নুয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলাম। তিনি আমার হাত ধরে রইলেন যতক্ষণ পর্যন্ত প্রফেসর গড়গড় করে উচ্ছ্বসিত ভাবে চীনে ভাষায়

আমার গুণগান করছিলেন। প্রফেসর আমার বন্ধু। তাঁর এই বন্ধুপ্রীতির নিদর্শন খুব জোরের সঙ্গেই দেখালেন, কারণ দেখলাম আশেপাশের এঁরা আমার গুণকীর্তন শুনে কেমন যেন আমার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠলেন। যা হোক, মার্শাল আমাদের তাঁর নিজের গাড়িতে আহ্বান করলেন, আমরাও তাঁর পিছনে পিছনে ধীরে ধীরে এগতে লাগলাম। গাড়িতে উঠতে যাব এমন সময়ে কে যেন আমার কাঁধ স্পর্শ করল, চেয়ে দেখি আমাদের স্টেশন-মাস্টারটি। করুণভাবে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন— আমার মেয়ের অটোগ্রাফটি ভুলো না।

তাঁর অনুরোধ আমি রক্ষা করেছি।

লাটের গাড়ির মাঝে ছোটো একটি কামরা, অনেকটা observation verandah মতো। কামরায় ছোটো একটি টেবিল, পেগ টেবিলের মতো, আর খান-তিনেক চেয়ার। দলের অন্যরা swing door দিয়ে পাশের কামরায় চলে গেলেন, মার্শাল ও আমরা শুধু দুজনে রইলাম ঘরে। মার্শাল চেয়ার দেখিয়ে আমাদের বসতে ইঙ্গিত করলেন। তিনি দাঁড়িয়ে রইবেন আর আমরা বসব— এ হতে পারে না। আবার আমরা অতিথি, আমরা না বসলে হয়তো তাঁদের সামাজিক নীতি অনুযায়ী তিনি বসতে পারেন না। খানিকক্ষণ আমরা সবাই দাঁড়িয়ে রইলাম। পরে প্রফেসরের অনুনয় অনুরোধে মার্শাল আসন নিলেন, আমরাও বসলাম। আলাপসালাপ আরম্ভ হল, প্রথমে চীনে ভাষায়— প্রফেসর তানেরই সঙ্গে। কী বিষয়ে বা কী ধরনের কথাবার্তা হল কিছুই জানি না। হয়তো বা শুধু সামাজিক pleasantries.

এর মধ্যে ভারি একটা মজা হয়ে গেল। আমরাও যে এই গাড়িতে যাব এ কথা বাইরের আর কেউ জানে না। আমরা মার্শালের ঘরে বসে আছি, কেউ আসতেও সাহস পাচ্ছে না। এদিকে প্রায় মিনিট-কুড়ি সময়ও কেটে গেল। শেষে খুব জমকালো এক উর্দিপরা চাপরাসী ধীরে ধীরে দরজা খুলল, ইংরেজ A. D. C. এসে জিজ্ঞেস করলেন গাড়ি কি যাবে এবার? আমি মার্শালের মুখের দিকে চাইতেই তিনি হাত দিয়ে যাবার আদেশ দিলেন। গাড়ি ধীরে ধীরে ছাড়ল।

আমার সামনেই বসে আছেন মার্শাল, যাঁর কথা এত শুনেছি, এত পড়েছি। কেউ বলেন চীনে অগণিত দস্যুদের মধ্যে ইনিও একজন— শুধু একটু হালফ্যাশনী, কিংবা একটু বেশি ভাগ্যবান। আবার কেউ কেউ বলেছেন চীনকে যদি কেউ বাঁচায় তবে সে এই চিয়াং কাইশেক। আর সেই লোককেই মুখোমুখি নিয়ে বসে

আছি। আশ্চর্য এক অনুভূতি। আমি কখনো অভিভূত হই না। এক মুহূর্তের জন্যও আমার মনে এমন কোনো ভাবের উদয় হয় নি যে, এঁর সঙ্গে সহজ সরল সামাজিক ভাবে মিশতে পারব না। কিন্তু প্রতিমুহূর্তেই মনে হচ্ছিল ইনি জগতের এক-চতুর্থাংশ অধিবাসীর হর্তাকর্তা বিধাতা। চিয়াং কাইশেককে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না কিছুতেই। তাঁর চোখই চেঁচিয়ে বলবে, 'আমি আছি'। এই কথাটা বার বার আমার মনে হচ্ছিল। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁরাই আমার এ উক্তি মেনে নেবেন। কী দৃঢ়তাব্যঞ্জক তাঁর চোখ, এই চোখ তো শুধু দেখে না, এ যে দেখায়ও।

মার্শাল প্রফেসরের সঙ্গে কথা বলছিলেন, এই সুযোগে আমি তাঁকে খুব ভালো করে লক্ষ্য করছিলাম। মাজাঘষা দেহ, মেদমজ্জার বাহুল্য নেই এতটুকু কোথাও, শক্তিশালী পুরুষ। স্থির সোজা বসার ভঙ্গি। আমরা তো সোজা হয়ে বসতেই পারি না। লোকে বলে আমাদের বাঙালির শিরদাঁড়া নেই, দেহের মনের দুয়েরই।

মার্শালের টেবিলে খান-কয়েক বই— সবগুলি আর্টের বিষয়ক— medici series, Rembrandt, Van Gogh প্রভৃতির বই। পরে পাশের ঘর থেকে swing door-এর ফাঁকে ফাঁকে দেখেছি মার্শাল নিবিষ্ট চিত্তে দেখছেন ছবিগুলি। খুব অবাক হচ্ছিলাম দেখে।

আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম তাঁর হাতের পাঞ্জা খুব বড়ো, নখগুলিও খুব লম্বা।

শুনেছি চীনেদের সকলেরই হাত সুন্দর, আঙুলগুলি লম্বা, সুগড়ন। মনে পড়েছিল টাই-চি-টউ-এর কথা— এমন সুন্দর হাত বোধ হয় দেখি নি আমি কোথাও। মিনিট-দশেক তান সাহেবের সঙ্গে কথা বলে মার্শাল আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে কিছু বললেন। অনুবাদ করলেন এক কর্নেল।

মার্শাল বললেন, ভারতবর্ষে এসেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল না— এ আমার নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। আমাদের চরম দুর্দিনে তিনি যে গভীরভাবে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁর উৎসাহ বাণী দিয়ে, তার জন্যও তাঁকে আমাদের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানাতে পারলাম না।

বললাম, রবীন্দ্রনাথ আপনাদের মহান জাতির প্রতি নিতান্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন, আর ব্যক্তিগতভাবে আপনার প্রতি তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল। আপনি শুনে

নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন যে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি চীনদেশ সম্বন্ধে সমানভাবে ঔৎসুক্য দেখিয়ে গেছেন। বর্মা রোড যখন জাপানীর চাপে ইংরেজরা বন্ধ করে দেয় তখন তিনি ভয়ানকভাবে অসুস্থ— সপ্তাহ ধরে অজ্ঞান। কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসার পর প্রায় প্রথম কথাই বলেছিলেন চীন সম্বন্ধে। বর্মা রোডের কথা শুনে দুঃখে ঘৃণায় তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। ঐ দিনই জীবনে তাঁর প্রথম চোখের জল দেখি।

মার্শাল বললেন, আমাদের প্রতি তাঁর দয়ার কথা কখনো ভুলব না। তিনি একটা সমগ্র জাতির প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা দিয়ে অভিষিক্ত হয়ে গেছেন।

বললাম, মার্শাল, আপনি আমাদের দেশে এলেন, অথচ একবার শান্তিনিকেতনে এলেন না। আপনার আসার সংবাদে আমরা সবাই বড়ো উৎফুল্ল হয়েছিলাম। শেষ খবরে হতাশায় ভেঙে পড়েছি।

তিনি বললেন, এ দুঃখ আমারই। কিন্তু নানা কাজের মধ্যে রয়েছি— অবশ্যি আমি এখনো আশা ছাড়ি নি। যদি একটু সময় করে নিতে পারি তবে অল্প সময়ের জন্য হলেও আসব একবার।

এই বলে মার্শাল চুপ করলেন। তিনি স্বল্পভাষী।

এই সুযোগে আমাদের উপহারগুলি তাঁকে ধরে দিলাম। গুরুদেবের আঁকা ছবি পেয়ে খুব শ্রদ্ধাভরে তুলে ধরে দেখলেন। বই দুখানাও পেয়ে খুব খুশি হলেন। মাদামের জন্য আমার স্ত্রীর আঁকা গুরুদেবের দুখানা ছবি নিয়েছিলাম— পোর্ট্রেট, দেখে বললেন 'ভেরী গুড'। ঐ মাত্র তাঁর মুখে ইংরেজি কথা শুনেছি। কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস তিনি ইংরেজি বোঝেন, হয়তো বলতে পারেন না— কিংবা ইচ্ছা করেই বলেন না। সাবধানের হিসাবে। তুরস্কের ইসমৎ পাশাও শুনেছি ইংরেজি বোঝেন— বলতেও পারেন, কিন্তু বাইরে তাঁর দোভাষী ছাড়া চলে না।

প্রফেসর তাঁকে যে একটি চামড়ার কুশন দিয়েছিলেন মার্শাল সেটি তক্ষুনি ব্যবহার করবার উদ্দেশে সেটা তাঁর চেয়ারে রাখলেন, চেয়ারের seat-এর অর্ধেকের বেশি জায়গা জুড়ে রইল সেই কুশন। সে যুগের রেলগাড়ির গোল গোল হাতওয়ালা চেয়ারগুলি পরিধিতে ছোটো। প্রফেসরকে বললাম মার্শালের কুশনখানা তুলে নিন, চেয়ারে মার্শাল ও কুশন দুয়ের স্থান হবে না একসঙ্গে।

মার্শালের সঙ্গে আমাদের প্রারম্ভিক আলাপ শেষ হল। খানিক পরে পাশের ঘর থেকে তাঁর সেক্রেটারি আমাদের ইঙ্গিত করলেন, এবারে চলো। আমরাও

আনতভাবে বিদায় নিয়ে পাশের ঘরে চলে এলাম। ঘরে ছিলেন Dr. Wang, General ও কয়েকজন, আর কয়েকজন বিশিষ্ট লোক। সকলেরই সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল। কিন্তু প্রথমে ধাঁ করে বুঝতে পারি নি কে কী, পরে সব জেনেছি— খানিকটা আলাপ-আলোচনায়, খানিকটা বই পড়ে।

বৃদ্ধ মতো একজন— মোটেই সুপুরুষ নন, মনে হয় যেন misanthrope— একটু ঝড়ভাঙা শরীর, ভারী কাঁচের চশমা চোখে, স্বল্পভাষী, মুখের ভাব তিক্ত অপ্রসন্ন। বইয়ে পড়ে দেখলাম তাঁকে Chinese Talleyrand বলে অভিহিত করা হয়। তিনি দলের সর্বপ্রধান লোক, এককালে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। পার্টিতে তাঁর স্থান ছিল মার্শালেরও উপর। এঁর সঙ্গে আমার কোনো আলাপ হয় নি, ইনি দলের সঙ্গে শান্তিনিকেতনেও আসেন নি। হয়তো রাজনৈতিক আলোচনার জন্য কলকাতায় থেকে গেলেন। ভদ্রলোক ভয়ানক সিগারেট টানেন, একটার পর একটা জ্বালান।

প্রথমে আমার আলাপ হল যাঁর সঙ্গে— ভদ্রলোক আমারই ধরনের লোক, সদাই ব্যস্ত, ছট্‌ফটে। অল্প দু-এক কথার পরই নিজের পরিচয় দিলেন— লণ্ডনে স্লেড স্কুলে পড়েছেন art, প্যারিসে পড়েছেন সাহিত্য ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির ইতিহাস। তাঁর স্ত্রীকেও আহরণ করেছেন ঐ দেশ থেকেই। বর্তমানে উপমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত। বললেন, আমি কবি, নাটকও লিখেছি। আমার অনেক বই সিনেমা করা হয়েছে। এমন-কি, মাঝে মাঝে কোনো প্রতিষ্ঠানের সাহায্যার্থে অভিনয় হলে নিজেও স্টেজে নেমে পড়ি।

ভদ্রলোককে ভালো না লাগার উপায় নাই। সদাপ্রসন্ন। হাসিটি মিষ্টি, সর্বজয়ী। সহজেই মনে হয় লোকটি ভালো। এঁকে আমার অনুরোধ জানালাম বইতে মার্শালের স্বাক্ষর চাই, তখুনি গিয়ে সই করিয়ে নিয়ে এলেন। এঁর সঙ্গে আমার আলাপ খুবই জমেছিল। ইনি আমাদের Ju Peon-এর বিশেষ বন্ধু। কিছু পরে পকেট থেকে একখানা টাইপকরা কাগজ বের করে আমার হাতে দিলেন— তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন-ইতিহাস। তাঁর বয়স সাতচল্লিশ। হিসাব করে দেখলাম এরই মধ্যে ৪৭টির বেশি বিভিন্ন কাজ করেছেন। অনেকগুলিই মন্ত্রীশ্রেণীয়, কিন্তু কোনো জায়গায় তিন-চার মাসের বেশি স্থিতি নেই। এ সম্বন্ধে দুটি theory আমার মনে উদয় হয়েছে, হয়তো ইনি সুপারম্যান, যখনই মহাচীনের শাসনবিভাগে কোনো জায়গায় কোনো গলতি হয়েছে সংশোধনের জন্য এঁকে

পাঠানো হয়েছে, কিংবা হয়তো ঠিক তার উল্টো। সে যাক— অধ্যাপক তানের অভিমতই গ্রহণ করতে হবে। তিনি বললেন, ইনি rising star, এঁর হাতে বেশ ক্ষমতা আছে, যোগ্য ব্যক্তি। তাই বোধ হয় ঠিক, নইলে এঁকে গান্ধীজীর কাছে মার্শাল পাঠাতেন না তাঁর প্রতিনিধি করে।

যে কামরায় আমরা বসেছিলাম সেটা খুব লম্বা, সাধারণ প্রথমশ্রেণীর কামরার দ্বিগুণ হবে। ঐ প্রান্তে একটা side table, ঘরে চারখানা settee, সেগুলিরই উপর বিছানা করা রয়েছে। মাঝে একটা-দুটো folding table। টেবিলের ঐ ধারে মাঝবয়সী একজন জেনারেল বসে আছেন, মাঝে মাঝে কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটছেন। গোলগাল মুখখানা রোদেপোড়া তামাটে, চোখে চশমা। কি জানি আমার মনে হল ভদ্রলোক ইংরেজি ভাষানভিজ্ঞ। তাই যখন প্রফেসর তানের সঙ্গে ভয়ানক জোরের সঙ্গে চীনে ভাষায় আলাপ করতে শুরু করলেন, আমি এককোণে চুপ করে বসেছিলাম।

খানিক পরে এদেরই একজনকে মার্শাল ডেকে পাঠালেন। একটি চীনা-পরিচারিকা মাঝে মাঝে এ ঘর ও ঘর করছে, দরজা ফাঁক হলেই দেখি নিবিষ্ট মনে মার্শাল বই উল্টাচ্ছেন। বলতে ভুলে গেছি মার্শালের টেবিলের উপর ভারতবর্ষের বড়ো আকারের একখানা মানচিত্রের বই ছিল।

একটু বাদেই সেই ভদ্রলোক ফিরে এসে বললেন, তোমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। মার্শাল শান্তিনিকেতনে যাবেন। আমাকে ব্যবস্থা করতে আদেশ দিয়েছেন। শুনে আমাদের আনন্দের সীমা রইল না। তাঁর সঙ্গে রাস্তা-ঘাট সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা শুরু করলাম। মোটামুটি ভাবে স্থির হল ১৯শে সকালের দিকে কোনো-এক সময়ে স্পেশাল গাড়িতে সদলবলে মার্শাল আশ্রমে আসবেন, একরাত্রি থেকে পরের দিন কোনো-এক সময়ে ফিরে যাবেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রোগ্রামের একটা খসড়াও করা গেল। মার্শাল দেখে তাঁর সম্মতি জানালেন।

তান সাহেব আর আমার উৎসাহের অন্ত নেই। গাড়ি জল নেবার জন্য জৌগ্রামে এসে দাঁড়াল। একটি চৈনিক পরিচারক সাইড টেবিলের উপর গোটা-কয়েক চীনেবাটি ইত্যাদি এনে সাজিয়ে রাখতে লাগল। ভোজনবিলাসী আমি, গাড়িতে চাপলে এমনিতেই আমার খিদে পায়। সেই কখন একটু খেয়েছি— এতক্ষণে খিদেটা প্রবলভাবে জানান দিচ্ছে। মনে প্রশ্ন জাগল— এই যে বাটিরাখা এটা কি ভোজনের উত্তরপর্ব, না, পূর্ব? ভোজন ব্যাপার কি এঁরা সমাধা করে ফেলেছেন?

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমস্যার সমাধান হল। দেখলাম পরিচারকেরা ধরাধরি করে একটা ফোল্ডিং টেবিল ঘরের মাঝখানে এনে খুলে ভোজ্যদ্রব্য দিয়ে সাজাতে আরম্ভ করল। ভালো চীনে খাবারের কথা ভাবতেই মনে হল বড়ো শুভমুহূর্তে যাত্রা শুরু করেছিলাম। টেবিলের দুই প্রান্তে দুখানা চেয়ার এনে রাখা হল। ভাবছি দলের বোধ হয় আরো দুজন আছেন পাশের কামরায়, এখানে এসে খাবেন। এমন সময়ে হঠাৎ swing doorটা ঠেলে দ্বারপ্রান্তে স্বয়ং মার্শাল উপস্থিত। আমি তো একেবারে হতভম্ব, আমি মোটেই ভাবি নি তিনিও এই টেবিলে খাবেন। তিনি ঘরে ঢুকতেই সবাই উঠে দাঁড়ালেন, মার্শাল এসে টেবিলের এক প্রান্তের চেয়ারে বসলেন— অন্য দিকে বসলেন তাঁদেরই আর-এক বিশেষ ব্যক্তি। মার্শাল আমার হাত ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে বসালেন, প্রফেসর বসলেন বাঁয়ে।

খাওয়া হল একেবারে চীনে ধরনের। বাটিতে বাটিতে নানা-প্রকার সুস্বাদু খাবার, প্রত্যেকের জন্য সামনে একটি ছোটো বাটি আর একজোড়া করে হাড়ের চপস্টিক। আমি আমার পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোককে বললাম আমার অনভ্যাস আপনারা ক্ষমা করুন, আমি যে ভদ্রতা বাঁচিয়ে চপস্টিক দিয়ে খেতে পারব মনে হয় না। তখুনি আমার জন্য কাঁটা-চামচ এল— খাওয়া শুরু হল। বলা বাহুল্য, অতি চমৎকার খাবার, কিন্তু ভাতটা নিতান্ত মোটা চালের। এই ধরনের চাল দেশে খেয়েছি গত যুদ্ধের সময়ে। রেঙ্গুনী চাল বলা হত একে।

বেশ সশব্দেই খাওয়া চলল। মাঝে মাঝে একে অন্যের পাতে অর্থাৎ বাটিতে যে কাঠি দিয়ে খাচ্ছেন সেই কাঠি দিয়েই খাবার তুলে দিতে লাগলেন। মার্শালও দু-একবার আমাকে খাবার তুলে দিলেন। এই এক রীতি চীনদেশের বন্ধুত্বের রীতি— আপনজনের উপর অনুরাগের রীতি— ভদ্রতার রীতি।

আর, এঁদের ভোজন ব্যাপারটা একটু বেশি শব্দ-কণ্টকিত। একবার এক চীনে বন্ধু— কলকাতার ভূতপূর্ব কনসাল বলেছিলেন, দেখো, আমাদের ভোজন ব্যাপারটা convention-বর্জিত। সুতরাং বেপরোয়া হয়ে খাওয়া চলে। হাতে ইচ্ছে হয় হাতেই খাও, কাঁটা-চামচে রুচি সেও চলবে— চপস্টিক তো আছেই। চাও তো সুপ বাটি ধরে চুমুক দিয়েও খেতে পারো— কেউ কিছু মনে করবে না।

টেবিলে কথাবার্তা প্রায় কিছুই হচ্ছিল না। খাবার পরেই মার্শাল নিঃশব্দে চলে গেলেন।

প্রফেসর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গভীরভাবে আলোচনা শুরু করলেন। আমি

আমার সামনের আসনে বসা জেনারেলকে জিজ্ঞেস করলাম— Do you speak English, Sir ? উত্তর হল, A little। বড়ো অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, আমাকে ক্ষমা করবেন, আপনার সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ করি নি। আমি তখুনি তাঁর পাশে গিয়ে গল্প জুড়ে দিলাম। এমন চমৎকার মিশুক লোক খুবই কম দেখেছি। গল্প জমে গেল খুব। জেনারেল নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি খুব উঁচুদরের সেনানায়ক, বর্তমানে চুংকিং-এ রয়েছেন সমরবিভাগের কর্তা হিসাবে। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে অনর্গল বলে যেতে লাগলেন তাঁর ইতিহাস। ১৯২৪ সালে গুরুদেবকে দেখেছেন চীনে, Shanshi প্রদেশের সেনাবিভাগের নেতা ছিলেন তিনি তখন। গুরুদেব Shanshi-র গভর্নরের কথা কতবার আমাকে বলেছেন, গুরুদেবের কাছে তাঁর কথা শুনে মনে হত এই গভর্নরটি প্রায় Plato-র Philosopher King। জেনারেলও বললেন, সত্যিই আমাদের গভর্নর ছিলেন model Governor।

জেনারেল মাঝখানে যুদ্ধবিগ্রহ ছেড়ে শাসনবিভাগে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন বহু বৎসর। পাঁচ-পাঁচটা প্রদেশ শাসন করেছেন পর পর। এই জাপ যুদ্ধের প্রারম্ভে আবার তলোয়ার ধরেন। গত চার বছর ক্রমাগত যুদ্ধ করেছেন। সম্প্রতি মার্শাল তাঁকে রাজধানীতে নিয়ে এসেছেন সমরবিভাগের সামরিক কর্তা হিসাবে।

আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, কিশোর বয়সে তিনি Imperial Armyতে ছিলেন, কিন্তু প্রথম থেকেই ছিলেন বিপ্লবী। মাঝে মাঝে সামরিক সংবাদ জাপানে Dr Sun Yat Sen-কে চালান করতেন। Whampoa সামরিক কলেজে মার্শালের সঙ্গে শিক্ষকতা করেছেন।

অনেক-কিছু প্রশ্ন করছিলাম তাঁকে— তিনিও অত্যন্ত সরলভাবে উত্তর দিচ্ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করে বসি, জেনারেল, আপনাকে একটা প্রশ্ন করব, যদি উত্তর দিতে বাধে— কিছুমাত্র সংকোচ করবেন না! কারণ আমার প্রশ্নটি সামরিক নীতিঘটিত।

তিনি স্মিত হেসে বললেন, জিজ্ঞেস করেই দেখুন-না।

বললাম, Soviet Russia কেন যুদ্ধে নামছে না।

তিনি বললেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে তারা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। আমার সঙ্গে রুশ রাজদূতের এই নিয়ে অনেকবার চুংকিং-এ আলাপ-আলোচনা হয়ে গেছে। তবে, তাদের একটু হাঁপ ছাড়তে হবে এবার,

তাদের উপর দিয়ে প্রচণ্ড চোট গেছে।

আরো-কিছু জিজ্ঞেস করবার ছিল, কিন্তু মনে হল হয়তো ভদ্রলোকের হৃদ্যতা ও সৌজন্যের অপব্যবহার করা হবে।

ব্রিটিশ সম্বন্ধে তাঁর খুব উৎসাহ দেখলাম না। বললেন, বিলাসিতা আর যুদ্ধবিগ্রহ একত্রে চলে না। বাইরের ঠাট বজায় রাখতেই ব্রিটিশ মারা গেল। আর তাদের দাম্ভিকতারও শেষ নেই। আমি অনেক চীনে সৈন্য বর্মার সাহায্যে পাঠাতে পারতাম, কিন্তু Wavell স্রেফ জবাব দিল, 'কোনো প্রয়োজন নেই, আমিই এদের রুখব।' দিন-পনেরোর মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি করে তারা সৈন্য চেয়ে পাঠালো। যেটা ধীরেসুস্থে সুব্যবস্থায় করা যেত, সেটা আর হল না, হাতের কাছে যা পেলাম তাই পাঠালাম।

আরো অনেক কথা হল— যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে— সব-আর লিখলাম না।

কারো কারো সঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যেই একটা বন্ধুভাব এসে যায়। এই জেনারেলের সঙ্গে আমার তাই হল। জেনারেল আমাকে কলকাতায় তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। বললাম, সময় কম, কাজ আছে অনেক, আমি দুঃখিত জেনারেল।

জেনারেল বললেন, তবে ডিনার অবধি থাকো আমাদের সঙ্গে।

ডিনার টেবিলে ভোজন প্রসঙ্গে কথা উঠল জেনারেলের ভারি শখ ভারতীয় খাবার খান। আমাদের ইংরেজ প্রভুদের কল্যাণে তাঁদের ভারতীয় জীবন কিছুই দেখা হয় নি।

বললাম, শান্তিনিকেতনে আপনাদের খেদ ঘুচবে। বোঠান যে তাঁদের ভূরিভোজন করাবেন এ আশ্বাস দিলাম। জেনারেল প্রীত হলেন। আমাদের দৈনন্দিন ভোজনে মাছের বাহুল্য শুনে তাঁর বেশ একটু উৎসাহ হল। বললেন, চুংকিং পাহাড়ে জায়গা, মাছ পাওয়াই যায় না। হাত দিয়ে আকার দেখিয়ে বললেন— এতটুকু মাছের দাম কুড়ি ডলার।

পেশোয়ারে জেনারেল ভারতীয় সৈন্যদের ration দেখে এসেছেন, বললেন, চাপাটি সৈন্যদের জন্য ideal food।

আমার যেমন এঁকে ভালো লাগছিল— মনে হল এবং আশা করি ভুল ভাবি নি, তিনিও আমাকে পছন্দ করেছেন। তিনি শেষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে আসেন নি— এই ক্ষোভ আমার মনে রইল।

ট্রেন ইতিমধ্যে কলকাতার খুব দূরে নয়, প্রায় পনেরো মাইলের মধ্যে। হঠাৎ চেয়ে দেখি মাদাম আমাদের কামরায় এসে উপস্থিত। যেমনটি ছবিতে দেখছি ঠিক তেমনটি তাঁর চেহারা। ছিপছিপে তাঁর দেহ, যৌবনের অপরাহ্নে পৌঁচেছেন। প্রদোষের অন্ধকার যেটুকু কালিমা টেনে দিয়েছে মুখে ও দেহে, প্রসাধনের প্রলেপ তা ঢেকে দিয়েছে। কিন্তু আতিশয্য নেই। পদোচিত গাম্ভীর্য ও মহিমারও অভাব নেই। মাদামের সঙ্গে অতি সহজেই আলাপ করা যায়, কারণ তিনি আমেরিকায় শিক্ষিতা, একটা ডিমোক্রেটিক ভিত্তি তাই রয়েছে। ভারি সুন্দর ইংরেজি বলেন। কণ্ঠস্বরও মধুর। প্রথমেই বললেন, তাঁরা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গেই শান্তিনিকেতন ভ্রমণের কথা ভাবছেন। গুরুদেবের উল্লেখ করলেন 'Master' বলে। অতি সুন্দর একটা কথা বললেন। বললেন, গুরুদেবের ছবি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল যে যাঁর কলমে বা তুলিতে এত জোর তাঁর মনের জোরও অপরিসীম।

হয়তো আমরা গুরুদেবের মনের জোরের কথা স্বতঃসিদ্ধ সত্য জানি বলেই সে দিকে তাঁর ছবির প্রমাণ খুঁজি নি। বিদেশী তিনি, তাই ছবিই প্রথম চোখে পড়েছে তাঁর, তার থেকেই গুরুদেবের ক্ষমতার তত্ত্ব পেয়েছেন।

আমি বললাম, মাদামের স্বাক্ষরিত বই একখানা উপহার পেয়ে গুরুদেব কত আনন্দিত হয়েছিলেন। বইখানা আমাদের সংগ্রহে সগৌরবে ও সম্মানের সঙ্গে রাখা হয়েছে।

মাদামের মুখে যেন গর্বের একটু আভাস এল। নোগুচির সঙ্গে পত্র-ব্যবহার তাঁরা আনন্দের সঙ্গে পড়েছেন, সে কথাও বললেন।

আমাদের শিল্পভবনের হাতের কাজের খুব তারিফ করলেন, বললেন, Art wedded to utilityই হচ্ছে শিক্ষার মূল মন্ত্র। এখানেই তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

আমাদের দেশে কয়জন এখনো সেটা স্বীকার করবে?

খানিক পরে মাদাম বললেন, 'Do you smoke?'

অপরাধ কবুল করলাম।

মাদাম Dr Wangকে বললেন, doctor সিগারেট বের করো। আমাকেও দিলেন। সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করবেন এমন সময়ে গাড়ি লাল শালু মণ্ডিত প্ল্যাটফরমে এসে উপস্থিত হল। দেখেই মাদাম সিগারেট ফেলে দিলেন, বললেন, সর্বজনসমক্ষে ধূমপান— আমি মেয়েমানুষ, অনুচিত হবে।

সেই চিরন্তন নারী।

গাড়ি থামল। চেয়ে দেখি সেলুনের সামনে টুপিহাতে দণ্ডায়মান সাড়ে ছয় ফুট লম্বা আমাদের লাট সাহেব।"

এই পর্যন্তই লিখেছেন আমার স্বামী।

চিয়াং কাইশেক এলেন সস্ত্রীক। তখন তাঁদেরই যুগ চীনদেশে। মাদাম চিয়াং কাইশেকের প্রভূত প্রাধান্য।

আমার স্বামী ও প্রফেসর তান গেলেন কলকাতায়— তাঁদের স্বাগত জানিয়ে আশ্রমে আনতে। পণ্ডিতজীও ছিলেন সে সময়ে কলকাতায়, তিনিও এলেন এইসঙ্গে। পণ্ডিতজী যে আসবেন জানা ছিল না। হঠাৎই এলেন। আমার স্বামীকে বললেন, কি অনিল, আমিও আসব না কি? স্বামী তো মহা আনন্দে লুফে নিলেন কথা।

উদয়ন সাজানো হয়েছিল চিয়াং কাইশেক আর মাদামের জন্য। পণ্ডিতজী রইলেন কোনার্কে আমাদের সঙ্গে। এই বাড়িতে এই ঘরে এসে ছিলেন পণ্ডিতজী কমলা নেহরুকে নিয়ে— প্রথম যখন আসেন শান্তিনিকেতনে। তখন গুরুদেব থাকতেন কোনার্কে। দক্ষিণ দিকের ছোটো যে শোবার ঘরখানা, দুখানা খাট পাশাপাশি পাতলে চলাচলের জায়গাটুকু শুধু থাকে সেই ঘরে ছিলেন পণ্ডিতজী আর তাঁর স্ত্রী। গুরুদেব থাকতেন উত্তর-পশ্চিম কোণে 'এল' শেপের ঘরখানায়। ঘরোয়া পরিবেশে ছিলেন— সে-দুদিন বারান্দায় বসছেন, গুরুদেবের সঙ্গে কথা বলছেন— গল্প করছেন, আমি পণ্ডিতজীর স্কেচ করছি— সবই খুব সহজ সুন্দর ভাব। সেবার পণ্ডিতজীকে সন্ধেবেলা উত্তরায়ণের টেনিস কোর্টে সংবর্ধনা দেওয়া হল। টেনিস কোর্টের পাশে বড়ো একটা বাঁধানো চাতাল ছিল, পণ্ডিতজী আর কমলা নেহরু তার উপরে পা ঝুলিয়ে বসলেন। গুরুদেবও বসেছিলেন পাশে, বললেন কিছু। টেনিস কোর্টে ছেলেরা মেয়েরা নাচল, গাইল। অন্তরঙ্গ একটা আবহাওয়ায় সব হল।

রাত্রে শোবার আগে ঘর অবধি যখন সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। কমলা নেহরু হেসে বললেন, আজ বসন্ত পঞ্চমী— আমাদের বিবাহের দিন।

সকল সংবর্ধনাই আম্রকুঞ্জে হয়, এটা কেন উত্তরায়ণে হল— কারণটা এখন আর মনে নেই।

এবারে পণ্ডিতজী আমাদের কাছে থাকবেন, আমার তো খুব আনন্দ। তাঁর কাপড়-চোপড় ঠিক করে গুছিয়ে রাখি, যখন যেটা দরকার হাতের কাছে এনে দিই ; ঘরের লোকের মতো তাঁকে কাছে পাই।

মাদাম চিয়াং কাইশেক— চীনের সংস্কৃতির যেন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। চলায়-বলায় সাজে আচরণে কোথাও খুঁত নেই। কথা যা বলছেন সকলের সঙ্গে মাদামই বলছেন, চিয়াং কাইশেক চুপ করে থাকেন। ধীর গম্ভীর ভাব, অথচ নীরব চোখ নয়। সব-কিছুতেই আছেন যেন।

চীনদেশে তখন বোধ হয় কিছু গোলমাল শুরু হয়েছে— পণ্ডিতজীর সঙ্গে মাদামের অনেক কথাবার্তা হত। উদয়নে সামনের বসবার ঘরে বেশ রাত অবধি তাঁরা কথা বলতেন। আমার স্বামী ও অন্যান্যদের সঙ্গে আমিও বারান্দায় বসে থাকতাম, পণ্ডিতজীর কখন কী দরকার হয়— তিনি শুতে এলে পরে ঘুমোতে যেতাম।

চিয়াং কাইশেক এসেছেন, গোটা আশ্রমে সেই উত্তেজনা। গুরুদেবের পরে এই রকম উত্তেজনাময় সময় বার-কয়েকই মাত্র এসেছে।

শ্রীনিকেতনের শান্তিনিকেতনের সব-কিছু তাঁরা ঘুরে ঘুরে দেখলেন, কোনোটা বাদ দিলেন না। চলার সময়ে সর্বক্ষণ দেখেছি চিয়াং কাইশেক অতি যত্নে মাদামের বাহু ধরে চলতেন— যেন নিজের উপরেই স্ত্রীর ভারটা নিতেন। কে একজন বললেন, মাদামের একপায়ে একটু জোর কম, তাই মার্শাল সাবধান থাকেন।

আশ্রমের ছাতিমতলার বেদী আগে অন্য রকম ছিল। মহর্ষির আমলের বেদী ভূমির উপরেই ছিল শ্বেত পাথরের আসনখানি পাতা, পিঠের দিকে উঁচু ফলকে লেখা— 'তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।' এই বেদীটি ভালো করে বাঁধাবার কথা চিন্তা করা হচ্ছিল— টাকার অভাব। মাদাম সেই টাকা দিলেন— বোধ হয় চল্লিশ হাজার টাকা। চার দিক অনেকখানি উঁচু করে বাঁধিয়ে তার উপরে বেদী বানানো হল ছাতিমতলায়। অবশ্যি পরে। চিয়াং কাইশেক সোনার ইঁট দিলেন বিশ্বভারতীকে উপহার। যাবার দিন পুরাতন লাইব্রেরির সামনে তাঁদের বিদায়-সংবর্ধনা হল— লাইব্রেরির উঁচু বারান্দায় তাঁরা দাঁড়ালেন, আশ্রমবাসীরা গৌরপ্রাঙ্গণে সমবেত হলেন, 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানটি গাওয়া হল, তাঁরা সদলে সেখান থেকেই মোটরে উঠলেন।

এরই কিছু পরে চীন দেশের গোলমাল চরমে উঠল। চিয়াং কাইশেক ও মাদাম অনেককে নিয়ে দেশ ছেড়ে ফরমোসায় চলে গেলেন। শুনে বড়ো দুঃখ লেগেছিল মাদামের জন্য। এই সেদিন এত কাছ থেকে দেখলাম, এতবার সেই মুখে হাসি ফুটেছে, আজ তাঁর কী অবস্থা! মানুষকে মানুষ হিসাবেই পেতে প্রাণ চায়, রাজনীতি দিয়ে নয়।

এই অল্প একটু দেখা, অল্প একটু জানা— এইটুকুর জোরেই কতকাল ধরে ভেবেছি, আহা! যাঁরা নির্বাসনে গেছেন, আবার তাঁরা ফিরে আসুন আপন দেশে। কিন্তু আজো তা হয় নি— আর কি হবে?

বন্ধু চীনদেশ ভারতের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। 'রেড্ চায়না' হল। প্রফেসর তান এ আঘাতে ভেঙে পড়লেন, কিছুকাল তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারতাম না আমরা। এ যেন তাঁর সাধনার সিদ্ধির মুখে বজ্রপাত হল। ধীরে ধীরে তিনি সামলে উঠলেন। প্রাণে প্রবল বিশ্বাস জেগে রইল— একদিন ভারত চীন আবার বন্ধু হবে, আবার দুই দেশ 'ভাই' বলে আলিঙ্গন করবে।

মাও সে তুং প্রফেসর তানের সহপাঠী— বন্ধুও এক কালের। মাও সে তুঙের গল্প শুনি প্রফেসরের কাছে। মাও সে তুঙের এক দিকে যেমন রাজনীতি, অন্য দিকে ছিল কবিত্বে ভরা মন। প্রকৃতির সকল রসের স্পন্দন তাঁর অন্তরে সুর তুলত। প্রফেসর হাসেন আর বলেন— একদিন আমরা স্নান করছি কুয়োর ধারে, আকাশে মেঘ করল— বৃষ্টিও পড়তে লাগল। সামনে একটা ভাঙা পিলার মতো ছিল— মাও সে তুং দৌড়ে তার উপরে উঠে গেল— ভালো করে মেঘ বৃষ্টি দেখতে। উঠে সেখানে দাঁড়িয়েই উল্লাসে দু হাত তুলে নাচতে লাগলেন। তাঁর খেয়ালেও নেই, যে, অঙ্গে তাঁর কোনো বস্ত্রখণ্ড নেই।

মাও সে তুং-কে ভালোবাসতেন প্রফেসর, আবার ঝরঝর করে চোখের জলও পড়ত তাঁর— দেশের দশের নানা অবস্থার কথা কল্পনা করে।

তার পর এও শান্ত হল। ভারত 'রেড্ চায়না'কে স্বীকৃতি দিল। পণ্ডিতজী গেলেন চীনে, চু এন লাই এলেন ভারতে। 'হিন্দি চিনি ভাই ভাই' হল, সকলের মুখে হাসি ফুটল।

চু এন লাই এলেন শান্তিনিকেতনে। বিশেষ একটা ব্যক্তিত্বপূর্ণ হৃদয়বান পুরুষ। হাসি গল্পে আচরণে জয় করে নিলেন সকলকে। সহজভাবে মিশলেন সবার সঙ্গে। যেদিন শান্তিনিকেতন হতে যান— আমাদেরও কলকাতায় আসবার

কথা, জোর করে সবাইকে তুলে নিলেন ট্রেনে নিজের কামরায়। প্রফেসরের সঙ্গে তান ওয়েন, চামেলিও এসেছিল স্টেশনে 'সি অফ' করতে। চামেলি তানওয়েন-কেও হাত ধরে তুললেন কামরায়। খালি পায়ে এসেছে তারা স্টেশনে, খালি পায়ে আমরা অনেকেই থাকি আশ্রমে, জুতোর তত প্রয়োজনবোধ রাখি না, কিন্তু শহরে কি করে খালি পায়ে চলা যায়? পরনে তাদের মিলের সাদা শাড়ি শুধু। দ্বিতীয় বস্ত্র সঙ্গে নেই, নেই জামা জুতো পেটিকোট সাবান চিরুনি টুথব্রাশ। তান-ওয়েন, চামেলি করুণ মুখে তাকায় আমার দিকে। স্বামী হাসছেন কাণ্ড দেখে।

চু এন লাই বুঝলেন। সঙ্গে তাঁর অতি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিই ছিলেন কয়েক-জন—তাঁদেরই একজনকে বললেন, এমব্যাসিতে নিয়ে এদের তুলতে, আর, সব-কিছু গুছিয়ে দিতে। যেন কোনো অসুবিধা না হয় দুটি বোনের।

শান্তিনিকেতন থেকে হাওড়া এলাম যেন হু হু করে। সারাক্ষণ চা, বাদাম, কেক, মিষ্টি, নোন্‌তা— হরেক রকম খাবার খেতে খেতে। সবাই মিলেই খাচ্ছি হাসছি গল্প করছি। তারি মধ্যে চু এন লাই বারে বারে মুখ তুলে বাইরের মাঠ-ঘাট দেখেছেন। বললেন, এখানে মাটি খুব ভালো, মাঠ আর পাহাড় একসঙ্গে আছে। আমাদের দেশে তা নেই।

সেদিনের ট্রেন জার্নি ভুলবার নয়। ভুলবার নয় চু এন লাই-এর সহজ আন্তরিকতা। মেয়ে-দুটিকে কত সহজে কত স্নেহে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। অনেক বিশেষ বিশেষ ভূমিকা আছে চু এন লাই-এর কিন্তু তাঁর এই ভূমিকাটি যতখানি হৃদয়গ্রাহী ঘটনা— তার তুলনা কম।

মাদাম চিয়াং কাইশেক, চু এন লাই ওঁরা এসেছিলেন গুরুদেব চলে যাবার পর। গুরুদেব থাকতে এসেছিলেন জাপানী কবি নোগুচি— সেই বোধ হয় বিদেশীদের মধ্যে শেষ। আম্রকুঞ্জে তাঁর সংবর্ধনা হল। মনে আছে মাটির বেদীতে নোগুচি পিছন দিকে পা মুড়ে বসেছিলেন। আম্রকুঞ্জের আলোছায়ায় যেন স্থির একটি মূর্তি। বড়ো সুন্দর লাগছিল দেখতে।

অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, রবিকা'র পরে যাঁরা যাঁরা আসছেন আশ্রমে, যে-যে উৎসব অনুষ্ঠান হচ্ছে, তা সব লিখে রাখো ; পরে খুব দরকারি জিনিস হবে। কিন্তু তা আর লিখে রাখা হয় নি— সব-কিছু নিয়ে যেন ভেসে চলে এসেছি, কোনো চড়ায় গিয়ে একটু থামি নি, একটু রোদ পোহাই নি। দোষ করেছি।

আজ আপনজন নেই পাশে, নেই প্রিয় সঙ্গী-সাথী। নেই তাঁদের হাসি কল্লোল। মনে মনে একাকী ঘুরেও বেড়াচ্ছি আশ্রমের মাটিতে ঘাসে। মাথার উপরে দিনের আকাশ, রাতের আকাশ ; সেখানে আলো আছে মেঘ আছে, চন্দ্রতারাসূর্য আছে, তারা কেউ কারো জন্য একটু থামে না— হাত বাড়িয়ে একটু ডাকে না কাছে। বলে না, আয় আয়— আমার কাছে বসে একটু জিরিয়ে যা। ধরার মাটি আমার মায়ের কোল, যেখানে ইচ্ছে গড়াগড়ি দিই— ধুলো মাখি ; কেউ ঠেলে সরিয়ে দেয় না।

আশ্রমের রাঙামাটিতে ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়াই, আপনজনের স্পর্শটুকু ফিরে ফিরে অনুভব করি। এই তো আমাদের সেই শিমুল গাছ— সেই মালতীলতা। অনেকটা জীর্ণ হয়ে এসেছে। এই শিমুল গাছের জন্য কী ব্যথাই না পেয়েছি এক-বার। কোনার্কের সামনের লাল বারান্দা শিমুল গাছের তলা পর্যন্ত এগিয়ে আসা, এই বারান্দায় আমরা ঘুমোই শীত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ— সকল ঋতুতেই। বর্ষাকালে বৃষ্টির ছাট আসে— মশারি ঘিরে কম্বল টানিয়ে দিই, তবু ঘরে ঢুকি না। ঘুমের মাঝে এ পাশ ফিরি, ও পাশ ফিরি— চোখ মেলি, রাতের আকাশে শিমুল গাছকে দেখি। এ দেখার একটা অভ্যেসই আমার। রাতে কতবার যে শিমুল গাছটিকে দেখি, সকালে চোখ মেলেও তাকে দেখি প্রথম। এ এক একান্ত মনের গোপন ছোঁয়াছুঁয়ি আমার সঙ্গে তার।

একদিন রথীদা জানালেন যদি আমরা আওয়াগড়ের বাড়িতে গিয়ে থাকি তবে আত্মীয়-বন্ধু ইত্যাদি যাঁরা হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়েন তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা কোনার্ক-এ করতে পারেন।

স্বামী সান্ত্বনা দিলেন, আওয়াগড়ের বাড়ি বড়ো বাড়ি, সাজানো-গোছানো বাড়ি, কত সুন্দর তার চারি দিক।

তাই সই। কোনার্ক ছাড়তে হবে? হবে। কিন্তু এই শিমুল গাছ? একে ছেড়ে থাকব কি করে?

সে রাত্রিতে সারারাত ঘুমতে পারলাম না। কেবলই শিমুল গাছটিকে দেখছি। বুকের ভিতর একটা বিশেষ বেদনা কাতর করে তুলল আমাকে। ছদিন বুকভরা

এ যন্ত্রণা নিয়ে জিনিসপত্র গোছাতে লাগলাম আর ক্ষণে ক্ষণে বাইরে এসে শিমুল গাছটিকে দেখতে থাকলাম। মাত্র দুদিনই কষ্ট পেলাম। রথীদা বললেন, তাঁদের প্ল্যান বদলে ফেলেছেন। ছাড়তে হবে না কোনার্ক।

গাছও একদিন পর হয়ে যায়। তখন আমরা দিল্লিতে থাকি। কোনার্ক ছেড়েছি, জিৎভূম গড়েছি। বছরে বার তিন-চার আসি আশ্রমে। একবার এসে এলাম শিমুল গাছটির কাছে। একাকী এলাম। তলায় দাঁড়িয়ে মুখ তুলে তাকালাম, ও পাশে এ পাশে গিয়ে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে দেখলাম, কই আমার সেই শিমুল গাছ কই? এ যেন কেমন পর পর ভাব। ক্ষুব্ধচিত্তে মাথা নিচু করে পায়ে পায়ে চলে এলাম সেখান থেকে।

কেউ পর হয়ে যায়, কেউ তারুণ্যে উছলে ওঠে, চিনতে গিয়ে অবাক হই, কেউ বার্ধক্যে এসে থমকে থাকে কিছুটা কাল। এই তো গোয়ালপাড়া যাবার পথে ডানহাতি এই সেই খেজুর গাছটি— বয়সের চাপে হেলে পড়েছে এক দিকে। আহা, এর পাশে সেই তাল গাছটি আর নেই। বাজ পড়েছিল কি কোনোদিন এর উপরে? বৃদ্ধ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় রোজ এই পর্যন্ত আসতেন প্রাতঃভ্রমণে। এসে তাল গাছের গায়ে হাতের ছড়িখানা দিয়ে মৃদু আঘাত করতেন, বলতেন, কি, ভালো আছ তো? এখান থেকেই আবার তিনি ঘরের দিকে ফিরে যেতেন। আমরা দেখে হাসতাম।

পুকুর-পাড়ে বৃদ্ধ বটবৃক্ষ, অতিথিশালার পাশে অতি পুরাতন দেবদারুতলা দিয়ে যেতে ঘাটশিলায় শিশুকালে দেখা বকুল গাছের অন্ধকার তলাটার কথা মনে হত— আর সেই ভয় ভয় ভাবও আসত কিছুটা দিনে-দুপুরে। ছাতিমতলায় কয়েকটাই ছাতিম গাছ ছিল— সেই ছাতিম গাছ বেয়ে মোটা মালতীলতা উঠেছে উপরে। সেই লতায় বসে দোল খেতাম কত। তখন ছাতিমতলা বাঁধানো হয় নি, মাটির উপরে আসনখানি পেতে রাখার মতো ছিল সেই শ্বেতপাথরের ছোটো বেদীখানা। পরে মাদাম চিয়াং কাইশেক টাকা দিলেন, বড়ো করে উঁচু করে বাঁধানো হল বেদী— ছাতিমতলায়। 'ছাতিমতলা' বলতে এই বেদীই বুঝি আমরা— যেখানে মহর্ষি-দেব বসে উপাসনা করেছিলেন।

এই ছাতিমতলার পাশে সেই দোল-খাওয়া মোটা মালতীলতাটি নেই এখন। ছাতিম গাছও কত শীর্ণ হয়ে আছে। হবেই তো— বয়স হয়েছে কত।

এরা যদি কথা বলতে পারত— কত কাহিনী বলত। যুগ যুগ ধরে কত লোক

আসত, এদের ঘিরে বসত, কত কথা শুনত। কত দেখেছে, কত শুনেছে এরা— কত-না ঝড়ঝঞ্ঝা সয়েছে। মানুষ কতটুকু শক্তি রাখে ধরবার? মানুষ যা বলে তা তো অসমাপ্ত কথা।

শালবীথি বকুলবীথি— তারাও তো আমাদের চেয়ে বয়সে কত বড়ো— কত জানে।

এই বকুলবীথির তলায় মাটির বেদী হল— এই তো সেদিনের কথা। শিক্ষকের বেদী ঘিরে ছাত্রদের বেদী, ক্লাস হত এখানে, এখনো হয়।

গুরুদেব যখন যা বলতেন আশ্রমের সবাইকে একসঙ্গে ডেকেই বলতেন। কত সময়ে মন্দিরে ভাষণ দেবার সময়ও আশ্রমবাসীর নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করে তার সমাধানের পথও বাতলে দিতেন। কোনো কিছু ব্যাপার উপলক্ষ করে বা কাউকে উল্লেখ করে বলতেন না; কিন্তু বলতেন যখন তখন যেজন্য বলা, যার জন্য বলা— মনে মনে যে যার ঠিকই বুঝতে পারতেন এবং সেই বুঝতে পারা নিয়েই যা সংশোধন হবার হয়ে যেত।

সামান্যতম ত্রুটিও ছিল ত্রুটি তাঁর কাছে। একদিন এই রকমই কিছু ত্রুটি ঘটে থাকবে; গুরুদেব উদয়নে সবাইকে ডেকে সকলের একতার জন্য ছাত্র-শিক্ষক মিলেমিশে কাজ করবার জন্য, আশ্রম সম্বন্ধে আপন ভাব আনবার জন্য অনেক কিছু বললেন। সকলের মনেই একটা ব্যগ্রভাব জাগল, মন দেওয়া তো যার যার মনের কাজ, গঠনমূলক কী কাজ করতে পারি আমরা? উপেনবাবু তখন শিক্ষাভবনের ছাত্র, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নই করলেন। গুরুদেব বললেন, আশ্রমকে তোমরা সাজাবে, তাকে সুন্দর করবে। নিজের হাতে গাছ লাগাবে, তার পরিচর্যা করবে। যখন শিক্ষা শেষ করে চলে যাবে পরবর্তী ছাত্রদের সেই পরিচর্যার ভার দিয়ে যাবে। পরে যতবার আসবে আশ্রমে, গাছগুলিকে দেখে কত আনন্দ পাবে, নিজের বলে তাদের প্রতি একটা গভীর স্নেহ জাগবে। গাছতলায় ক্লাস হয়, হয়তো এখানে-ওখানে মাটির বেদী তুললে। কি, না, আমরা করেছি। আশেপাশের গ্রামের ছেলেদের অবসর সময়ে গিয়ে পড়ালে। তারাও শিক্ষিত হতে থাকল, তোমাদের দান বাইরেও ছড়াতে লাগল।

পরদিন থেকে উপেনবাবুর নেতৃত্বে সব বিভাগের ছাত্রছাত্রী— যাদের যখন অবকাশ, একত্র হয়ে মাটি কেটে মাটির ঝুড়ি হাতে কোমরে বয়ে বকুলতলায় এনে ফেলতে লাগলাম। মাটি কাটা হচ্ছে, মাটি এনে ফেলা হচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে গান

চলছে, 'আমাদের শান্তিনিকেতন, সে যে সব হতে আপন।' মাটির বেদী তৈরি হল, শিক্ষক বসবেন, ছাত্ররাও বসবে সামনে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে। বেদী হচ্ছে — বেদী হল ; মনে হল না-জানি কী বিরাট ব্যাপার হল।

আশ্রমের ভিতরে আড়াআড়ি পথটার নাম 'নেপাল রোড', নেপালবাবু করিয়েছিলেন ছাত্রদের নিয়ে। লাইব্রেরির সামনের আঙিনার নাম 'গৌরপ্রাঙ্গণ', গৌরদা করিয়েছিলেন এই ভাবে।

রান্নাবাড়ির সামনে চৌমাথার মোড়ে নন্দদা করলেন ছাত্রদের নিয়ে মাটির তৈরি 'চৈতী', এটি হল অবশ্য সব দিক দিয়ে সুন্দর, দেখবার মতো বস্তু। মাটির দেয়ালের মাথায় কুঁড়েঘরের চালের নক্‌শায় মাটি দিয়ে তৈরি চাল, কাঁচের পাল্লা-দেওয়া মাঝখানে খুপরি একটু ঘর। এই ঘরে নন্দদা এনে রাখলেন কলাভবনের মিউজিয়াম থেকে একটি শিল্পনিদর্শন। বললেন, প্রতি সপ্তাহে বদলে দেওয়া হবে। চার বেলা ছাত্রছাত্রীরা রান্নাঘরে খেতে আসে, আসতে যেতে দেখবে তারা। দেখতে দেখতে তাদের চোখ খুলবে। ভালো জিনিস দেখতে শিখবে।

কালো মাটি সাদা মাটি দিয়ে নিকোনো চৈতীটি অপরূপ এক সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চৌপথের মোড়ে। দু দিকে বের করা বসবার মতো একটু বেদী, কারণে অকারণে বসি আমরা সেখানে। পাশের বেল গাছের পাতা নড়ে— ছায়া নড়ে চৈতীর গায়ে। চৈতী হাসে।

এই চৈতী দেখেই গুরুদেবের মনে জেগেছিল মাটির বাড়ি তৈরির কথা। সুরেনদাকে ডেকে যখন প্রথম প্রস্তাব করলেন, বললেন, ঐ তো ছেলেদের তৈরি মাটির চৈতী সুন্দর দাঁড়িয়ে আছে, জলে ঝড়ে কিছু হচ্ছে না। এটা না-হয় আর-একটু বড়ো হবে— এ বই তো নয়? ছাদটাও মাটির হওয়া চাই কিন্তু। আলকাতরা তুষ না-হয় একটু বেশি করে মিশিয়ে দেবে, আর ঢালু রাখবে জলটা যাতে না বসে ছাদে। বৃষ্টি হলে সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে যাবে ছাদ বেয়ে।

আর আমাদের আম্রকুঞ্জ— এটি একটি চিরন্তন স্টেজ আশ্রমের। এ স্টেজ সাজাতে মানুষের হাতের প্রয়োজন হয় না। এ আপনিই সেজে থাকে, ঋতুতে ঋতুতে নিত্য নব নব সাজে সেজে থাকে। আমের মুকুলে চিকন সবুজে ঝরা পাতার হলুদ রঙে সে আপনাকে সাজিয়ে রাখে। আলো-ছায়া তার তলায় তলায় আলপনা আঁকে।

কত কালের আম্রবৃক্ষগুলি, কতকাল ধরে প্রৌঢ়ত্বে এসে যেন ঠেকে আছে।

এর আঁকাবাঁকা গুঁড়ি, প্রসারিত শাখা, ঝাঁক ঝাঁক পল্লব, পাখির কাকলি, চঞ্চল হাওয়া— সব মিলিয়ে এই আম্রকুঞ্জ আশ্রমের সকল উৎসবের আবাহন স্থল। আশ্রমে বিশেষ বিশেষ গুণীজ্ঞানী ব্যক্তি এলে এখানেই তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হত। দৈবাৎ যদি কোনো কারণে এর ব্যতিক্রম ঘটত মনে হত যেন পূর্ণাঙ্গ হল না অনুষ্ঠানটি। যেমন পণ্ডিত জওহরলাল যেবার প্রথম এলেন এখানে সঙ্গে পত্নী কমলাদেবীও ছিলেন।

পণ্ডিতজীরা ছিলেন না বেশি দিন, সময়ের অভাব, না কী কারণে মনে নেই, উত্তরায়ণে অনুষ্ঠানটি হল, সেদিন গুরুদেব কী বলেছিলেন তা কি ধরে রেখেছি কেউ? বোধ হয় না। বড়ো সহজে কত পেয়েছি, তাই হারিয়েও ফেলেছি কত।

মনে আছে ওঁরা চাতালটার উপরে পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন, বিশেষ করে কমলাজীর সেই ভঙ্গিটি বড়ো মধুর লেগেছিল। জড়োসড়ো কমনীয় একটি ভঙ্গি। গুরুদেব আছেন কাছে, নিজের সেই সংকুচিত ভাব দ্বারা যেন শ্রদ্ধা সম্মান ঢেলে দিচ্ছেন গুরুদেবের প্রতি।

সেদিন সবই হল ; কিন্তু যেন একটা অপূর্ণ ভাব থেকে গেল। কোথায় আমাদের আম্রকুঞ্জ, আর কোথায় এই টেনিস কোর্ট। মনটা খচ্‌খচ্‌ করতে থাকল।

গুরুদেবের শেষ জন্মদিন হল উদয়নের পুব দিকের বারান্দায়। অসুস্থ গুরুদেব, হুইল চেয়ারে করে আনা হল তাঁকে সেখানে। আমরা বসলাম বারান্দার সামনে কাঁকর বিছানো আঙিনার উপরে পাতা শতরঞ্চিতে। শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতনের সবাই এসেছে। সবাই বলছে— আজ গুরুদেবের জন্মোৎসব। এক পাশে বসে গুরুদেবকে দেখছি আর বুকের ভিতর গভীর বেদনা জাগছে, না না, এ হল না, এ হল না ঠিক।

গুরুদেবের জন্মোৎসব পঁচিশে বৈশাখ। আমাদের উৎসবের দিন, আনন্দ-উচ্ছ্বাসের দিন।

আগে হতেই উৎসবের সুর লেগে যায় সবার প্রাণে। পূর্ব দিন আম্রকুঞ্জের তলা নিকিয়ে আলপনা দিয়ে মঙ্গলঘট বসিয়ে বেদী সাজিয়ে রাখা হয়। নন্দদা প্রতিবার নতুন নতুন পদ্ধতিতে সাজান, নতুন রকম আলপনা দেওয়ান। এদিন নন্দদা হাত বুলিয়ে বুলিয়ে মাটির বেদীর ধুলো ঝাড়েন, আসন পাতেন।

গুরুদেব গরদের ধুতি-পাঞ্জাবি-চাদরে সেজে এসে বসেন বেদীতে। শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা তাঁর সামনে অর্ঘ্যথালা রাখে সাজিয়ে। গুরুদেবের গলায় দোলে

গোড়ে মালা। কপালে দেওয়া হয় গোলা শ্বেতচন্দনে আকন্দ ডুবিয়ে তার টিপ। সকলের শ্রদ্ধা প্রণাম ভালোবাসা গ্রহণ করেন তিনি সকল আয়োজনের মাধ্যমে।

গুরুদেব কবিতা পাঠ করেন। প্রায় প্রতিবারই এই দিনে গুরুদেব নতুন কবিতা লিখে আনেন।

গান গায় গাইয়ের দল আর কবিতা আবৃত্তি করেন গুরুদেব নিজে। গুরুদেব থাকতে আর কারো মুখে ভালো লাগত না কবিতা শুনতে। উৎসব নাকি মুখর। কিন্তু এ উৎসব-অনুষ্ঠান ছিল শান্ত সুগম্ভীর অথচ পরিপূর্ণ আনন্দে ভরপুর। যেন নটরাজের নৃত্যের স্থির গম্ভীর লয়।

আমার বিয়ের পরে এইদিনটিতে আমি নিজেকে বড়ো সৌভাগ্যবতী মনে করতাম। ভোর রাত্রে উঠে স্নান করে ধূপ জ্বালিয়ে ফুল হাতে নিয়ে গুরুদেবের কাছে আসতাম। ততক্ষণে গুরুদেব দিনের কাজে তৈরি হয়ে বাইরে এসে বসেছেন— আমি প্রণাম করতাম। পরে ধীরে ধীরে আরো অনেকে আসতেন।

পয়লা বৈশাখ। নববর্ষের আগের দিন চৈত্র মাসের শেষ সন্ধ্যায় 'মন্দির' হত— এখনো হয়। চৈত্রের এই সন্ধ্যায় গান হত ; 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো'। পলকে যেন মনটা নাড়া খেয়ে জেগে উঠে দাঁড়াত। তার পর যখন গাইত : 'তাপসনিশ্বাস বায়ে, মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে, বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক্ যাক্ যাক্' যেন সব ঝেড়ে ফেলে শুচি-শুদ্ধ হয়ে উঠতাম। মন্দির-শেষে দেহমনব্যাপী ধ্বনি উঠতে থাকত— 'মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা' দু হাতে সব ঠেলে ফেলে দিতাম— সব সব— সব 'সুদূরে মিলাক'। এত হালকা এত পবিত্র মনে হত এই সন্ধ্যায়— নববর্ষের জন্য আর নতুন করে প্রস্তুতির কোনো প্রয়োজন হত না। আজও না।

এই চৈত্রের শেষ সন্ধ্যার মন্দিরটি আমার অতি প্রিয় মন্দির।

'মন্দির' কথাটি কি করে আমাদের মধ্যে চালু হল বলতে পারি না। শুনে এসেছি এইভাবে, বলেও এসেছি এইভাবে। মন্দির বলতে আমাদের উপাসনা-মন্দির, সংগীত ভাষণ মন্ত্রপাঠ সব মিলে কথাটিই 'মন্দির'।

মন্দিরে সমবেত হবার ঘণ্টা পড়ে এক দুই তিন— তিন-তিনটে করে। আশ্রমে তো অনেক ঘণ্টাই পড়ে, ক্লাসের ঘণ্টা, ছুটির ঘণ্টা, খাবার ঘণ্টা, শোবার ঘণ্টা কত রকমের ঘণ্টা। কিন্তু মন্দিরের এই ঘণ্টার ধ্বনিই আলাদা। যেন সজাগ করে দেয় ধ্বনি।

নববর্ষের দিন গুরুদেব মন্দিরে আসেন। মন্দিরের বাইরের দিকে চারি দিক ঘিরে কয়েক থাক সিঁড়ি। ভিতরে শ্বেতপাথরের একটি জলচৌকির উপরে গুরুদেব বসেন, সামনে আর-একটি শ্বেত পাথরের জলচৌকি থাকে— একটু ছোটো। গাইয়ের দল বসেন ভিতরে, আর যাঁরা জায়গা পান তাঁরাও বসেন, বাকিরা বসেন চারি দিক ঘেরা সিঁড়ির উপরে। মন্দিরের ভিতরে গুরুদেবের সামনে মেঝেতে আঁকা থাকে আলপনা। এ দিনের আলপনা বিশেষ ভাবে বিশেষ যত্ন নিয়ে আঁকা।

মন্দিরের পরে গুরুজনদের সবাইকে প্রণাম করি ছোটোরা। এই প্রণাম-পর্ব শেষ হতে বেশ সময় লাগে। দু পা এগিয়ে যেতে-না-যেতেই থেমে যেতে হয় বড়োদের, একদলের পর হুড়হুড় করে আর-এক দল এসে প্রণাম করে। ছোটো বড়ো— হাসি-মুখ সকলের।

মন্দির থেকে সবাই আসি বকুলবীথিতে। আজ সবার জলযোগ এখানে। সারি সারি বসে যাই গাছতলায় শালপাতার থালা সামনে নিয়ে। মুগের জালা, শাঁখ-আলু শশা তরমুজ ফুটির টুকরো, একটি করে পানতোয়া আর মাটির গেলাসে এক গ্লাস ঘোলের শরবত। এ তো জলযোগ করা নয়— আনন্দের ফোয়ারা। এ আনন্দ ধরে রাখা যায় না, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অনেকখানি জুড়ে হাওয়া মাটি সিক্ত করে রাখে।

আনন্দ-উজ্জ্বল ভরা মন নিয়ে এবারে আমবাগানে জড়ো হই। গুরুদেব কবিতা পড়েন, গান হয়। প্রাণের ভিতরে এক পূজা সমাপন হয়। এ পূজার ঘর আকাশ আলো বাতাস মাটি নিয়ে বিরাট ব্যাপ্ত।

নববর্ষ আমাদের নতুন করে জন্ম দেয়।

দেশে যদি কোনো বছর অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ হল, যদি পঁচিশে বৈশাখের আগেই আশ্রমে গরমের ছুটি দিয়ে দিতে হল, তবে সে বছর এই নববর্ষের দিনেই পঁচিশে বৈশাখের উৎসব পালন করতে হত। পরে একেবারে শেষের দিকে পয়লা বৈশাখেই পঁচিশে বৈশাখের উৎসব মিশে গেল। গরমের দাপটে পঁচিশে বৈশাখের আগেই আশ্রম ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে, ছাত্ররা অনেকেই বাড়ি চলে যায়, নানা কারণে এই ব্যবস্থাই করতে হল।

যতকাল গুরুদেব সুস্থ ছিলেন 'মন্দির' তিনিই নিতেন, আর নিতেন এই রকম গরদের ধুতি-পাঞ্জাবি পরে চাদর গলায় ঝুলিয়ে। এই সাজ ছাড়া মন্দিরে কখনো আসেন নি তিনি।

আবতুল গফ্‌ফর খান এলেন। সুউচ্চ সুগঠিত দেহ। সুদর্শন পুরুষ। টকটক্‌ করছে অঙ্গের বর্ণ। পরনে সাদা সালোয়ার পাঞ্জাবি। এলেন যেন মনে হল দেবদূত এলেন। খুব ভালো লেগেছিল তাঁকে। সবার সঙ্গে মিশলেন, হৃদ্যতায় বশীভূত করলেন সবাইকে।

তাঁর বড়ো পুত্র গনিকে এখানে পাঠিয়েছিলেন কলাভবনে। গনিও পিতার মতোই দীর্ঘ সুপুরুষ যুবক। আমরা গনি বলেই ডাকতাম। পেশোয়ারী ছেলে, গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। সে বসে বসে 'ওয়াশ' 'টেম্পারা'র ছবি করবে কি? দু দিনে অধৈর্য হয়ে উঠল। গনি তুলি কাগজ ছেড়ে মোটা দেখে বড়ো বড়ো কাষ্ঠখণ্ড নিয়ে বসে গেল দু হাতে দুই হাতুড়ি বাটালি নিয়ে। দমাদ্দম সে বাটালির মাথায় হাতুড়ি পিটত বড়ো বড়ো কাঠের চিলতে কেটে ফেলত, আর হাসত। হাসি মুখ ছিল গনির। নন্দদা বললেন, গনি এটাই করুক, কাঠ কাটুক, পাথর ভাঙুক। আমাদের ছেলেরা এ কাজে এগতে চায় না। এইভাবে কাঠ কেটে গনি অনেক কিছু করেছিল। ফিনিশিং-এর দিকে তত মন ছিল না, গড়নটি ভাবটি এসে গেলেই সে খুশি হয়ে সেটা ছেড়ে আর-একটা কাঠ ধরত। নন্দদা খুব সন্তুষ্ট ছিলেন তার কাজে।

গনির একটা পার্সোনালিটি ছিল কাজে ব্যবহারে হাসিতে কথায় সবেতেই। কিছুকালের মধ্যে সে ছাত্রদের নেতৃত্বের ভূমিকা আপনা হতে পেয়ে গেল।

সে সময়ে একটা ঘটনা ঘটেছিল— গনির কথা তাই মনে পড়ছে বড়ো উজ্জ্বল হয়ে।

তখন হাঙ্গেরি থেকে এক সাহেব এলেন, নাম মিস্টার ফাব্রি। আর্ট সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান আছে বলে রটনা। তিনি এখানে থাকবেন, কলাভবনে লেকচার দেবেন। আর্ট সম্বন্ধে অনেক কথা শোনাবেন।

গুরুদেব যেমন সবাইকে আহ্বান করেন, এঁকেও করেছেন।

ছাতিমতলার মুখোমুখি চৌমাথার কোণে খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটির বাড়ি ছিল একটা। আগে টাকার সাহেব থাকতেন এ বাড়িতে— ইংরাজি পড়াতেন ছাত্রদের। মিসেস টাকার দেখতে তেমন সুশ্রী ছিলেন না; কিন্তু খুব 'মা-মাসিমা' ভাব ছিল তাঁর মধ্যে। আমাদের খুবই ভালো লাগত তাঁকে। সারাক্ষণ সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত থাকতেন। মিসেস টাকারের কথা মনে এলেই মনে পড়ে তিনি ব্যস্ত ভাবে এ-ঘর ও ঘর করছেন— হাতে এঁটো প্লেট বা ময়লা কাপড় সাবান—

একটা-না-একটা কিছু। রান্না করতেন চমৎকার— বিলিতি রান্না। এটা-সেটা ভালোমন্দ কিছু রাঁধলেই ডেকে খাওয়াতেন। বোধ হয় দুটি কি তিনটি পুত্র ছিল তাঁদের— অতিশয় দুষ্টু। পথে ঘাটে গাছে চালে সর্বত্র তাদের দেখা যেত। মা অস্থির হয়ে উঠতেন। আর টাকার সাহেব হাসতেন। টাকার সাহেবের মুখে মজা লাগা একটু হাসি লেগেই থাকত— তা সবারই জন্য। টাকার সাহেব লং-ক্লথের পাজামা পাঞ্জাবি পরতেন, মিসেস টাকার অবশ্যি গাউন পরেই থাকতেন— তাতে তাঁকে আমাদের একান্ত আপনার বলে মেনে নিতে কোনো বাধা হত না।

এই বাড়ির নাম বহুদিন অবধি— টাকার সাহেব অবসর নিয়ে দেশে চলে যাবার পরেও— অনেকদিন ধরে ছিল টাকার সাহেবের বাড়ি। এখন এই বাড়িটি নেই। মাটির বাড়ি মাটিতে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে— সে-সব দিনক্ষণের কথা মনে আর আসে না। তার উপরে সবুজ ঘাস দেখতে দেখতে চোখেরও একদিন অভ্যেস হয়ে গেল।

এই টাকার সাহেবের বাড়িতে এসে রইলেন ফাব্রি সাহেব।

মিসেস ফাব্রি আর্টিস্ট— অয়েল পেন্টিং করেন— বড়ো ভালো নিরীহ মহিলা। স্বামীকে যেন একটু ভয় ভয় করেন মনে হয়। মিসেস ফাব্রি প্রায়ই আমাকে নিয়ে আশ্রমের আশেপাশে গ্রামে পথে এখানে-ওখানে যেতেন— ওয়াটার কালারে নেচার স্টাডি করতেন। আমার একটা অয়েল পেন্টিংও করেছিলেন বড়ো আকারের একটা ক্যানভাসে। বেশ কয়েকদিন আমাকে সিটিং দিতে হয়েছিল। ফাব্রি পরিবারের সঙ্গে আমাদের বেশ ভাব হয়ে গেল। প্রায়ই আসতেন আমাদের বাড়িতে— মৃন্ময়ীতে। মিস্টার ফাব্রি একটু যেন জেদি প্রকৃতির ছিলেন— সবাই তেমন পছন্দ করত না তাঁকে।

ফাব্রি কাজ শুরু করে দিলেন। সপ্তাহে বা মাসে কয়দিন কলাভবনে এসে লেকচার দিতেন তা আমার নিখুঁত ভাবে মনে নেই। তবে আসতেন, হ্যাভেল-হলে আমরা ছাত্র শিক্ষক সকলে জড়ো হতাম— তিনি আর্ট সম্বন্ধে লেকচার দিতেন। যেদিন লেকচার দিতে আসতেন— খুব ফরম্যাল সাজে আসতেন, টাই কোট ওয়েস্ট কোট মোজা জুতো— সব টিপটপ থাকত।

এখানে আমাদের একটা রীতি আছে। গুরুজনদের কাছে দেখা করতে এলে অথবা বিশেষ বিশেষ স্থানে ঢুকতে হলে জুতো চটি পরে ঢুকি না আমরা— নন্দন বাড়িতে তো নয়ই। বারান্দায় জুতো খুলে রেখে তবে ঘরে ঢুকি। এ সমীহটুকু

আমরা বিশেষ ভাবেই করি, এটা এখানকার রেওয়াজ। মাটিতে বসে ছবি আঁকা হয়, পথের ধুলোবালি মাড়িয়ে আসা জুতোর নোংরা ময়লা করুক ঘর— এটা এখানে হয় না। এ নিয়ম প্রথম থেকেই চালু হয়ে আসছে। অতিথি-অভ্যাগতরাও এ নিয়ম মেনে চলেন। বারান্দায় জোড়া জোড়া জুতো দেখে তাঁরাও ঘরে ঢুকবার মুখে নিচু হয়ে নিজ নিজ পায়ের জুতো খুলে নেন। বলতে হয় না কাউকে।

ফাব্রি কিন্তু দেখেও দেখলেন না। তাঁকে বলা হল। একদিন দু দিন তিন দিন— পর পর কয়েকদিনই বলা হল। তিনি শুনলেন না কথা। মস্‌মস্‌ করে জুতো পায়েই ভিতরে ঢুকে যেতে থাকলেন। নন্দদা অসন্তুষ্ট হলেন।

গনি বললে, ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করব।

আমরা তখন পর্যন্ত স্ট্রাইক কাকে বলে, কি ভাবে হয় জানি না। একদিন গুঞ্জন শুনলাম, 'আজ স্ট্রাইক হবে'। গনি সবাইকে বলে রাখছে আজ যখন ফাব্রি আসবেন লেকচার দিতে— যদি বারান্দায় জুতো খুলে রেখে ঘরে ঢোকেন তবে তো ভালোই, নইলে আমি যখন উঠে দাঁড়িয়ে অ্যানাউন্স করব এবং ঘর থেকে বেরিয়ে আসব সঙ্গে সঙ্গে সবাই বেরিয়ে পড়বে।

ছাত্ররাও ঘুরে ঘুরে একে অন্যকে জানিয়ে রাখল— সবাই যেন এসো আজ হ্যাভেল হলে।

সবাই এসেছি। দুরুদুরু বক্ষে হ্যাভেল হলে গিয়ে বসেছি। তীক্ষ্ণ নেত্রে এ-দিক ও-দিক তাকাচ্ছি— সেই চরম মুহূর্তটি কখন আসে, কিভাবে আসে। ফাব্রি-দম্পতির সঙ্গে ভাব হয়ে যাওয়াতে মনে মনে তাঁর প্রতি একটু মমতা বোধ করছিলাম। যথা সময়ে ফাব্রি এলেন, যথারীতি জুতো পায়ে মস্‌মস্‌ করে হ্যাভেল হলে ঢুকলেন। নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। মুখ খুলতে যাবেন, লম্বা গনি উঠে দাঁড়িয়ে গড়গড় করে বলে গেল— আমাদের নিয়ম নেই জুতো পরে ঘরে ঢোকা, বারে বারে অনুরোধ করা সত্ত্বেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম করছেন মিস্টার ফাব্রি, সুতরাং আমরা তাঁর লেকচার অ্যাটেণ্ড করব না— ব'লে গনি গটগট করে সবাগ্রে দরজার দিকে গেল, পিছনে পিছনে আমরাও সবাই বেরিয়ে এলাম, শিক্ষকরাও। একবার ভিড়ের পিঠের পাশ দিয়ে পিছন দিকে চেয়ে দেখলাম ফাব্রির মুখে কেমন একটা ভ্যাবাচাকা ভাব।

'নন্দন' থেকে বেরিয়ে আমি সোজা উত্তরায়ণে এলাম— প্রায় দৌড়েই। গুরুদেব তখন থাকেন কোনার্কে, গুরুদেব সামনের ঘরে বসে আছেন— কাঁচের মস্ত

স্লাইডিং দরজাটা খোলা— তার পাশে একটা কৌচে। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে গুরুদেবের কৌচের পাশে মেঝেতে বসে পড়লাম। বললাম, গুরুদেব, এই এই হয়েছে, এই এক্ষুনি হল।

আমার বলা শেষ হতে-না-হতে ফাব্রি সাহেবও এসে উপস্থিত। দ্রুত হেঁটে এসেছেন গুরুদেবের কাছে। ফাব্রি যে আসবেন তা ভাবি নি, তাও আবার এত তাড়াতাড়ি। মনে একটু লজ্জার ভাব এল। আমাকে এখানে দেখে আমি যে গুরুদেবের কাছে সব নালিশ করেছি তা বুঝি ধরে ফেললেন। অবশ্যি গুরুদেব যা বুঝবার বুঝে ফেলেছেন। আমি চলে আসব সেখান থেকে, উঠতে যাচ্ছি— আমার একটা হাত ছিল কৌচের হাতলে, গুরুদেব আমার সেই হাতখানার উপর নিজের ডান হাতখানা এনে রাখলেন। একটু চাপ পেলাম। মনে হল আমি এই মুহূর্তে উঠে যাই চাইছেন না তিনি।

ফাব্রি গুরুদেবের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উত্তেজনা অপমানে ভরপুর যা যা বলবার এক নিশ্বাসে বলে যেতে লাগলেন। গুরুদেব সারাক্ষণ মেঝের দিকে দৃষ্টি নামিয়ে রাখলেন। ফাব্রির বলা হয়ে গেলে সেই রকম উত্তপ্তভাবেই চলে গেলেন। গুরুদেব একটি কথাও বললেন না।

কিছু পরে নন্দদা এলেন। আমি চলে এলাম মৃন্ময়ীতে।

নন্দন সম্বন্ধে নন্দদার ভালোমন্দ লাগার ব্যাপার নিয়ে গুরুদেব কিছু বলতেন না, সেদিনও বললেন না।

কয়দিন পর ফাব্রি দম্পতি চলে গেলেন শান্তিনিকেতন ছেড়ে। যাবার আগে দেখা করতে এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে। বললেন, আর কারো সঙ্গে দেখা করব না, কিন্তু তোমাদের কাছে না এসে আশ্রম ছাড়তে পারি না। বিদেশে এসে প্রথম থেকে তোমাদের বন্ধুত্ব পেয়েছি— তা ভুলতে পারব না।

ওদের হাতে কিছু একটা উপহার দিতে হয়— কী দিই, কী দিই। ঘরে সিলোনের ঘাসের তৈরি খুব সুন্দর একটা বেল্ট ছিল, সেটা দিলাম। আর দিলাম সেই রকম ঘাসেরই তৈরি একটা ব্যাগ। যাবার সময়ে সেদিন কঠিন ফাব্রি সাহেবের মুখ যেন একটু নরম নরম দেখলাম।

কিছুকাল পরে শুনলাম মিসেস ফাব্রি আসামে গেছেন— তার পর শুনলাম তিনি একজন বিদেশীকে বিয়ে করেছেন। সুখে আছেন। ফাব্রিও দিল্লিতে আর্ট ক্রিটিক হয়ে ওদিককারই এক ভারতীয় মহিলাকে বিয়ে করে সংসার পাতলেন।

জীবনের শেষ পর্যন্ত দিল্লিতেই ছিলেন। একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল। পুত্রটি ঠিক স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন হয় নি। আমরাও এক সময়ে দিল্লিতে ছিলাম বেশ-কিছু কাল। পার্টি ইত্যাদিতে দেখা হলে ফাব্রি হেসে এগিয়ে আসতেন। পুত্রস্নেহাপ্লুত পিতা পুত্রের হাত ধরে আমার কাছে এনে বলতেন— এই দেখো তোমার এক আন্টি।

ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সঙ্গে একটা ভালো ভাব থাকলেও শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে একটু উত্তাপ ফাব্রি সাহেব ত্যাগ করতে পারেন নি। আমাদের এখানকার আর্ট সম্বন্ধে সমালোচনা লেখার কালে কিছুটা তাপ থাকত তাতে বরাবর।

১৪

জল-ঝড়ের পরদিন প্রভাতকালটি বড়োই সুন্দর। আলো যেন হেসে হেসে ফেরে গাছে মাটিতে।

কাঞ্চন ফুল ফোটা শেষ হয়ে গেছে। লম্বা লম্বা শুকনো শক্ত বীজগুলি দিনভর ফেটে ফেটে ছিটকে পড়ে। জোরে শব্দ তুলে ফাটে, বীজগুলি বহুদূরে গিয়ে পড়ে। এক-এক সময়ে চমকে উঠি যেন দরজা-জানালার কাঁচে ঢিল ছুঁড়ছে কেউ। রাত্রে ফাটে না এরা, ঠাণ্ডা হাওয়ায় নরম হয়ে থাকে। দিনেই যত তেজ এদের।

ঋতুতে ঋতুতে আশ্রমের ফুলগাছগুলি যেন দল বেঁধে মেতে ওঠে। পথ চলতে গিয়ে যেন পাগল হয়ে পড়ি। ঐ ঝোপ থেকে বনজুঁই, বেয়ে ওঠা লতা থেকে মধুমালতী, ও ধারের এ ধারের হাস্নুহানা, চামেলি বনপুলক বনমল্লিকা— আড়াল হতে সবাই যেন সুরভির আবীর ছুঁড়ে মারে মুখে মাথায়। এও যেন এক হোলি খেলা। এর রঙ লাগে না বাইরে, লাগে অন্তরে। চলতে চলতে থেমে যাই, 'এ কার সুবাস?' ও এ বনজুঁই। এ চামেলি, এ বনপুলক। চার দিকে তাকিয়ে খুঁজি কোথায় এরা লুকিয়ে?

আর ছাতিম? বিশালের বিস্তৃতি যে চাই অনেকটা জুড়ে। বনে জানি এক রকমের বৃক্ষ আছে বড়ো বড়ো পাতা, ডালের গায়ে খুদে খুদ ফুল, নাম 'যোজনগন্ধা'। যোজন পর্যন্ত যায় এর সুগন্ধ। কিন্তু ছাতিমফুলের সুতীব্র সৌরভ তাকেও হার মানায়। ছাতিমফুল ফোটে যখন, এর সুরভিত বাতাস অন্য ফুলের সুবাস দু পায়ে দলে যেন ঝড়ের দাপটে ঘুরপাক খায় দিক হতে দিগন্তে। একদিন

অকস্মাৎই এসে পৌঁছয় সংবাদ, বলে উঠি, এই রে, ছাতিমফুল ফুটতে শুরু করে দিয়েছে রে। এইবারে কয়দিন থাকতে হবে এরই অধীনে।

স্বর্ণচাঁপাগুলি মরে গেল গত বছরে, বন্যা আর বৃষ্টির জলে। অবিরত জলের ধারায় এদের গোড়ায় ফাংগাস জন্মায়। মরে যায় এই রোগে। বন্যার সময়ে কলকাতায় ছিলাম, ফিরে যখন এলাম— রিক্‌শায় আসতে আসতে দেখি বাড়ি-বাড়িতে থরথরে মরা পাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্বর্ণচাঁপার গাছগুলি। তারা আর বেঁচে উঠল না।

আশ্রমে নাম-না-জানা বুনো গাছেও কত রকমের ফুল ফোটে। অনেকের নাম দিয়ে গেছেন গুরুদেব— রক্তমুখী, অগ্নিশিখা, সোনাঝুরি, কত কী। কিন্তু এই যে চোখের সামনে ফুটে আছে গাছভরা ফুল, এর নাম বোধ হয় দিয়ে যেতে পারেন নি তিনি। বোধ হয় অনেক পরে এসেছে এখানে। ফাল্গুনের শুরুতেই ফোটে ফুল, গাছে পাতা তখন থাকে না একটিও, ডালে ডালে ফিকে বেগুনি রঙের থোকা থোকা ছোটো ছোটো ফুলে ঠাসা পুরো গাছটিই যেন এই বেগুনি রঙ দিয়ে ঢাকা। বেশ-একটা বিবি বিবি ভাব। ঐ-তো সামনে একটি লাল শিমুলের গায়ে লাগা ঐ একটি গাছ— লালে বেগুনিতে জড়াজড়ি, অপূর্ব এক মিলন দিনের আকাশের গায়ে।

আমার স্বামী একবার গিয়েছিলেন মেদিনীপুরে কাঁকরাঝোরা জঙ্গলে। সেখানে দেখেছিলেন বড়ো বড়ো গাছে বন-আলো-করা রঙ নিয়ে ফুটে আছে বুনোফুল বুনো নাম নিয়ে। নাম গলগলি। স্বামী বললেন, গলগলি নয়, এ স্বর্ণশিমুল। নিয়ে এলেন চারা, লাগালেন জিৎভূমে। ধীরে ধীরে স্বর্ণশিমুল এখানকার বাড়ি-বাড়িতে স্থান করে নিয়েছে। দোলের ঠিক সপ্তাহ দুই আগে হতে ফুটতে আরম্ভ করে। আমাদের শোবার ঘরের পাশে একজোড়া স্বর্ণশিমুল গাছ পাহারাদারের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আজ কয়-বছর। সকালের আলো যখন পড়ে গাছভরা ফুলগুলির উপরে, পিছনে পশ্চিমের নীল আকাশ— হলুদ রঙটা যেন জ্বলে ওঠে। ঐ রূপের বর্ণনার ভাষা পাই না।

গত বছর এদের মাথা দুটো ভেঙে গেল ঝড়ে। এত সুন্দর এত বড়ো ঋজুদেহ গলগলি কি আবার পারব আর-একজোড়া বড়ো করে তুলে যেতে? জিৎভূমের গেটের কাছেও একটি হয়েছে গলগলির গাছ। এরা আপনা হতেই হলে হয় ভালো। লাগাতে হয় না। যত্ন এদের সয় না। ছোটো গাছ, সেই গাছে দেখি

ফুল এসেছে। পাশে ফুটেছে সিঁদুরে পলাশ। দাঁড়িয়ে দেখলাম, ভাবলাম, দূরের বাড়ির কেউ হয়তো পূর্ণরূপে দেখছে এই লাল-হলুদের খেলা যেমন দেখি আমি প্রতিভাদিদির বাগানে টুকটুকে বুগেনভেলিয়ার বুকে হলুদ আলামাণ্ডা ফুলকে। বছরের এই সময়টায় আমি যখন-তখন তাকিয়ে থাকি সে দিকে। অনেকে অনুযোগ করেন— রবীন্দ্রনাথের এ দিকটা দেখেন নি কেন? ও দিকটার কথা বলেন নি কেন?

গুরুদেব আছেন, আমাদের চোখের সামনে আছেন— অতি কাছে আছেন, এই শুধু জানতাম। তাঁকে নিয়ে কোনোদিন লিখতে হবে, তাঁর কী কী দেখে রাখতে হবে জেনে রাখতে হবে, এ-সব মনেই আসে নি কোনোদিন। এমনভাবে ভরে ছিলাম, ফাঁক ছিল না। ফাঁক থাকলে, পারস্‌পেক্‌টিভ্‌ থাকলে তবেই না দেখা যায়। তবে তা দেখা যায় ঐ দূরের ফুল-ভরা গাছটিকেই শুধু। এত বিরাটকে নয়।

আশ্রমে আমাদের ফুলের অভাব হয় না কখনো। যখন কোনো ফুল থাকে না কোথাও, তখন আকন্দ আপন মনে ফুটে থাকে গাছ ছাপিয়ে। নানা ধাঁচে গাঁথা আকন্দের গোড়ে মালাখানি গলায় গুরুদেব যখন বসেন আম্রকুঞ্জের বেদীতে, রাজারাজড়ার মণিহার তুচ্ছ লাগে এ মালার কাছে।

বসন্তকালে পলাশের তলা ছেয়ে পড়ে থাকে সিঁদুর রঙের পাপড়িগুলি। হোলির অর্ঘ্যথালায় আবীর-পলাশের স্তূপ একত্র সাজিয়ে রওনা হয় প্রসেশনের দল কলাভবনের 'নন্দন' বাড়ি হতে। সেই একটি দিন পলাশের ডাল ভাঙলে অসন্তুষ্ট হতেন না নন্দদা। ঝুড়ি ঝুড়ি পলাশ এনে জড়ো করতাম সকলে সেখানে। সামগ্রীর প্রাচুর্য তখন ছিল না আমাদের। নন্দদার নির্দেশ-অনুযায়ী আবীরে-পলাশে কয়েকটা থালা, কিছু ডালা ভরা হত। ছেলেমেয়েরা আজ সবাই বাসন্তী রঙের ধুতি শাড়ি পরত। অর্ঘ্য-থালা কাঁসর-ঘণ্টা-শঙ্খ হাতে নিয়ে প্রসেশনের দল গান গাইতে গাইতে রওনা হত। শ্রীভবনের সামনে দিয়ে শালবীথির ভিতর দিয়ে মাধবীবিতানের তলা দিয়ে দল আম্রকুঞ্জে আসত।

গুরুদেব বসে আছেন বেদীতে, তাঁর সামনে সারি দিয়ে আবীর পুষ্পের অর্ঘ্য-থালা নামিয়ে যে যার জায়গা নিয়ে বসে পড়ল। কোলাহল নয়, কোনো বিশৃঙ্খলা নয়; সংযত পরিবেশ।

গান হল, কবিতা পাঠ হল। বসন্তকে একেবারে কাছে নিয়ে আসা হল। রঙ লেগেছে বনে বনে নয় শুধু, রঙ লাগে বসনে মনে। সব-শেষের গানের সময়ে

নাচিয়ের দল উঠে নাচ শুরু করল গানের সুরে সুরে : আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে। আবীরের থালা হতে মুঠো মুঠো আবীর তুলে নাচিয়ের দল হাওয়ায় ছুঁড়ে দিল, আম্রকুঞ্জের সবুজ আজ হোলির রঙে রাঙা হয়ে উঠল।

এদিন আমরা গুরুদেবের পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করি। পা দুখানি আবীরে আবীরে ঢেকে যায়। তাঁর মুখে লেগে থাকে স্নেহমধুর হাসি।

উৎসব-শেষে গুরুদেব চলে যান উত্তরায়ণে। এবারে আমবাগান জুড়ে ওঠে হোলিখেলার হল্লোড়। শুকনো আবীরে মাখামাখি সবাই। জলে গোলা রঙ খেলা হয় না আমাদের।

দিন্‌দা এ সময়ে আসর জমাবার কর্তা। দিন্‌দা বসতেন মাঝখানে, তাঁকে ঘিরে গান-নাচের জোয়ার বইত। লাল আবীরে ঢাকা প্রকাণ্ড দেহখানি নিয়ে দিন্‌দা যখন বসতেন, গাইতেন, হাসতেন— একটা পূর্ণ স্বাধীনতার আগল যেন খুলে যেত সবার কাছে। কত যে গান হত, কত নাচ নাচত সকলে। মনের স্ফূর্তিতে বাউল গানের সঙ্গে কেউ বাউল হয়ে নাচছে, কেউ লীলায়িত ভঙ্গিতে ধুলোয় আবীরে একাকার করে নাচছে, কেউ বীর পদক্ষেপে বুক ফুলিয়ে নেচে চলেছে : 'বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা।'

এই সময়টুকুতে কিবা নাচে কিবা গানে তাল মাত্রা সুর লয় বলে থাকত না কিছু। দেখে দিন্‌দা হো হো করে হেসে উঠতেন, দর্শকরাও হেসে গড়াগড়ি খেত। আনন্দ-উচ্ছল নাচ— থামায় কে কাকে? প্রাণের আবেগ উজাড় করে দিয়ে নাচের সঙ্গে গান ধরে 'আমার গুরুর আসন-কাছে সুবোধ ছেলে কজন আছে। অবোধ জনে কোল দিয়েছেন, তাই আমি তাঁর চেলা রে।' এ উৎসবের রাজা ছিলেন দিন্‌দা নিজে।

দুপুরের খাবার ঘণ্টা পড়বার সময় হয়েছে, যে যার ছুটল— স্নান করে নিতে। জল কোথায়? এত আবীর ধুতে, চুল সাফ করতে প্রচুর জলের প্রয়োজন। রান্নাঘরের পাশের কুয়ো, পান্থশালার কুয়ো আর নিচু বাংলার কুয়ো— এই তিন-চারটি কুয়োতে যা জল, বাকি কুয়োগুলি শুকিয়ে আসছে, জল তোলা ঠিক হবে না তা হতে। তবু, কিছু দল থেকে যায় এই জলেরই ভরসায়, কিছু চলি শ্রীনিকেতনে 'কালী সায়রের' উদ্দেশে। কালী সায়রে গা ডুবিয়ে জলে ঝাঁপাঝাঁপি করে পুকুরের জলে খানিকটা রঙ গুলে চলে আসি আশ্রমে। দূরকে দূর মনে হয় না, রোদ্দুর মাথায় লাগে না। দু মাইল পথ যেন উড়ে যাই, উড়ে আসি।

সন্ধেবেলায় গৌরপ্রাঙ্গণে হয় বসন্ত পূর্ণিমার উৎসব— নাচ গান। কোনো বিজলি বাতির দরকার হয় না, স্টেজ সাজাবার প্রয়োজন লাগে না। গৌরপ্রাঙ্গণের মাঝখানে খানিকটা জায়গা গোল আকারে চেঁছে লেপে রাখা হয়েছে নাচের জন্য। মাথার উপরে আছে অঢেল ঢালা চাঁদের আলো। বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটে না উৎসবে।

একবার ভানুসিংহের পদাবলী হল বসন্ত-পূর্ণিমায় এই গৌরপ্রাঙ্গণে। নাচের শিক্ষক নবকুমারবাবু করালেন। জ্যোৎস্নার আলোয় এই নৃত্য মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখল সবাইকে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আশ্রম পরিক্রমা করে বৈতালিক দল: চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে উছলে পড়ে আলো।

এ দিন ভোররাত্রেও হয়েছিল বৈতালিক, আশ্রম ঘুরে ঘুরে গেয়েছিল দল: আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, তব অবগুন্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে কোরো না বিড়ম্বিত তারে। —যারা ঘুমিয়েছিল দূর হতে গানের সুর তাদের জাগিয়ে দিল। অনেকে বিছানা ছেড়ে বাইরে এল, পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দলে যোগ দিয়ে সুর ধরল, 'কোরো না বিড়ম্বিত তারে।'

এই শেষ রাত্রে বৈতালিক আর রাত্রি দ্বিপ্রহরের বৈতালিক আশ্রমের প্রাক্তন-প্রাক্তনীদের অতি প্রিয় ব্যাপার। এই বৈতালিককে ছুঁয়ে যেন তারা অনেক আগের দিনগুলিকে হাতের দু মুঠোয় পেয়ে যায়। এখনো যখন ৭ই পৌষে বসন্ত-উৎসবে বর্ষামঙ্গলে পুরাতন ছাত্রছাত্রীরা আসে আশ্রমে, রাত্রে খাওয়া সেরেই তারা ছুটে যায় শালবীথিতে। ভোররাত্রে তৈরি হয় বৈতালিকে গিয়ে যোগ দিতে।

বছর-তিনেক আগে অভিজিৎ সেবার আসতে পেরেছিল ৭ই পৌষের সময়ে। বাড়িতে আরো অনেক অতিথি, সবার ঘুম ভাঙিয়ে ঘরে ঘরে বাতি জ্বালিয়ে সে ঘুরতে লাগল রাত দুটো থেকে, কতক্ষণে সময় হবে বৈতালিকে যাবার। বৈতালিকে যাওয়াটা হতেই হবে। আজও যখন জরার জেরায় যোগ দিতে পারি না বৈতালিকে, মনটা করুণ হয়ে ওঠে, কান পেতে থাকি খোলা জানালা দিয়ে কখন ভেসে আসবে গানের সুরটা। আর সেই সুর ধরে কল্পনায় দেখি দলটা এখন পশ্চিম দিকের মোড়টার কাছাকাছি হয়েছে; এখন গুরুপল্লীর পথ ধরেছে— এই বোধ হয় উত্তরায়ণে ঢুকল তারা।

পরে, অনেক পরে অনেক বসন্ত-উৎসব পার হয়ে গেল, যাই নি। সেই উল্লাসভরা ছুটোছুটি করা মনটাকে যেন পাই না আর।

ঋতু-উৎসবের মধ্যে বসন্তোৎসব আর বর্ষামঙ্গলই প্রধান। বর্ষামঙ্গলের সকালবেলায় হয় বৃক্ষরোপণ উৎসব, সন্ধের হয় নাচগানে বর্ষামঙ্গল।

বৃক্ষরোপণ উৎসব প্রতিবারই সুন্দর থেকে সুন্দরতর হল, নানাভাবে নতুন নতুন রূপ নিল। নন্দদা সুরেনদার নক্শায় একটি চতুর্দোলা, নানা রঙে আভরণে সেই চতুর্দোলা সাজিয়ে চারজন ছেলে উৎসবের সাজে সেজে তা বহন করে নিয়ে চলে। চতুর্দোলায় থাকে একটি চারা গাছ— যা রোপণ করা হবে আজ। আজ বিশেষভাবে এর জন্যই উৎসব। সামনে পিছনে মেয়ের দল চলে শাঁখ বাজিয়ে অর্ঘ্যথালা হাতে নিয়ে। খোঁপায় ঝোলে তাদের নব পত্রপুষ্পের বাহার। নন্দন থেকে আম্রকুঞ্জ কতটুকুই বা পথ। দেখতে-না-দেখতে শেষ হয়ে যায়। অতি মন্থর গতিতে চললেও বেশিক্ষণ টেনে রাখা যায় না প্রসেশনের দলকে। পথের ধারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে দর্শকরা, এটুকু সময়ের জন্য এত জাঁকজমকের চলন দেখে আশ মেটে না তাদের। রঙে সাজে ফুলে পাতায় গানে পথখানি জুড়ে আলাদা এক চলমান সৌন্দর্য।

সব-কিছু নিয়েই ভাবেন নন্দদা। ভাবলেন, একটা নাচের স্টেপ ফেলে ফেলে চলে যদি মেয়েরা, দেখতে সুন্দর দেখায়, সময়ও কিছুটা পাওয়া যায়।

মণিপুরী নাচের শিক্ষক নবকুমারবাবুকে বলা হল। তিনি বড়ো সুন্দর একটা নাচের স্টেপ বের করলেন। তিন-পা এগিয়ে দু-পা পিছিয়ে আসতে হয় এই নাচে। নাচের ভঙ্গিটিও সুন্দর। এই নাচই চালু হয়ে গেল সেই থেকে উৎসবের চলনে চলতে।

সবাই তৈরি। খঞ্জনি করতাল বেজে উঠল, শঙ্খধ্বনি হল। নিশান তোলা চতুর্দোলা নিয়ে সকলে পথে পা বাড়ালো। গান হতে থাকল : 'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে হে প্রবল প্রাণ। ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে হে কোমল প্রাণ।'

ছোটো একটি শিশু চারা নিয়ে এক বিরাট উৎসব। এই কোমল একটি প্রাণের কাছে কত আশা-ভরসা, কত প্রার্থনা আমাদের : 'মৌনী মাটির মর্মের গান কবে উঠিবে ধ্বনিয়া মর্মর তব রবে, মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে হে মোহন প্রাণ।' মানুষ মানুষকে নিয়ে উৎসব করে, দেবতাকে নিয়ে উৎসব করে, আজ এই কচি কোমল চারাগাছটিও সেই সমান সম্মানের অধিকারী।

আগে আম্রকুঞ্জেই একে অভিষেক করা হত। পরে আশ্রমের নানা স্থানে যেখানে একে রোপণ করা হবে আগে থেকেই ঠিক করা থাকত সেখানেই উৎসবের

সমস্ত অনুষ্ঠান হত। তখন পর্যন্ত ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম-এর মন্ত্র পড়াই হত শুধু। যেবার রতনকুঠির সামনে বৃক্ষরোপণ হয়— মনে হচ্ছে সেবারেই প্রথম প্রতীক হিসাবে পাঁচটি বালককে পাতা ফুলের মুকুট পরিয়ে সাজিয়ে পাঁচটি সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া হল। নন্দদারই পরিকল্পনা এটি। এই সুসজ্জিত পাঁচটি বালক যেন একটি সুসজ্জিত স্টেজের আবহাওয়া এনে দিল, উৎসব স্থানটি ভরে উঠল। সেই হতে আজও চলে আসছে এই রীতি। নিত্য নতুন উদ্ভাবন করবার লোকও তো আর নেই কেউ।

বৃক্ষরোপণটি নিজের হাতে গুরুদেবই করতেন। একবার করিয়েছিলেন আওয়াগড়ের রাজাবাহাদুরকে দিয়ে। সেদিনকার সেই অপরূপ দৃশ্য আজও দেখি চোখের সামনে।

গুরুদেব চলে যাবার পর হতে বাইশে শ্রাবণই হয় আমাদের বৃক্ষরোপণ উৎসব। এইদিনেই গুরুদেব চলে গিয়েছিলেন। আজও বাইশে শ্রাবণ, দেহ অসুস্থ, বসে আছি বাড়ির বারান্দায়। গান ভেসে আসছে— 'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও।' রেডিয়োতে বলেছে প্রবল ঘূর্ণি ঝড় বয়ে চলেছে কাঁথি বালেশ্বরের দিকে— তারই একটু আভাস বুঝি এল এখানে। ছিঁটেফোঁটা বৃষ্টি ঝরল। দেখি পথে ছেলেমেয়েরা যে যার বাড়িমুখো ছুটোছুটি লাগিয়ে দিয়েছে।

মনে পড়ে একবার এইদিনে বৃক্ষরোপণের সময়ে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। কেউ একটু নড়ল না। ঐ বৃষ্টিধারার অবগাহনের মধ্যেই গান মন্ত্র সকল অনুষ্ঠান হল। যে যার স্থানে স্থির দাঁড়িয়ে রইল। কী আনন্দ মনে মনে, আজ বর্ষামঙ্গল— আজ উৎসব আমাদের। প্রকৃতিও যোগ দিল আমাদের উৎসবে।

শ্রীনিকেতনে আমাদের উৎসব হয় 'হলকর্ষণ'। শ্রীনিকেতনের মেলার মাঠে আমগাছের ছায়ায় ফুলে ঘাসে মালায় আলপনায় আবৃত খানিকটা জমি,উৎসব আজ এই জমিটুকুতে। ভোয়ারির সবল সুন্দর দুটি বলদকে সাজানো হয়েছে রঙে মালায় —নানা সজ্জায়। মন্ত্রপাঠ ও গানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাঁধের লাঙল সেই ভূমিতে মাটি খুঁড়ে চলে। ঝুরঝুর করে শুকনো মাটি দু লাঙলের দুপাশে নেচে ওঠে। গান চলতে থাকে: 'ফিরে চল্, ফিরে চল্, ফিরে চল্— মাটির টানে, যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।'

শেষরাত হতেই সানাইয়ের সুর ভেসে আসে ঘরে ঘরে। এই একটি দিনই সানাই বাজে আশ্রমে। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ি। স্নান করতে হবে, পাটভাঙা

শাড়ি জামা পরতে হবে। আজ ৭ই পৌষ। মনে হয় আজ আমাদের পবিত্র হবার দিন, শুদ্ধ হবার দিন। আগের দিন রাত্রেই যে-যার কাপড় গুছিয়ে রেখে দিই, অন্ধকারে যেন না হাতড়াতে হয়। লণ্ঠনের আলো কতটুকুই বা আলো দেয়। একটা-দুটো লণ্ঠন নিয়ে কাড়াকড়ি পড়ে যায়। অতিথি অভ্যাগত বহু আসেন বাড়িতে বাড়িতে। তাঁদেরও জাগিয়ে দিতে হয়। সানাইয়ের সুরে সুরে সুর বেঁধে মন চলে।

উত্তরায়ণের সামনে ছোটো একটি মাঠ, খেলার মাঠ। তখনকার দিনে এটিকে মনে হত না ছোটো বলে। মন্দির থেকে বেরিয়ে সোজা পথে এই মাঠে ঢুকতে চার তাল গাছের উঁচু কাস্তের (খুঁটির) উপরে ছোটো একটি কাঠের ঘর, খড়ের ছাউনি দেওয়া। মই বেয়ে উঠে জনাচারেক লোক বসতে পারে ভিতরে। এইটি আমাদের নহবৎখানা। শুধু এই দিনটির জন্য নহবৎখানার চার দিকের চারখানি ছোটো ছোটো দরজা খুলে যায়, এই দরজা দিয়ে সুর ছড়িয়ে পড়ে পুবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে। আজকের এই সানাইয়ের সুর বড়ো মধুর। এই সুর যেন শুনি না আর কখনো কোথাও।

সানাই থামে। দিনের আলো ফুটে ওঠে। ছাড়া পাওয়া উত্তুরে হাওয়া দিক্‌দিগন্ত হতে ছুটে আসে। সদ্যোস্নাত আমরা শীতে সিরসির, লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলি মন্দিরের দিকে। মন্দিরের ফটকে দাঁড়িয়ে থাকে তিন-চারটি মেয়ে চন্দন গোলা বাটি হাতে নিয়ে। তারা আগতদের কপালে টিপ পরিয়ে দেয় শ্বেতচন্দনের। মনে হয় মন্দিরে ঢুকবার অধিকার পেলাম।

মন্দিরের ঘরে বাইরে মেঝেতে সিঁড়িতে বসে আছি সকলে ভিড় করে। আজ আর কেউ বাকি নেই মন্দিরে আসতে। গুরুদেব এসে বসেছেন শ্বেতপাথরের জলচৌকির উপরে খালি পা-দুখানি মেঝেতে রেখে। পরেছেন গরদের ধুতি-পাঞ্জাবি, গায়ে চাদর জড়ানো। আজকের গান আলাদা সুরের। আজ গুরুদেব বলছেন সবার বুকের ভিতরটায় যেন নাড়া দিয়ে। বাইরে সিঁড়িতে বসে চেয়ে থাকি দূরের দিকে তাকিয়ে, কিন্তু কিছু যেন লাগে না দৃষ্টিতে, না গাছ, না আকাশ, না রাঙা-মাটির পথ। শুধু গুরুদেবের কথাগুলি যেন নাচানাচি করে এসে চোখের সামনে। এমন বুকভরা তৃপ্তি অন্য আর কোনোদিনই পাই না।

মন্দির শেষ হয়। বেরিয়ে পড়ি। আজ আনন্দের দিন। আনন্দ ভিতরে বাইরে। এ আনন্দ চেপে রাখা যায় না। হাসিতে কথায় চলায় ধ্বনিতে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে এ আনন্দ মেলার মাঠে।

নহবতের তলা দিয়ে মেলার মাঠে যেন উড়ে এসে পড়ি যেমন পড়ে বর্ষার শেষে মাঠ-ভরা ঘাসে ছোটো বড়ো সাদা হলুদ নীল বেগুনি প্রজাপতির ঝাঁক।

এই মেলার মাঠে না আছে কী? আছে গরম চায়ের দোকান, বগি থালার মতো বড়ো বড়ো ভাজা পাঁপড়ের ঝুড়ি, ল্যাংচা চম্‌চম্‌ নানা মিষ্টি গামলাভরা, রেশমি চুড়ির ঝুপড়ি, পাথরের বাটি গেলাস সাজানো থরে থরে, লোহার কড়াই খুন্তি সাঁড়াশি তাওয়া, শাড়ি-কাপড় কম্বল শতরঞ্চি, প্রয়োজনে লাগা নানা দ্রব্যের সম্ভার। আছে সার্কাসের তাঁবু, জাদুকরের কেরামতি। আসে বিদ্যুৎ কন্যা, তার গায়ের যে-কোনো জায়গায় বাল্‌ব লাগালেই বাতি ওঠে জ্বলে। একটা চেয়ারে বসে থাকে কন্যা, ভিড় ঠেলাঠেলি করে দেখতে হয় তাকে। মাঠের মাঝামাঝি চাঁদোয়া টানানো, দিনে হয় কীর্তন, কবির লড়াই, রাতে হয় যাত্রাগান।

একবার মনে পড়ে জসিমুদ্দিন সাহেব এসেছিলেন মেলার সময়ে। দুপুরে কোনার্কের লাল বারান্দায় বসে গল্প করছি অনেকে, শৈলজাবাবুও আছেন। গল্প করতে করতে উঠে দাঁড়ালাম, চলতে চলতে মেলার মাঠে এসে পড়লাম, মেলার মাঠ ঘুরতে লাগলাম। দুপুরের খাবার সময়, লোকেরা গেছে যে যার নাওয়া-খাওয়া সারতে। ভিড় নেই মেলায়। কী করা যায়। চাঁদোয়াটা ফাঁকা। মনে জাগল জসিমুদ্দিন সাহেবকে দিয়ে গাওয়াতে হবে এখন। ভিড় টেনে আনতে হবে। শৈলজাবাবুরও সমান উৎসাহ। জসিমুদ্দিন রাজি হলেন, বললেন, বেশ, গাইব। তবে আমার গানের দু লাইনের পর পরই আপনাদের কিন্তু চেঁচাতে হবে— 'ভাইরে ভাই' এই কথাটি বলে। তাই সই। জসিমুদ্দিন কবিয়ালদের মতো গায়ের চাদরটা কোমরে জড়িয়ে নিলেন, আসরে নামলেন, গান ধরলেন। শৈলজাবাবু আর আমি মহা উৎসাহে 'ভাইরে ভাই' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। জসিমুদ্দিনের যা মনে আসছে— চোখের সামনে যা দেখছেন তাই নিয়েই ছড়া বেঁধে হেলেদুলে মহাস্ফূর্তিতে গেয়ে যাচ্ছেন। জোরালো গলা। আর আমাদের হাসি। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল চাঁদোয়ার তলা ভরে। বেশিরভাগ লোকই তখন চেঁচিয়ে চলেছে— 'ভাইরে ভাই'। জসিমুদ্দিনের উৎসাহ যেন বাঁধ ভেঙে পড়ল। ভিড়ের ভিতর থেকে যা বলে চেঁচিয়ে উঠছে তাই নিয়েই ছড়া গেঁথে গাইছেন জসিমুদ্দিন। একটি ছেলে কি মনে করে একটা পেন্সিল এনে ধরল সামনে। সেইটি হাতে নিয়েই জসিমুদ্দিন এমন ছড়া কাটলেন— হাসিতে হাততালিতে ভরে গেল মেলার মাঠ। কালো কোটের উপরে কোমরে চাদর জড়ানো, ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাচছেন,

গাইছেন, দুলছেন, হাসছেন— জসিমুদ্দিনের এ-এক অপূর্ব রূপ। বোধ হয় আসল রূপ।

চাঁদোয়ার পাশে একটু তফাত রেখে একটা লোহার থাম পোঁতা। জব্‌জবে করে তেল মাখানো। চক্‌চক্ করে রোদে। সাঁওতালদের খেলা হয়, কে আগে উঠতে পারে থামটার মাথায়। উঠতে যায়— পিছলে পড়ে, সরসর করে নেমে আসে সাঁওতাল যুবক একের পর এক। শেষটায় একজন কেউ উঠেই পড়ে ডগায়।

মেলার এক পাশে পোড়ামাটির হাঁড়ি-কলসির স্তূপ, গোরুর গাড়ি, কাঠের দরজা-জানালা, সস্তার খাট, তাক। বছরের প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন কেনে গ্রাম-গ্রামান্তর হতে লোকেরা, তেমনি কিনি আমরা। এই মেলাই তো আমাদের ঘরসংসারের জিনিসপত্র কিনবার একমাত্র স্থান।

নাগরদোলা দোলে সারাক্ষণ এই মেলার মাঠেই। নেই কী? সব আছে। বইয়ের দোকান, শ্রীনিকেতনের হাতের কাজ, পটারি, গালার পাখি, পেপার ওয়েট —সব আছে মেলার মাঠে। বাউলের দল আসে, গান করে মন্দিরের কাছে বট গাছটার তলায় গোল হয়ে ব'সে একতারা খঞ্জনি বাজিয়ে। খেলনার দোকান, মণিহারি জিনিস সব পাই আমরা এই একই মাঠে। সব থাকে, থাকে না এখনকার মতো মাইক আর লাউড স্পিকারের হল্লা।

অফুরন্ত আনন্দে কাটে আমাদের কয়টা রাত্রি, দিন। রাত্রে যাত্রা দেখি, দিনে মেলা ঘুরি। এমনভাবে মেলার মাঠ ঘিরে দোকানগুলি সাজানো থাকে যে, সবাই সবাইকে দেখতে পাই যে-কোনো একটি দোকানে বসে। বিশেষ করে চায়ের দোকানে বসে। চা খেতে খেতেও চেয়ে থাকি মেলার দিকেই।

এই মেলা দেখার লোভ সংবরণ করতে পারে এমন কেউ থাকে না তখন এখানে। একবার জওহরলালজী ঢুকে পড়েছিলেন মেলার মাঠে। সে এক কাণ্ড!

পণ্ডিতজী এসেছেন, আশ্রমের নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন, মিটিং করছেন, নানা বিভাগের খবর নিচ্ছেন। আচার্য তিনি, কত তাঁর কাজ। সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারি দেহরক্ষী তটস্থ হয়ে ঘিরে আছে তাঁকে। তখন এই সময়েই আমাদের সমাবর্তন অনুষ্ঠান হত। পণ্ডিতজী আমবাগানে সমাবর্তন শেষে উত্তরায়ণে ফিরবেন; বললেন, মেলা দেখব। দেহরক্ষীরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। ভাবনায় পড়লেন এখানকার কর্তাব্যক্তিরা। পণ্ডিতজী কি আমাদের মতো সহজ আবহাওয়ায় ঘুরেফিরে দেখতে পারবেন মেলা? লোকেরা তাঁকে ঘিরে চেপে ধরবে। তার চেয়ে মোটরে করে

যতটা দেখা যায় দেখুন।

মোটর খুব ধীরে ধীরে মেলা ঘিরে যেই এসে একটুকু থেমেছে মন্দিরের কাছে, পণ্ডিতজী গাড়ির দরজা খুলে শিশু যেমন ছুটে পালায় তেমনি করে নেমে মেলার মাঠে গিয়ে ঢুকলেন। পলকে রব উঠল পণ্ডিতজী মেলা দেখতে এসেছেন। দোকানি পশারি সবাই ছুটল পণ্ডিতজীকে দেখতে। ভাজা পাঁপড় কাক-চিলে নিচ্ছে, পাথর বাটি পায়ের চাপে গুঁড়োচ্ছে, ছিটেবেড়া ধাক্কাধাক্কিতে ভেঙে পড়ছে—কারো খেয়াল নেই। ছুটোছুটি ধস্তাধস্তি ব্যাপার। সেক্রেটারি, দেহরক্ষীরা শঙ্কাগ্রস্ত—কোথায় পণ্ডিতজী, কোথায় পণ্ডিতজী? পণ্ডিতজী ভিড়ের চাপে মাঠের মাঝখানে অদৃশ্য। কোনোমতে তাঁকে তখন ভিড় হতে টেনে এনে গাড়িতে তোলা হল। পণ্ডিতজীর সেই অসহায় অবস্থা আমি দেখেছি। আমি সে সময়ে ছিলাম মেলার মাঠে। পরে এ নিয়ে আমরা খুব হেসেছি। গুরুদেব নেই, তাঁকেই তো আগে গিয়ে বলবার কথা এমন মজার খবরটা।

পণ্ডিতজীর স্বভাবে একটা ছেলেমানুষসুলভ মাধুর্য ছিল। বড়ো ভালো লাগত দেখতে। তখন আমাদের স্বাধীন দেশ, পণ্ডিতজী এসেছিলেন বাৎসরিক অনুষ্ঠানে শান্তিনিকেতনে। পানাগড় পর্যন্ত প্লেনে এসে মোটরে শান্তিনিকেতনে আসতেন, আবার পানাগড়ে গিয়ে প্লেনে উঠতেন। আমরা যেতাম তাঁকে আনতে, তুলে দিতে। সেবারে বোধ হয় প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে এসেছিলেন, প্রোটোকল-অনুযায়ী কংগ্রেসের নেতারা ছিলেন উপস্থিত এয়ার পোর্টে। পৌঁছে দেবার কালে অতুল্যদা ছিলেন, প্রফুল্ল সেন মশায় ছিলেন, আরো অনেকে ছিলেন। বিশেষ বিশেষ মহিলারাও ছিলেন। অতুল্যদা তাঁদের সঙ্গে পণ্ডিতজীর আলাপ করিয়ে দেবেন এক-এক করে। নিয়মমাফিক সবাই দাঁড়িয়ে আছেন।

বাঁধানো চত্বরের একপাশে প্লেন। পণ্ডিতজী এগিয়ে আসতে আসতে পায়ের কাছে দেখতে পেলেন এক টুকরো ছোটো পাথর। জুতোর ডগা দিয়ে সেটাকে ছুঁড়ে দিলেন, সেটা একটু তফাতে গিয়ে পড়ল। পণ্ডিতজী সেখানে গিয়ে আবার সেটাকে ছুঁড়লেন, সেটা আবার আর-এক দিকে পড়ল। পণ্ডিতজী আবার ছুঁড়লেন, ছোটো ছেলে যেমন বল খেলে তেমনি পাথরের টুকরোটিকে নিয়ে তিনি খেলতে লাগলেন। রওনা হবার সময় উত্তরে যাচ্ছে, সবাই দাঁড়িয়ে আছেন, বিদায়-পর্ব শেষ করতে হবে সে-সব খেয়ালই নেই তাঁর। শেষে বলতে হল তাঁকে যে, এবারে রওনা হতে হবে। পণ্ডিতজী অপ্রস্তুতের হাসি হেসে সবার কাছে গিয়ে গিয়ে নমস্কার

প্রতিনমস্কারের পালা কোনোমতে সাঙ্গ করে প্রেনে উঠলেন।

৭ই পৌষ ৮ই পৌষ ৯ই পৌষ— এই তিনদিন আমাদের ভরাট প্রোগ্রাম। ৯ই পৌষ শ্রাদ্ধদিবস। আশ্রমের যাঁরা স্বর্গত হয়েছেন তাঁদের উদ্দেশে এই দিনটি পালিত হয়। আশ্রমের সকলেই আজ হবিষ্যান্ন করে, রান্নাঘরের দরজা আজ খোলা। আতপ চালের ভাত, কুমড়ো আলু বেগুন সিদ্ধ, মটর ডালে ফেলে। গাওয়া ঘি। ছাত্রছাত্রী শিক্ষকরা পরিবেশন করেন। একদল উঠছে, আর-এক দল বসছে খেতে। অক্লান্ত পরিবেশকরা হাসিমুখে পরিবেশন করে যাচ্ছেন। বেলার দিকে তাকায় না আজ আর কেউ। বড়ো আরাম বড়ো তৃপ্তি, যে খেতে দেয় তার, যে খায় তারও।

১০ই পৌষ পর্যন্ত মেলা থাকে, বিকেলের দিকে ভাঙতে শুরু করে। তেল-ঘিয়ের টিন, কড়াই খুন্তি হাঁড়ি গামলা নিয়ে মিঠাইয়ের দোকান কয়দিনের পাট তুলে রওনা হয় গোরুর গাড়িতে। সার্কাস পার্টি তাঁবু তোলে। রেশমি চুড়ির ঝুড়ি মাথায় নিয়ে চুড়িওয়ালীরা বোলপুরের পথ ধরে। ঘড়া কলসি কাঠের দরজা জানালা নিয়ে সারি সারি গাড়ি চলে গাঁয়ের পথে। চাকাগুলি থেকে একটা সুরেলা শব্দ ওঠে, বহুদূর হতে শোনা যায়। শৌখিন দোকানের জিনিসপত্র ট্রাঙ্কে ভরা হয় হিসাব মিলিয়ে। এ দোকান সে দোকান-ঘরের ঝাঁপ খোলা হয়, বেড়া তুলে ফেলা হয়। দেখতে দেখতে মেলার মাঠ খালি হয়ে যায়। পড়ে থাকে শুধু দোকানি-হালুইকরদের মাটি খুঁড়ে কয়দিনের জন্য তৈরি করা বড়ো বড়ো উনুনগুলি মুখ হাঁ ক'রে। থাকে কাগজের ঠোঙা আর শুকনো শালপাতা স্তূপাকার পড়ে।

মেলার মাঠ ছাড়তে পারি না তখনো, ঘুরে ঘুরে দেখি আর মন উদাস হয়। এই মন খারাপ দেখেই গুরুদেব বলেছিলেন সেবার— 'যা, তোরাও যা'— কয়দিনের জন্য বাইরে ঘুরে আয়। যখন ফিরে আসবি দেখবি মেলার মাঠ ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করে রেখেছে— আগের মতো। তখন আর খারাপ লাগবে না তোদের। সেইবারেই প্রথমবার কলাভবনের দল নিয়ে নন্দদা সুরেনদা গেলেন শিলাইদহ পতিসরে। মীরাদি, বোঠান, সুধীরা বৌদি তাঁরাও ছিলেন দলে। সেই দলেই ইন্দুদিরা ছিলেন। তখন কয়জনই বা ছাত্র-ছাত্রী! সবাই মিলে কয়দিন খুবই আনন্দে কাটিয়ে এলেন। এসে কেবলই শুনছি এই বেড়ানোর গল্প, এ গল্প আর থামতে চায় না যেন। নৌকায় করে ঘুরেছেন পদ্মার বুকে, এই নৌকায় ঘোরার আনন্দই ছিল সব চেয়ে বেশি। হুটুদিরা ছিলেন, অফুরন্ত গানে গানে ভরে ছিল

সময়। গুরুদেবের বোটখানাই ছিল নৌকো। সারারাত এই বোটে করে পতিসর থেকে শিলাইদ' এসেছেন, এই বোটে করেই ঘুরেছেন সারাদিন এ চরে সে চরে। এই কয়দিন আগেও ইন্দুদির মুখে সেই উচ্ছ্বাসপূর্ণ কাহিনী শুনলাম। বললেন, ডাঙায় আর কতটুকু সময় থেকেছি— ঐ রাত্রে ঘুমতে যেতাম কুঠিবাড়িতে, এটুকুই ছিল শুধু মাটির সঙ্গে সম্পর্ক। বোঠানরা বোটের ভিতরে বসে তাস খেলতেন, আমরা মাস্টারমশায়ের সঙ্গে বোটের ছাদের উপরে উঠে যেতাম। কত কথা বলতেন মাস্টারমশায়, কত-কিছু দেখাতেন যেন আমাদের দীক্ষা দিতেন। সেই তো ছিল আমাদের আসল শিক্ষা। তিনি তো শুধু শিক্ষাগুরু নন আমাদের দীক্ষাগুরুও।

সেইবার থেকেই ৭ই পৌষের মেলার পর 'এক্‌সকারশনে' যাওয়ার রেওয়াজ হল। কলাভবন যায়, শিক্ষাভবন যায়, পাঠভবন-সংগীতভবন যায়। সব ভবনই আলাদা আলাদা যায়। কাছেপিঠে পাহাড়ে জঙ্গলে কয়টা দিন সকলে তাঁবু ফেলে থাকে, নিজেরাই সব কাজ করে, রান্না থেকে বাসনমাজা মালপত্র টানা সব। ট্রেনে করে গেলেও 'কুলি'কে আসতে দেয় না ধারে কাছে। তাঁবু, রান্নার বাসন সেও তো কম ভারী নয় এক-একটা। ছেলের দল হৈ-হৈ ক'রে মহা আনন্দে সে-সব বহন করে। টাকাপয়সার দিকটাও তো দেখতে হবে। সাতদিনে সব খরচখরচা নিয়ে মাথাপ্রতি আমাদের ১০ টাকা থেকে ১২ টাকা পড়ত। যেবারে ১২ টাকা পড়ত— একটু বেশি বলেই মনে হত।

সাতদিন একসঙ্গে ছাত্রশিক্ষক ওঠাবসা করে, এক তাঁবুতে পাশাপাশি ঘুমোয়, মেয়েদের তাঁবু আলাদা— সেখানেও আমরা ছোটো বড়ো মিলেমিশে দিদি বোনের মতো কাটাই। এই কয়টা দিন একসঙ্গে থাকতে গিয়ে একে অন্যকে জানতে পারি। না-বলার মধ্যে সবাই সবার কাছাকাছি এসে যায়। সেই এক্‌সকারশনের সুরটি আশ্রমে ফিরে এসেও পাকাপাকি ভাবে থেকে যায়। পরে যে কয়বছর ছাত্রছাত্রীরা থাকে আশ্রমে তারা আপনার হয়েই থাকে— কোনো দূরত্ব জাগে না ভবিষ্যতে ছাত্র-শিক্ষকে। শিক্ষকদের বাড়িতে ছাত্রদের দাবি কায়েম হয়ে থাকে, তাদের দাদা-দিদির বাড়ির দাবি।

কত মধুর স্মৃতি আমাদের এই এক্‌সকারশন নিয়ে। এ নিয়ে মস্ত এক বই লেখা যায়— যদি লেখে আশ্রমের পুরাতন ছাত্রছাত্রীরা। বলব অরুণ, অমিতাভ-কে যদি পারে তারা যোগাযোগ করতে সবার সঙ্গে। সে কত মজা কত গল্প তা বলেও

কি বোঝানো যাবে সব? এখনো যখন সে-আমলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দেখা হয় যখন সেই-সব দিনের কথা ওঠে— আনন্দের উৎস যেন প্রবলবেগে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

আর তেমনভাবে একে অন্যকে আপন-করে-নেওয়া এক্‌সকারশন হয় না আজকাল। হয় ভারতদর্শন। ট্রেনে চেপে দূর-দূরান্তে যায়, ঘুরে ঘুরে দর্শনীয় যা, তা দেখে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে।

একবার— তখনকার দিনেরই কথা, ঐরকম এক্‌সকারশনেই রাজগীর থেকে ফিরবার পথে কলাভবনের দল নিয়ে ফিরল কালুকে। অন্ধ কিশোর গান করে ফিরছিল ট্রেনের কামরায় কামরায়। ছেলেরা নিয়ে এল তাকে সঙ্গে করে। কুচ্‌কুচে কালো গায়ের রঙ, কালু জন্মান্ধ। আজও সন্ধেবেলা বিজলী বাতি জ্বালি যখন মাঝে মাঝে তাকে মনে পড়ে বুকটা একটু মুচ্‌ড়ে ওঠে।

কালুকে কলাভবনের ছেলেরাই পালন করতে লাগল। তাকে হাত ধরে নিয়ে যায় স্নানের ঘরে, তাদেরই খাবার থেকে খেতে দেয় তাকে। রাত্রে তাদের ঘরেই শোয় সে।

নন্দদা কালুর গান শিখবার ব্যবস্থা করে দিলেন। রবীন্দ্র-সংগীত। সে গানের পর গান শিখে যেতে লাগল। কালুর গানের গলা মধুর। অনেক গান শিখল। কিশোর থেকে যুবক হল কালু।

মন্দিরে আগে প্রতিদিন প্রাতে সন্ধ্যায় গান গাইবার রেওয়াজ ছিল, দেখেছি আমাদের কালে। বিমলের পিতা বেতনভোগী গাইয়ে ছিলেন— আশ্রমের আদি বাড়ির কাছে মন্দিরের সামনা-সামনি মাটির বাড়িতে থাকতেন। ব্রহ্মসংগীত গাইতেন। সন্ধেবেলা সে পথে যেতে আসতে দেখতাম একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে তিনি গাইছেন মন্দিরের ভিতরে বসে। খোল-করতালবিহীন একক গলায় ভর সন্ধেবেলায় সেই গানের সুর বড়ো ভালো লাগত। পা টিপে টিপে পথটুকু পার হতাম। তাঁর মৃত্যুর পরে বহুদিন গান বন্ধ ছিল। কালুকে দেওয়া হল এই গানের ভার। কালু গান গায়। এক বেলাই গাইত সে। কালুর খরচ আশ্রম বহন করে। বাকি সময়ে কালু লাঠি ঠুকে ঠুকে গোটা আশ্রম ঘুরে বেড়ায়। কালুকে সবাই ভালোবাসে। কালুর অজানা পথ-ঘাট কিছু নেই। যে বাড়িতে যায়— কালুকে আদর করে বসিয়ে তার গান শোনে— তাকে খাওয়ায়। কোনার্কে আমাদের কাছেও সে আসত খুব। লাল বারান্দায় বসে কালুর কত গান শুনেছি। মাঝে মাঝে আমরা পিছনের

বারান্দায়ও বসতাম। কালুকে পথ চিনিয়ে দিয়েছিলাম— চার দিকে মেহেদির ঠাস বেড়া, তার মাঝে যাতায়াতের একটুখানি ফাঁক, কালু সেই ফাঁকটুকু দিয়ে দিব্যি আসা-যাওয়া করত, কোনো অসুবিধে হত না তার। বলতাম, কালু, তুমি বোঝ কেমন করে? সে বলত, লাঠি ঠুকে ঠুকে টের পাই মাটিতে কোন্‌খানে গাছের গোড়া আছে— কোথায় ফাঁকা স্থান।

এই কালু একদিন মারা গেল। বড়ো হয়ে মৃগীরোগ হল। যেখানে-সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত। নিজের দেশে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যাবার কিছুদিন বাদেই সেখানে সে মারা গেল। সেই তখনই জানলাম আমাদের কালু মুসলমান ছিল। কালু তো কালুই— তার জাতধর্ম নিয়ে কেউ কোনোদিন মাথা ঘামাই নি।

এই কালুই একদিন— যেমন প্রায়ই আসে সেদিনও এসে বসেছে কোনার্কের বারান্দায়। একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছে— কতক নিজের পছন্দে, কতক আমাদের ফরমাশে। গান শুনতে শুনতে সন্ধে হয়ে গেছে, চার দিক অন্ধকার হয়ে এসেছে, আমি নিঃশব্দে উঠে বারান্দার সুইচটা টিপে দিলাম। কালু মাথার উপরে অন্ধ দুই চক্ষু তুলে বলল, বাতি বুঝি জ্বলল?

১৫

আওয়াগড়-রাজার একটা বিশেষ স্থান আছে এই শান্তিনিকেতন আশ্রমে। দিনে দিনে সবই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়— কোনোটা আগে, কোনোটা পরে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আওয়াগড়ের রাজাকে ভুলে গেলে অপরাধ হবে আমাদের। তাঁর বাড়িটির ঐতিহ্য মলিন হতে চলেছে— এটা হতে দেওয়া উচিত নয়। সেদিনের লাগানো চারাগাছগুলি এখন বৃক্ষ হয়েছে। দিনে দুপুরে চোখের সামনে আশ-পাশের লোকেরা তা কেটে নির্মূল করে নিয়ে যাচ্ছে— কেউ কিছু বলে না, এটা অন্যায়। তাঁর মতো গুরুদেবের এত বড়ো নিষ্ঠাবান ভক্ত দুর্লভ ছিল।

চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগের কথা, আমার স্বামী গুরুদেবের একান্ত-সচিব। সকালবেলা আশ্রমের বৈতালিকের পরে সোজা বাড়ি চলে আসেন— এসেই তাঁর দপ্তর খুলে বসেন। ডাকঘর থেকে সকালের 'ডাক' নিয়ে আসে ভৃত্য মহাদেব। রোজই তাতে থাকে নানা নতুন প্রকাশিত বইয়ের পার্শেল, একগোছা সাময়িক

পত্রিকা, গাদাখানেক খবরের কাগজ, আর অনেকগুলি চিঠি দেশী-বিদেশী দুই-ই। স্বামী সে-সব আগে বেছে বেছে আলাদা করেন। খামের উপরে হাতের লেখা চেনা-চেনা যেগুলি— জানেন যেগুলি গুরুদেবের ঘনিষ্ঠ মহলের— সেই চিঠিগুলি তিনি গুরুদেবের হাতে তুলে দেন। তার পর বাদবাকি চিঠি নিয়ে শুরু হয় সচিবের দৈনন্দিন কাজ। বেশির ভাগ চিঠিই আসে নানা প্রার্থনা নানা দাবি-দাওয়া নিয়ে। কারো বইয়ের জন্য ভূমিকা লিখে দিতে হবে গুরুদেবকে, কারো সদ্য বাজারে বের করা মাথার তেলের প্রশংসাপত্র চাই। কোনো তরুণী বিশেষ আশা করে লিখেছে— আগামী মাসে তার শুভবিবাহে একটি সুন্দর ও বড়ো কবিতা চাই। কারো নবজাত পুত্র বা কন্যার জন্য তিন অক্ষরের নাম চাই— যুক্তাক্ষর বর্জিত, কারো চাই— আরো কত কী। আবার মাঝে মাঝে এমনও চিঠি আসে, কি করলে নোবেল প্রাইজ পাওয়া যায় জানাবার জন্য কাতর অনুরোধ। কেউ কেউ এমন সন্দেহও প্রকাশ করেন যে, নিশ্চয় কোনো কারচুপি করে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ সংগ্রহ করেছেন। অতএব দয়া করে কৌশলটি যদি পত্রপ্রেরককে জানিয়ে দেন। সেইসঙ্গে আশ্বাসও দেন যে পুরস্কারের অর্ধেক টাকা তিনি নিশ্চিত কবির হাতে তুলে দেবেন।

এ-সব ছাড়াও আসত কত কত পাগলের চিঠি। এগুলি আমার স্বামী ঝুড়ি ভরে জমিয়ে রাখতেন, মাঝে মাঝে বন্ধুদের কাছে পড়ে আসর জমাতেন। একবার 'বনফুল' এই রকম কিছু চিঠি নিয়ে গিয়েছিলেন স্বামীর কাছ হতে, বলেছিলেন, তাঁর লেখার কাজে লাগাবেন।

একদিন এই রকম 'ডাক'-এর বোঝা এল। তার মধ্যে অতি সাধারণ একটা খামে, তখনকার দিনে খামগুলি অতি ছোটোই ছিল— সেই রকম একটা ছোটো খামে ছোটো একখানা চিঠি— সূর্য পাল নামের কেউ একজন লিখেছেন— 'পূজ্যপাদ গুরুদেব, আপনার শ্রীচরণে সামান্য কিছু প্রণামী পাঠালাম।' চিঠির সঙ্গে অতি খেলো কাগজের একখানি 'চেক'। প্রথমটায় আমার স্বামী ভাবলেন এও এক পাগলের চিঠিই। চেকখানাও বাজে কাগজেরই একখানা। তবু কি যেন কী মনে হল তাঁর। ভালো করে উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করে দেখলেন চেকখানা সত্যিই আগ্রার কোনো দিশি ব্যাঙ্কের চেক, আর অঙ্কের মাত্রা দশহাজার টাকা। তিনি চিঠি চেক দুখানাই নিয়ে গুরুদেবের কাছে গেলেন। গুরুদেব চিঠিখানাই আগে পড়লেন, বললেন, বাঃ এতদিন পরে সূর্যপাল আবার আমাকে স্মরণ করেছে।

সেই তখন আমরা জানতে পারলাম আগ্রা অঞ্চলের বিখ্যাত তালুকদার

আওয়াগড়ের রাজা সূর্যপাল সিং। জানলাম সূর্যপাল গুরুদেবকে 'গুরু' বলে গণ্য করেন। আর মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনের সাহায্যার্থে অর্থও পাঠান। তখনকার দিনে দশহাজার টাকা আমাদের কাছে বিরাট ঐশ্বর্য। আমরা তো আনন্দে হৈ-হৈ করে উঠলাম।

গুরুদেব বললেন, একে দেখলেই বুঝতে পারবি প্রাচীনকালে আমাদের রাজা-রাজড়া সত্যিকারের রাজকীয় ছিলেন। বললেন, জানিস, সূর্যপাল প্রায় সাড়ে-ছয় ফুট উঁচু।

আওয়াগড়ের রাজার সম্বন্ধে এই আমাদের প্রথম স্মৃতি। সেই থেকে আওয়াগড়ের রাজাকে শুধু 'আওয়াগড়' বলেই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতাম। এই নামেই তাঁর পরিচয় আমাদের কাছে। 'আওয়াগড়' লিখেছেন, 'আওয়াগড়' আসবেন— এভাবেই তাঁর কথা উল্লেখ করতাম আমরা।

এর কয়েক মাস পরে বিশ্বভারতীর কাজে আমার স্বামীকে দিল্লি আর লক্ষ্মৌ যেতে হল। গুরুদেব বললেন, আওয়াগড়েও একবার যাবি, সূর্যপালকে শান্তি-নিকেতনে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়ে আসবি।

আগ্রা আর টুণ্ডলার মাঝখানে ছোটো একটা স্টেশন, সব ট্রেন থামেও না। সেখানে গিয়ে স্বামী লিখলেন, "গুরুদেবের আদেশ, না গিয়ে উপায় নেই। এক অপরাহ্ণে অতিশয় শ্লথগামী একটা ট্রেন থেকে সেই স্টেশনে তো নামলাম। খবর আগেই পাঠিয়েছিলাম, স্টেশনে নেমে দেখলাম রাজাসাহেব তাঁর এক কর্মচারী পাঠিয়েছেন, আর সেইসঙ্গে পাঠিয়েছেন অতি পুরাতন ঝরঝরে একখানা Willys Knight গাড়ি। পথচারীকে সাবধান করতে যার হর্ন বাজাতে হয় না। গাড়ির সর্বাঙ্গ থেকেই নানা আওয়াজ মুহুর্মুহু বেরিয়ে আসে।

স্টেশন থেকে আওয়াগড় কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূরে। চার পাশে সবুজের লেশমাত্র নেই। ধূ ধূ করছে মাঠ। আর মাঝে মাঝে অতিকায় সারস পাখি খাদ্যান্বেষণে ব্যস্ত। প্রায় ঘণ্টা-খানেক পরে সারা অঙ্গে ছাই রঙের ধুলো মেখে আওয়াগড় পৌঁছলাম। দেখলাম সত্যিকার সেকেলে এক গড়। চার দিকে মাটির দেওয়াল, দশ-বারো হাত চওড়া। কবিতা পড়ে ছেলেবেলা থেকে মনে বুঁদির কেল্লার যে ছবি ছিল, ঠিক তারই মতো এই আওয়াগড়।

ভিতরে রাজপ্রাসাদ, দপ্তর, তোষাখানা, কর্মচারীদের বাড়ি, শাস্ত্রীদের দেউড়ি ইত্যাদি নিয়ে ছোটোখাটো এক গ্রাম্য শহর।

বেশ সাজানো-গোছানো অতিথিশালায় আশ্রয় পেলাম। ভালো করে স্নান করে কাপড়-চোপড় বদলে বাইরে এসে দেখি রাজাবাহাদুরের ম্যানেজার অপেক্ষা করছেন। তাঁর সঙ্গে চা জলখাবার খেতে খেতে নানা গল্পগুজব করলাম, করলাম সবই আওয়াগড় সম্বন্ধে। শুনলাম, খুবই বড়ো তালুক, আগ্রা আওদ অঞ্চলে বোধ হয় সব চেয়ে বড়ো ও অর্থশালী। রাজাবাহাদুর প্রায় সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন। গেরুয়া পরেন। আজকাল আর রাজপ্রাসাদে থাকেন না। শহরের একপ্রান্তে ছোটো একটা মন্দির বানিয়ে সেখানেই আশ্রয় নিয়েছেন। জমিদারির বিরাট আয়ের অধিকাংশই দানধ্যানে ব্যয় করেন। জমিদারির ম্যানেজারেরও উপরে আছেন রাজাবাহাদুরের এক কর্মচারী, দান বিভাগের অধিকর্তা— Distributor of Charities.

সন্ধের পর ম্যানেজার আমাকে রাজাবাহাদুরের কাছে— তাঁর মন্দিরে নিয়ে গেলেন। অতি অমায়িক ভদ্রলোক, বছর-পঞ্চাশেক বয়েস। সাধারণ গেরুয়া কাপড়ের ধুতি-কুর্তা পরা পরিচ্ছদ। যে ছোটো ঘরে বসেছিলেন তিনি— সে ঘরে আসবাবপত্র বলতে গেলে কিছুই নেই। অনেক রাজা-মহারাজা দেখেছি কিন্তু এঁর মতো কাউকে দেখি নি।

রাজাবাহাদুরকে গুরুদেবের আমন্ত্রণ জানালাম। তিনি নিশ্চয়ই আসবেন কথা দিলেন। আমাকে দিন-কয়েক তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতে বললেন। দিল্লিতে জরুরি কাজ আছে— এই অজুহাতে তাঁর কাছ থেকে সহজেই ছুটি পেলাম। সত্যি কথা বলতে কি, শ্যামল কোমল বঙ্গদেশের লোক আমি, চার পাশের প্রাকৃতিক রুক্ষতা এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে হাঁপিয়ে তুলছিল। রাত্রি এগারোটার সময় একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরে সেই রাত্রেই আমি দিল্লি চলে এলাম।"

এর কিছুদিন পরেই 'আওয়াগড়' শান্তিনিকেতনে এলেন। আম্রকুঞ্জে তাঁর সংবর্ধনা হল। আশ্রমের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী-বন্ধু হিসাবে গুরুদেব তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। আরো বললেন, আওয়াগড়ের সূর্যপাল প্রাচীন ভারতীয় রাজন্যকুলের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

সুগঠিত দীর্ঘ উন্নত দেহ রাজাবাহাদুরের। শালপ্রাংশু মহাভুজ। ধীর পদক্ষেপ। কিন্তু দৃঢ়। মৃদু তাঁর কথাবার্তা। বিনয় তাঁর সর্ব অবয়বে। তিনি তাঁর গুরুর আশ্রমে এসেছেন এইটে হত তাঁর সকল নম্রতায় প্রতিক্ষণে ব্যক্ত।

প্রতিদিন সকালবেলা রাজাবাহাদুর একবার এসে গুরুদেবকে প্রণাম করে

যেতেন। পরে রথীদা সুরেনদা আমার স্বামী ও আরো কারো কারো সঙ্গে গল্প করে দিন কাটিয়ে দিতেন। সন্ধেবেলা উদয়নে সামনের বসবার 'হল্'-এ রথীদা অধ্যাপকরা কয়েকজনে মিলে প্রায় রোজই তাস খেলেন, রাজাবাহাদুর ভালোমানুষের মতো চুপ করে কারো পাশে বসে থাকেন। তিনি যে আছেন, তিনি যে তাসের কিছু জানেন এ কথা কারো মনেই হয় না। এঁরা যে কয়জন খেলেন সকলেই ব্রীজ খেলায় ওস্তাদ। এই ওস্তাদেরই একজনকে একদিন রাজাবাহাদুর তার খেলায় একটা ভুল শুধরে দিলেন। সবাই যেন চমকে উঠলেন। রাজাবাহাদুর মুচকে হেসে বললেন, তোমরা কি ভেবেছ আমি চিরকালই এমনিতরো হবু-সন্ন্যাসী ছিলাম?

ধীরে ধীরে কথায় কথায় গল্পে আকারে জানা গেল সে আমলে আগ্রার ইংরেজদের ক্লাবে যে দুই-তিন জন দিশি সভ্য ছিলেন রাজাবাহাদুর ছিলেন তাঁদের অন্যতম। গল্ফ্ খেলায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বিজেতা হিসাবে কাপ-শীল্ডও অনেক সংগ্রহ করেছেন। পিস্তলের লক্ষ্য ছিল তাঁর অব্যর্থ।

এইবারে বৃক্ষরোপণ করানো হবে রাজাবাহাদুরকে দিয়ে চীনভবনে। সেই সেদিন দেখেছিলাম একটি ছবি, সত্যিকার ছবি, চিরস্থায়ী ছবি— যে ছবি পাথর করে। মনের মণি কুঁদে সেদিন আঁকা হয়ে রইল ছবিটি চিরদিনের তরে।

চীনভবনের দক্ষিণ দিকে খোলা অঙ্গনে বৃক্ষরোপণ হবে। সেই স্থানটি ঘিরে জড়ো হয়েছি আশ্রমবাসী সকলে। গুরুদেব বসেছেন বেদীতে, পাশে দাঁড়িয়ে সুদীর্ঘ দেহের অধিকারী সুদর্শন রাজাবাহাদুর— পরনে গেরুয়া ধুতি গায়ে গেরুয়া চাদর মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ি। গুরুদেব মন্ত্র পড়ছেন— রাজাবাহাদুর দু হাতের অঞ্জলিতে মাটির পাত্রখানি ধরে আছেন— যে পাত্রে আছে ঈষৎ লাল আভা ছোঁওয়া কচি-কোমল কয়েকটি পাতা নিয়ে একটি শিশু অশ্বত্থচারা। ভক্তি-বিনম্র ভঙ্গি। মনে হল এই মন দিয়ে এইভাবে পাত্রটি না ধরলে যেন মানাত না আজ। মর্যাদা পেত না শিশু চারাটি।

প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্রবীর্যের এই অপূর্ব সমাবেশ আমাদের মনকে গভীর-ভাবে নাড়া দিল এদিন। এতবার এত বৃক্ষরোপণ হয়েছে আশ্রমে, এমনটি বোধ হয় আর হয় নি, এমনটি আর দেখি নি।

সেবার দিন-পনেরো ছিলেন রাজাবাহাদুর। প্রায় রোজই সন্ধ্যায় গুরুদেব উদয়নের পশ্চিমের বারান্দায় এসে বসতেন রাজাবাহাদুরকে নিয়ে। কোনোদিন গান হত, কোনোদিন কিছু পড়ে শোনাতেন গুরুদেব। আমরাও থাকতাম বসে।

শেষ দিন সন্ধেবেলা মনে আছে কিছু পাঠ গান হতে হতে গুরুদেব আপনা হতে গেয়ে উঠলেন 'জীবনে যত পূজা হল না সারা, জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।' পুরো গানটা গাইলেন। গুরুদেব রাজাবাহাদুরকে পাশে নিয়েই বসতেন; কিন্তু দেখতাম, রাজাবাহাদুর বসবার সময়ে তাঁর কোচখানা গুরুদেবের কোচ থেকে একটু সরিয়ে গুরুদেবের কিছুটা পিছন দিকে বসতেন। এদিনও তেমনি বসেছেন। গুরুদেব আপনমনে চোখ বুজে গলা ছেড়ে গান গেয়ে যাচ্ছেন, 'যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে— যে নদী মরুপথে হারালো ধারা, জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।' দেখছি রাজাবাহাদুরের মাথা বুকের কাছে ধীরে ধীরে নুয়ে পড়ছে। মনে হল তিনি কি কাঁদছেন ?

বিদায়ের দিন গুরুদেবকে প্রণাম করে তাঁর কাছ হতে বিদায় নিয়ে স্টেশনে এসে রথীদা সুরেনদা আমার স্বামী ওঁরা— যাঁরা তাঁকে বিদায় দিতে গিয়ে ছিলেন তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, এখন আশ্রমে সব চেয়ে জরুরি প্রয়োজন কত টাকার ? সুরেনদা তখন আশ্রম-সচিব, সকল হিসাব তাঁর নখদর্পণে, তিনি তাড়াতাড়ি একটুকরো ছেঁড়া কাগজে একটা হিসাব খাড়া করলেন। সবসুদ্ধ একলাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার প্রয়োজন। কাগজখানা রাজাবাহাদুর পকেটে পুরলেন। রাজা-বাহাদুর রওনা হয়ে গেলেন।

আশ্রম-সচিব, গুরুদেবের সচিব, রথীদা— ওঁরা সবাই ভাবলেন, কতবার কতজন এইভাবে আশ্রমের অভাব কী জানতে চেয়েছেন, জানানো হয়েছে। সবাই মিলে আশায় থেকেছেন, দিনে দিনে আশা উৎসাহ সব নিভে গেছে। কোনো সাড়া আসে নি আর। ভাবলেন, এও তারই পুনরাবৃত্তি বই তো নয়। কেউ আর এ নিয়ে তাই মাথা ঘামালেন না।

দিন-পনেরো পরে আগ্রা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক থেকে গুরুদেবের নামে একটা রেজেস্ট্রি চিঠি এল। বোঝা গেল আওয়াগড়ের দান এসেছে। কিন্তু কত ? গুরুদেব তাঁর সচিব, রথীদা, সুরেনদা— সবাইকে ডেকে পাঠালেন। খামখানা দেখিয়ে বললেন, এবার শুনি তো কার কী 'গেস' (guess)।

যাঁদের ডাকা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে বয়সে ছোটো ছিলেন গুরুদেবের একান্ত-সচিবই। সেই হিসাবে তাঁকেই আগে বলতে হল। বিশ্বভারতীর ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ইতিপূর্বে বহুস্থানেই ইনি গেছেন, তিক্ত অভিজ্ঞতায় জানেন প্রত্যাশার শতভাগের একভাগও মেলে না। তাই তিনি বললেন, কত আর হবে ? হাজার

পাঁচেক। সুরেনদা সাবধানী মানুষ, সহজে মুখের কথা বের করেন না, তবু এর চাইতে একটু বেশি সংখ্যাই বললেন। সব চেয়ে বেশি বললেন রথীদা, ভয়ে ভয়েই বললেন, পঁচিশ হাজার।

তখন খামখানা খোলা হল। ঠিক যতটা চাওয়া হয়েছিল— একলক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজারেরই 'চেক' এসেছে একখানা। বিশ্বভারতীর ইতিহাসে এবং সেই দারুণ দুঃসময়ে সব চেয়ে বড়ো একক দান— এই আওয়াগড়ের রাজাবাহাদুরেরই।

এই টাকা দিয়ে শ্রীভবনের অনেকগুলি ঘর বাড়ানো হল, পাঠভবনের নানা উন্নতি হল, কয়েকটি বাসগৃহও তৈরি হল শিক্ষকদের জন্য।

নানা সময়ে রাজাবাহাদুর নানা রকমের জিনিস পাঠাতে লাগলেন আশ্রমে। একদিন তাঁর এক কর্মচারী বিরাট এক রুদ্রবীণা নিয়ে এসে উপস্থিত। কি, না, সংগীতভবনের জন্য রাজাবাহাদুরের দান। .তখন বীণা বাজাবার কেউ ছিলেন না আশ্রমে, কী করা যায় বীণাটিকে নিয়ে। শেষে সংগীতভবনের সংগ্রহশালায় রাখা হল সেটি।

একবার সকল আশ্রমবাসীদের জন্য আগ্রার মণ্ডা, প্যাঁড়া পাঠালেন। স্টেশন থেকে কয়েকটা গোরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে সেই মণ্ডার বাক্স এল। ছাত্রছাত্রীদের খাওয়ানো হল, আশ্রমের সবার বাড়ি বাড়িতে বিতরণ করা হল, কয়েকদিন ধরে সর্বত্র এই মেঠাই-পর্ব চলল।

একবার পাঠালেন শ্রীনিকেতনের গোশালার জন্য দুগ্ধবতী হরিয়ানা গোরু অনেকগুলি। বিশাল বিশাল সে-সব গোরু। দুধও দেয় তেমনি। আজও আশেপাশের গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে আছে তাদের বংশধরেরা।

আর-একবার পাঠালেন অত্যন্ত অভিজাত-বংশীয় তিনটি ছোটো ছোটো 'পমেরিয়ান্ পুড্‌ল'। একটি পুপের জন্য, একটি বুড়ির জন্য, আর-একটি আমার জন্য। অতি শৌখিন কুকুর, অতিশয় বিলাসী, হাঁচি কাশি লেগেই আছে। অল্প অল্প করে প্রহরে প্রহরে খাওয়াতে হয়। একটু এদিক-ওদিক হলেই হুলুস্থুল ব্যাপার। এই রাজকীয় ঐশ্বর্য আমাদের কপালে বেশিদিন লেখা ছিল না। এক এক করে তারা কিছু কালের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করে গেল।

বোধ হয় পরের বারই রাজাবাহাদুর সপরিবারে এলেন আশ্রমে। রানী সাহেবা, রাজপুত্র দুজন, দুজন রাজকন্যা আর সঙ্গে এল দাসদাসী কর্মচারী একদল। রাজাবাহাদুর পূর্বেই জানিয়েছিলেন যে তিনি কয়েকদিন কাটাবেন আশ্রমে।

গুরুদেব শ্যামলী ছেড়ে উদয়নে গিয়ে রইলেন, শ্যামলীতে রাজাবাহাদুরকে থাকতে দেওয়া হল। রানী পুত্রকন্যা দাসীবৃন্দ নিয়ে রইলেন উদীচীতে। কর্মচারীদের থাকার ব্যবস্থা হল গেস্টহাউসে, পান্থশালায়।

'রানী আসছেন, রানী আসছেন'— সকলেই উৎসুক রানী দেখব। ছোট্ট অভিজিৎ রোজ সন্ধেবেলা ঘুমিয়ে পড়ে— সে-সন্ধ্যায় সে জেগে রইল— রূপকথার রাজকন্যা রাজপুত্র দেখবে বলে। ভেবেছিল হয়তো পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়েই আসবে রাজপুত্তুররা। এল যখন— কেমন যেন চুপ করে গেল অভিজিৎ। বারে বারে তার মুখখানি দেখছিলাম— বুঝতে চেষ্টা করছিলাম সে কি ব্যথা পেল? ঐটুকু প্রাণে কি কল্পনার বিচ্যুতি ঘটলে আঘাত লাগে কিছু? কি জানি। নিজের শিশুকাল মনে করতে চেষ্টা করলাম।

রাজাবাহাদুর যেমন সুপুরুষ, রানীসাহেবা তেমন নন। তবে মুখখানি স্নিগ্ধ— আচরণ ধীর, ভাবে ভক্তি মাখানো; শ্যামবর্ণ, সাদাসিধে চেহারা, সাদারঙের সাধারণ শাড়ি পরনে। পুত্রকন্যারাও মায়েরই মতন। অতি সাধারণ চেহারা, সাধারণ বেশবাস।

রাজাবাহাদুর এবারে তাঁর শ্যালককেও এনেছেন সঙ্গে। শ্যালক বিখ্যাত শিকারী সুরগুজার মহারাজা। রাজাবাহাদুরের মনে মনে ছিল তাঁর শ্যালকও শান্তিনিকেতনের অনুরক্ত হন, সাহায্যাদি করুন। তা করেছিলেন সুরগুজার মহারাজা, বেশ-কিছু টাকা দিয়েছিলেন। সে টাকা শ্রীনিকেতনের কাজে লেগেছিল সেবার।

তখনকার দিনে ট্রেনে চার রকমের কামরার ব্যবস্থা ছিল। ফার্স্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস, ইণ্টার ক্লাস আর থার্ড ক্লাস। রাজাবাহাদুর দলবল সবাইকে নিয়ে ইণ্টার ক্লাসে চড়েই এসেছেন। কথা প্রসঙ্গে একদিন বললেন, আমরা তো তীর্থস্থানে এসেছি, তাই কোনো ভেদাভেদ রাখি নি, সবাই এক ক্লাসেই এসেছি।

অথচ সেবার যখন ফিরে যান, যাবার পথে কলকাতায় রইলেন কয়দিন। গুরুদেব সুধাকান্তদাকে সঙ্গে দিয়ে দিলেন কলকাতায় রাজাবাহাদুরদের দেখাশোনা করবার জন্য। জোড়াসাঁকোতে বেশ-কিছু দিন ছিলেন তাঁরা। তার পর ফিরে যাবার সময় যখন হল— গল্প শুনেছি সুধাকান্তদার কাছে, তিনি মজা পেতেন বলতে— খুব সরস করেই বলতেন, আর বল কেন ভাই, সকালে রাজাবাহাদুরের এক রকম মর্জি হত, বিকেলে আর-এক রকমের। সকালে বলতেন 'আজই যাব'।

টিকিট কেনা হত, বার্থ রিজার্ভ করা হত, স্টেশনে যাবার গাড়ি ডাকা হত— সব প্রস্তুত, ঠিক সেই সময়েই বলতেন— আজ যাব না। সুধাকান্তদা উচ্চৈঃস্বরে হাসতেন আর বলতেন— কত টাকা যে নষ্ট হল এই করে।

সেইবারেই আশ্রমে যখন ছিলেন, রাজাবাহাদুর ইচ্ছে প্রকাশ করলেন এখানে একটি বাড়ি করবেন, মাঝে মাঝে এসে থাকবেন। আওয়াগড়ে ফিরে গিয়ে তিনি টাকা পাঠালেন বাড়ি তৈরির জন্য।

উত্তরায়ণের উত্তরে দুদিকে খোয়াই, মাঝখানে খানিকটা ডাঙা, চারি দিক খোলা— এই জমিটা ঠিক করা হল। সুরেনদা বাড়ির নক্‌শা আঁকলেন। বাড়ি উঠল। সামনে মস্ত খোলা বারান্দা; ঘর বারান্দা সব জায়গা থেকেই অতি সুন্দর ছবির মতো দেখা যায় বাইরেটা। সুরেনদার নক্‌শাতেই বাড়ির আসবাব-পত্র হল খাঁটি দেশী ধরনের। নিচু নিচু চেয়ার আকারে বড়ো, দরকার মতো জোড়াসন হয়েও বসা যায় তাতে। ছোটো ছোটো পায়ার টেবিল, পালঙ্ক হল। শ্রীনিকেতনের টেক্‌সটাইল বিভাগ থেকে উজ্জ্বল বাদামি রঙের পর্দা হল। মেঝেতে পাততে সুরুচিসম্পন্ন ডিজাইনের শতরঞ্চি হল। সব তৈরি। নিখুঁত গৃহসজ্জা। সব-কিছুই সুন্দর, অতি সুন্দর; কিন্তু জাঁকজমক ছিল না তার।

রাজাবাহাদুর আসবেন আসবেন, এমন সময়ে গুরুদেব চলে গেলেন।

রাজবাহাদুর আর এলেন না।

একদিন দলিল-দস্তাবেজ সহ খাম এল একখানা। রাজাবাহাদুর লিখে পাঠিয়েছেন বাড়ি বাগান সব তিনি দান করলেন বিশ্বভারতীকে।

এখন সে বাড়ি আর তেমনটি নেই। ভাগে ভাগে শিক্ষকরা থাকেন, ফ্ল্যাট বাড়ির মতো। এধারে ওধারে আধুনিক কায়দায় স্টাফ কোয়ার্টার উঠে চেপে ধরেছে এ বাড়ি। তবু এখনো আমরা এই বাড়ির 'উল্লেখ করে বলি— 'আওয়া-গড়ের বাড়ি'।

১৬

দিগন্ত-ছোঁয়া আকাশ কত দেশে কত জায়গায় কত দেখেছি, কিন্তু শান্তি-নিকেতনের আকাশের যেন তুলনা নেই। এ আকাশ আমাদের চেনা— আমাদের জানা। এ আকাশের মন আমরা বুঝতে পারি, কখন কী ভাব নিয়ে

থাকে, ধরতে পারি। যেমন পারি নিজের আপনার জনকে। কত আলোর লুকোচুরি, কত মেঘের ছুটোছুটি, কত রকম রঙের খেলা এর বুকে। সব দেখতে পাই। এমন করে কই আর কোথাও দেখতে পাই নি।

শরতের সুনীল গগনে সত্যিই সাদামেঘের ভেলা ভাসে এ আকাশে। জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রেও দলে দলে ভেলা ভেসে চলে। তাদের মধ্যে কত কম্পিটিশন হয়। হারে যারা তারা অভিমানে ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশে— আর যোগ দেয় না দলে।

জলভরা মেঘ থমথম করে আকাশ জুড়ে। দিগন্তে দেখা যায় মেঘের একদিকটা যেন গলে পড়ছে আকাশ হতে। বুঝি— ঐ দূরে বৃষ্টি হতে লেগেছে। সে কতটা দূর হবে? মাইল দেড়েক দুই তো বটেই— ঐ— ঐদিককার সাঁওতাল গ্রামের মাথায়। বৃষ্টিটা কি এদিকে আসবে? না— ঐদিক দিয়ে দক্ষিণ-পাশ ঘেঁষে চলে যাবে? কখনো শোঁ শোঁ শব্দ শুনে কান পাতি, ঐ আসছে। বাইরে মেলে দেওয়া শাড়ি-কাপড়গুলি তুলবার সময়টুকুও পাই না, ঝম্‌ঝম্ করে বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আধ-শুকনো কাপড়গুলি বুকে জড়িয়ে চুল শাড়ি আধভেজা করে দৌড়ে ঘরে ঢুকি।

উত্তর-পূর্ব কোণে কালো মেঘ জমাট বাঁধে— বলে উঠি— ওরে ও— দরজা-জানালা বন্ধ কর, কালবৈশাখী আসছে। বলতে বলতেই সে এসে যায়। ধুলোয় শুকনো পাতায় আঁধি হয়ে ওঠে, জানালা-দরজার খোলা পাল্লাগুলিতে আছড়ে এসে পড়ে। গাছগুলি ওলট-পালট খায়, পাখিগুলি আশ্রয়ের আশায় উড়তে গিয়ে কাত হয়ে হয়ে পাক খেতে থাকে। মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটে যায়। কালবৈশাখী চলে যাবার কালে কখনো দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি দিয়ে যায়, কখনো মাটি তেমনি শুকনো খটখটেই থাকে।

পশ্চিম-উত্তর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের মেঘ ঝড়ের সংকেত আনে। এ ঝড় এক-একদিন বড়ো ভয়ংকর রূপ ধরে। গাছপালা ভেঙে উল্টে পাতা থেঁতলে একাকার করে যায় সব। এদিন বড়ো ব্যথা পাই, স্তব্ধ হয়ে যাই— ঝড়ের পরে বাইরে বের হয়ে যখন দেখি এদের অবস্থা। সবের উপরে যেন একটা বিধ্বস্তভাব। মনে মনে বলি, আহা, থাক্, সারারাত থাকুক এইভাবে, জিরোক, শান্ত হোক। সকালবেলা নাড়াচাড়া দেব, সাফসুতরো করব।

আবার পুব-দক্ষিণের আকাশ জুড়ে যখন জমাট কালো মেঘ স্থির হয়ে থাকে, যখন সেই ঘন কালো মেঘের গায়ে বৃক্ষসারির মাথায় শেষবেলার সোনালি আলো-

টুহু লাগে— দেখে মুগ্ধ মন বাক্যহারা হয়ে থাকে। ভিতর হতে একটি ভাবই জাগে— অপূর্ব অপূর্ব। আর-কোনো ভাষা থাকে না তখন।

আমাদের এ আকাশ কথা বলে আমাদের সঙ্গে। এ কথা ছোটো বড়ো আমরা সবাই শুনতে পাই।

আবার কখনো এও হয়— গ্রীষ্মের কোনো এক দুপুরে হালকা নীল আকাশ, যখন ধূসর মন্থর মেঘ সূর্যকে ঢেকে রেখে ধীরে ধীরে চলেছে, দু-একটা চিল দু ডানা মেলে উড়ছে আকাশে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে, সে সময়ে আমগাছের তলায় একা বসে থাকি, দু চোখ বুজে আসে—মন চলে যায় কোন্ সুদূরে— যাকে জানি না— চিনি না, তখন কি জানি কী এক আবেশে তন্ময় হয়ে থাকি। সেদিন কেউ কথা কই না, না আমি— না আকাশ।

বর্ষার পরে যেদিন গাছের ফাঁক দিয়ে শরতের আলো প্রথম এসে পড়ে সবুজ ঘাসের উপরে কারো চোখ এড়িয়ে যায় না সেদিন তা হতে। সবার মন খুশিতে হাসিতে ভরে ওঠে। সে সোনালি আলো দেহে মনে মেখে খালি পায়ে শিশির-ভেজা কচি ঘাসে হেঁটে হেঁটে বেড়াই।

উত্তর দিক থেকে হাওয়া আসে, অন্যমনস্ক মন চমকে ওঠে— এই তো শীতের হাওয়া— জানিয়ে দিয়ে গেল। আবার যেদিন দক্ষিণ দিক হতে আচমকা একটু-খানি ফুরফুরে হাওয়া চোখে মুখে হাত বুলিয়ে দিয়ে গেল সেদিন আর একা বসে থাকতে পারি না। একে অন্যকে বলি, দেখেছ, আজ দক্ষিণের হাওয়া দিল একবার সকালের দিকে, টের পাও নি ?

এখানে প্রকৃতির ভাষা শুনতে কাউকে শিখিয়ে দিতে হয় না, এরা আপনিই শেখে।

কতকাল আগের ঘটনা— কত বলেছি এ কথা কতজনকে, এখনো বলি ; তখন এত বাড়িঘর ছিল না চারি দিক ছেয়ে। এখন যেটা রতনপল্লী, তখন সেটাই ছিল আশ্রমের পূর্বপ্রান্ত। এই পূর্বপ্রান্তে মার জন্য বাড়ি তোলা হয়েছিল ছোট্ট একটি। মা একা থাকতেন। আর ছিল কিছুটা তফাতে ডাক্তারবাবুর বাড়ি। এদিকে এই দুটি বাড়ি ছাড়া আর ছিল না বাড়ি।

দিনে দুবার তিনবার মা'র কাছে যাই। কোনার্ক থেকে ছোটো গেট দিয়ে বের হয়ে শর্ট-কাট করি — ডাক্তারবাবুর বাড়ি ডাইনে রেখে এগিয়ে চলি। তখন-কার দিনে রাস্তা-ঘাট বলে ছিল না কিছু। ঘাস চোরকাঁটায় ভরা ডাঙা মাড়িয়ে

চলতাম যে-কোনো দিক দিয়ে। গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারলেই হল, তার আবার কাঁটাঝোপ। এই পথে যেতে যেতে সরু একটি পায়ে-চলা-পথ হয়ে গিয়েছিল। এঁরা বলতেন মা'র বাড়ি যেতে যেতে আমার পায়ে পায়েই এই পথের রেখাটা পড়েছে ঘাসের উপরে। তা হবে।

একদিন এই রকম যাচ্ছি মা'র বাড়িতে, বিকেলের দিকে। তখন আশ্রমের চার দিকে বনকুলের ঝোপ ছিল যেখানে-সেখানে। বেশ-খানিকটা জায়গা নিয়ে হাত-তিনেক উঁচু এই বনকুলের ঝোপ। ঘন কাঁটায় ভরা— এই কাঁটা কাপড়ে লাগলে ছাড়ানো দায়। এই কুল খায় শুধু শেয়ালে, মানুষে নয়।

ডাক্তারবাবুর বাড়ির সামনের মাঠটায় এই কুলের ঝোপ বেশ কয়েকটা। ডাক্তারবাবুর ছেলেমেয়ে তখন ছোটো ছোটো। তাদের বয়সী পাঁচ-সাত বছরের আরো তিন-চারটি ছেলেমেয়ে— তারা মাঠে ছুটোছুটি করে খেলছিল। এমন সময়ে ঈশান কোণ হতে কালবৈশাখীর শুকনো হাওয়া ছুটে এল। দেখি মুহূর্তে বালক-বালিকা কয়টি খেলা ফেলে একটা কুল-ঝোপ ঘিরে দু হাত তুলে ছুটে ছুটে নাচতে লাগল আর গাইতে লাগল— 'পাগলা হাওয়ার বাদল-দিনে পাগল আমার মন জেগে ওঠে'। হাওয়া যত বেগে ছোটে তাদের নাচও ততই জমে ওঠে। চুল উড়ছে, জামা উড়ছে, নেচে নেচে তারা হাওয়ার সঙ্গে মেতে উঠছে। পাগলা হাওয়ায় যেন নিজেদের মিলিয়ে দিচ্ছে। এ নাচ কেউ শিখিয়ে দেয় নি, এ গান কেউ ডাক দিয়ে বসিয়ে শেখায় নি। আপনি আপনি শুনে শিখেছে গান— প্রকৃতিকে দেখে শিখেছে খেলা। মনে হল— এই হল আমাদের শান্তিনিকেতন, আমাদের আসল শান্তিনিকেতন। সেদিন যে ছিল এই দলের নেত্রী— কন্যাতুল্যা সেই সাতবছরের সুমিতি এখন জননী, চল্লিশোর্ধ্বের গিন্নিবান্নি।

ঘাসে ঘাসে ঘুরে আশ্রমের বালক-বালিকারা গুটিপোকা ধরে, হাতে তাদের টিনের কৌটো, ঢাকনায় ফুটো করা। তারা পালন করে গুটিপোকা, গাছ চিনে চিনে পাতা ছিঁড়ে খাওয়ায় গুটি ধরবার আগে। সব গাছের পাতা সব গুটি-পোকা খায় না। এ-সব করে তারা নিজ নিজ শখে। এরা জানে কয়দিন পরে ফুটবে গুটিপোকাটা। জানে— এটা প্রজাপতি হবে, না মথ হবে। রুপোলি রঙের গুটিপোকাটা আকন্দ গাছের, আর মুখোশ আঁকা বড়ো গুটিপোকাটা পলাশের। এ সব-কিছু আপনা হতেই জানে এরা।

খোয়াই ঘুরে তুলে আনে ঘাসফুল, এই ফুল পিঁপড়ে খায়। ফুলের গায়ে

আঠার মতন পদার্থ থাকে একটা, পিঁপড়ে এসে আটকে যায় গায়ে।

বর্ষার পর মাটির নীচে হতে বেরিয়ে আসে টুকটুকে লালরঙের ভেলভেট পোকা-গুলি। ভেলভেটের মতোই গা-টা, তাই নামও হয়ে আছে ভেলভেট পোকা। এই পোকাগুলিকে জড়ো করে পাল্লা দেয় কার মুঠিটা ভরল আগে।

কাঠবিড়ালীর বাচ্চা ঝড়ে বাসা হতে পড়ল যদি নীচে একবার, সে বাচ্চা এদের পাঞ্জাবির পকেটে-পকেটে বাড়তে থাকে। ক্লাসে বসে ফাঁকে ফাঁকে পকেট থেকে বের করে কাঁচা শশা খাইয়ে দেয়। কাঠবিড়ালী তাকেই মা বলে জানে, তার ঘাড়ে মাথায় লাফালাফি করে। একেবারে ছোট্ট বাচ্চা হলে তাকে গেঞ্জির ভিতরে বুকের ওমে রেখে দেয়।

ঘাসে গাছে আকাশে হাওয়ায় এক হয়ে আমাদের শিশুরাও দিন দিন বড়ো হয়। কখন বড়ো হয় আমরা মা-রাও টের পাই না। অভিজিৎ যেদিন বলল— 'মানি তুমি বুঝতে পারছ না'— ভাবলাম তাই তো, অভিজিৎ আমার বড়ো হয়ে উঠেছে তো।

আশ্রমে আগে সাপ ছিল প্রচুর, এখন সে তুলনায় অনেক কম। লোকালয় বেড়েছে, সাপেরা তফাতে থাকে। মানুষকে তারা ভয় পায়। আবার অনেকে বলেন সাপ এখন আরো বেড়েছে। এই যে লাল বাঁধের পাড়ে রিজার্ভ ফরেস্ট হয়েছে সেখানে নিশ্চিন্ত মনে সাপেরা বংশবৃদ্ধি করে চলেছে। কথাটা সত্যি হতেও পারে। কারণ সেদিন জিৎভূমের বাগানে দেখি একটা ব্যাণ্ডেড্ ক্রাইট। এ সাপ এখানে আগে দেখি নি। জিৎভূমের কাছেই তো রিজার্ভ ফরেস্ট— ঘুরতে ঘুরতে বোধ হয় চলে এসেছে সাপটা। মারাত্মক সাপ। সাঁওতাল-মালীটা খুব ধীর-স্থির ভাবে সাপ মারে, ঘাব্ড়ায় না কখনো। সে দেখছি কাঁপছে, বলছে, মা ডর লেগে গেল। এ কামড়ালে আর ওঝা ডাকা হবে না— অর্থাৎ ওঝা ডাকার সময় পাওয়া যাবে না।

আগে যেখানে-সেখানে সাপ চলাচল করত, মোটা মোটা মস্ত গোখরো সাপ। কোনার্কে যেতে কুয়োর ধারে শজনে গাছ ছিল একটা— শজনে গাছের কী বাহার— শজনের ফুলের একটা চাপা সৌরভে জায়গাটা মম' করত; সেটা নেই। কুয়োটাও বন্ধ করে দিয়েছে। সেইখানে ছিল মেহেদির বেড়া, মাঝখান দিয়ে ফাঁকা একফালি পথ। এই পথ দিয়ে কোনার্কে আসা-যাওয়া করতাম। কত দিন রাত্রিবেলা পথটুকু পার হবার সময়ে দেখেছি একটা মোটা গোখরো, সেও পথ

পার হচ্ছে— এদিককার বেড়ার গোড়া হতে ওদিককার বেড়ার গোড়ার দিকে চলেছে। আমাদের একটা অভ্যেসই হয়ে গিয়েছিল রাত্রিবেলা পায়ে চলে যেতে-আসতে নজরটা পায়ের পাতার দিকে নেমে থাকত। টর্চের তখন তত চল ছিল না, কিন্তু অন্ধকারেও স্পষ্ট সাপ চোখে পড়ত। একটু থেমে থাকতাম— সাপটা চলে যেত। অন্ধকারের কালোর মধ্যে আরো খানিকটা কালো লম্বা কিছু নড়ে-চড়ে যেতে দেখলেই বুঝতাম সাপ। সবাই বলে কাঁকরের উপরে সাপ চলে না, চলতে পারে না। বুক ঘষড়ে চলে সাপ— কাঁকরে তাদের অসুবিধা হয়। কাঁকরের উপরে কত সাপ চলছে দেখেছি। উত্তরায়ণের গেটের কাছে পথ পারাপার করত আর-একটা গোখরো। কোনার্কের বাড়িতে স্নানের ঘরের পিছনে মাটিতে গর্তে কোথায় যেন ছিল গোখরোর বাসা। প্রতি বছরই দেখতাম সাপ, স্নানের ঘরে দেখেছি। যে লম্বা বারান্দায় ঘুমোতাম সেই বারান্দায় দেখেছি। অভিজিৎ কতবার সাপের মুখে পড়েছে। সাপকে সব সময়ে যে ছেড়ে দেওয়া হত— তা নয়। সুবিধে পেলে দারোয়ান মালীদের হাঁকডাক করে এনে মারাও হত।

একবার— অভিজিৎ তখন বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে। রাত্রিবেলা— তখনো আমরা খাচ্ছি— অভিজিতের খাওয়া সারা হয়ে গেছে, বললাম, যাও তা হলে— বারান্দার খাটে বিছানাগুলি করে ফেলো। অভিজিৎ বিছানা পেতে খাটে মশারির ডাণ্ডাগুলি লাগাতে যাবে— সেগুলি থাকত বারান্দার একটু নীচে একদিকে দাঁড় করানো, সেই কাঠগুলি আনতে গিয়ে অভিজিৎ 'সা-প' বলে চিৎকার করে উঠল। করেই থেমে গেল। তাড়াতাড়ি আমরা বেরিয়ে এলাম। অভিজিৎ কাঠ হাতে নিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে খাটের ছত্রীগুলি আনতে অভিজিৎ নেমেছিল নীচে— দেখে তার দু পায়ের মাঝখানে কালো মতো লম্বা কী একটা নড়ে উঠল। দেখেই লাফ দিয়ে উঠে পড়েছে বারান্দায়।

সাপটা তখনো সেখানে, জায়গা খুঁজছে কোন্‌দিক দিয়ে পালাবে। প্রকাণ্ড এক গোখরো, যেমন মোটা তেমনি লম্বা। এমন দেখা যায় না সচরাচর। অভিজিতের বাবা সাপ সম্বন্ধে খুব উৎসুক। অনেক বই পড়েছেন এ নিয়ে। বললেন— এ একেবারে 'ফুল-গ্রোন'।

কোনার্কে কোনায় কোনায় ছোটো ছোটো খুপরি ঘর বানিয়েছিলেন রথীদা— এটা-সেটা রাখবার জন্য। সাপ তারই একটা ছোটো ঘরে ঢুকে পড়ল। কেউ আর সাহস করে না সেই ঘরে ঢুকে সাপটাকে মারতে। রথীদার ষণ্ডাগুণ্ডা পশ্চিমা

দারোয়ান তো ঠকঠক করে কাঁপতেই লাগল ভয়ে। কারণ তাকেই তো বলা হবে সাপটাকে মারবার জন্ত। আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনছি, গজরাচ্ছে সাপটা. কী ভয়ংকর রাগ সাপের। এই সাপকে ছেড়ে দেওয়াতেও বিপদ অনেকখানি। রথীদাও এসেছেন সাপের খবর পেয়ে। মালী, লোকজন, দারোয়ানের ভিড় জমল। লম্বা বাঁশ দিয়ে ধাক্কা মেরে মেরে দরজাটা ভাঙা হল। দূর হতে বাতি ধরা হল— সাপটাকে মারা হল, মারল উড়ে মালীটাই। মরা সাপটাকে তখন বল্লমে গেঁথে দারোয়ান বাইরে নিয়ে এল—। বিরাট সাপ—। সেই তখন ভেবেছি— আজও ভাবি, সেদিন আমার অভিজিৎকে বাঁচালো কে ?

প্রতি বছর কিছু সাপ মারা হতই। একবার গরমের ছুটিতে আশ্রমে একটু চুরি-ডাকাতির উপদ্রব হল। বাইরে হতে একটা দল এসে থাকবে, তারা বাড়িতে ঢুকেই খানিকটা মারপিট করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে মেয়েদের গয়নাগাঁটি নিয়ে চলে যেত। দু-তিনটে বাড়িতে এরকম হবার পর অবশ্য থেমে গেল ব্যাপারটা।

ডাকাতরা থামলেও ভয় তো থামে না। শিক্ষকরা ছাত্ররা মিলে পালা করে দলে দলে আশ্রম পাহারা দিতে লাগলেন। রাত্রের খাওয়ার পরই বাড়ির পুরুষরা লাঠি লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে যান, ভোর রাত্রে ফেরেন। সেবারে ডাকাত ধরা পড়ল না বটে, তবে বিরাট বিরাট কয়েকটা সাপ প্রাণ হারালো।

প্রায় শুনি, কাল রাত্রে সাপ মেরেছেন পাহারা দেবার দল। মরা সাপটাকে তাঁরা গৌরপ্রাঙ্গণে এনে ফেলেন, সকালে সেই সাপ দেখতে ছুটি আমরা সেখানে। প্রতিযোগিতার কলরব জাগে পাহারাদারদের দলে— কোন্ দল মেরেছে সব চয়ে লম্বা সাপটাকে। সে বছরের পুরো ছুটিটা চলল এইভাবে। এত যে সাপ ছিল আশ্রমে, কিন্তু কাউকে সাপে কেটেছে বলে শোনা যায় নি। বরং এখন তার ব্যতিক্রম ঘটছে। তেমনি ওষুধও বেরিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যায় বোলপুরের হাসপাতালে, নিরাময় হয়ে ফেরে।

গোখরো চন্দ্রবোড়া আর চিতি, এই তিন রকমের সাপই ছিল আশ্রমে বেশি— তিনই বিষাক্ত। চন্দ্রবোড়াগুলি থাকে মেহেদি বেড়ার ধারে ধারে। মোটা বেঁটে, গায়ে চক্কর চক্কর নক্‌শা;— দেখতে সুন্দর নক্‌শাগুলি। চিতিগুলিকে নিয়েই মুশকিল, দেয়াল বেয়ে ওঠে, ঘরে ঢোকে, দরজা-জানালার পাল্লার উপরে টান টান হয়ে শুয়ে থাকে। পাল্লা বন্ধ করতে গেলেই থুপ করে মাটিতে পড়ে যায় সরু লম্বা এই চিতিগুলি। অন্য সাপও আছে— ঢেম্‌না হলহলে। নির্বিষ। ওদের

কেউ গ্রাহ্য করে না। হলহলেগুলিকে পকেটে পুরে ছেলেরা ঘুরে বেড়ায়।

পোষা একটা সাপ ছিল নীলিমাদির। অতি রূপসী সাপ। তন্বী দেহ, গায়ে ঘন সবুজ উজ্জ্বল হলুদ আর সিঁদুরে লাল রঙের নক্‌শা। ঝাঁপিতে থাকত, মাসে কি সপ্তাহে ঠিক মনে নেই—একটা করে টিকটিকি খেতে দেওয়া হত তাকে। মাঝে মাঝে নীলিমাদি আড়াই প্যাঁচ অনন্তের মতো সাপটাকে হাতে জড়িয়ে রাখতেন, মাঝে মাঝে গলায় মালার মতো ঝুলিয়ে রাখতেন। আমরা তফাত থেকে দেখতাম। সাপে মানুষে সখ্য। নীলিমাদি হাসতেন আমাদের ভীত ভাব দেখে।

সাপ ভালোবাসে এমন আর-একটি মেয়েকেও দেখেছি এখানে। বিদেশী মেয়ে, এখানে এসে এ-দেশী নাম নিয়েছিল—সাবিত্রী। কলাভবনে ভর্তি হল, ইণ্ডিয়ান স্টাইলে ছবি আঁকা শিখবে। অজন্তার স্টাইলটাই তার পছন্দ। কলাভবনের ছাত্রী, ভাব হয়ে গেল তার সঙ্গে। কিছুদিন পরেই টের পাওয়া গেল তার বাক্সে বোঁচকায় সাপ ভরা। একা একা যায় খোয়াই বেড়াতে সাপের খোঁজে। একদিন একটা গোখরোর বাচ্চা ধরে নিয়ে এল। কথাটা রটতে দেরি হল না। রতনকুঠিতে থাকত সাবিত্রী, ওর ঘরের দিকে কেউ আর যায় না, ওর কাছাকাছিও নয়—কি জানি দেহের কোথায় কী সাপ লুকিয়ে রেখেছে সে। নন্দদা পড়লেন সব চেয়ে মুশকিলে। কাছে বসে ছবি আঁকা শেখাতে হয়।

কিছুদিন পর কলকাতায় চলে গেল সাবিত্রী, এক বাঙালি ভদ্রলোককে বিয়ে করল। তিনিও সাপের বিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। নানা জাতের বিষাক্ত সাপ আছে তাঁর ঘর ভরা। সাপের বিষ থেকে কী এক ওষুধ বার করবার পরীক্ষায় মেতে আছেন। তাঁর সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল। কলকাতায় গেলে সাবিত্রী আসত দেখা করতে। শেষ দেখা হল দিল্লিতে কনট প্লেসে একটা বইয়ের দোকানে। চিনতে পারি নি, যদিও তেমনিই ছিপছিপে দেহ ছিল, কিন্তু বয়স হয়েছে—মুখের গড়ন কিছুটা বদলে গেছে। তা ছাড়া তার পরনে ছিল পাঞ্জাবি—মেয়েদের মতো সালোয়ার পাঞ্জাবি—ধবধবে সাদা, ওড়নাটা ছিল নান্‌দের মতো কপাল ঘিরে ঢাকা।

সাবিত্রীই চিনল আমাকে, এগিয়ে এল। বদলে গেছে মনে হল। ধীর শান্ত ভাব। দোকানের তাক থেকে অ্যালবাম আকারের একটা বই টেনে এনে বলল, এই দেখো, এই বইটা আমি লিখেছি। যখন যা মনে প্রশ্ন জেগেছে—যখন যা উত্তর পেয়েছি—সেই সব কথাই লিখেছি। বইটার নাম 'থাউজেণ্ড থট্‌স্'।

আর-এক 'সাবিত্রী'র কথা মনে পড়ে। এ তার আসল নাম নয়— দেওয়া নাম।

সরোজিনী নাইডু তাঁর কন্যা পদ্মজাকে একবার পাঠিয়ে দিলেন এখানে। পদ্মজার স্বাস্থ্য সুস্থ ছিল না, মাদ্রাজে কিছুকাল বিশ্রামে ছিলেন। ফিরবার পথে মা চাইলেন মেয়ে কিছুদিন কাটিয়ে যায় গুরুদেবের সান্নিধ্যে। মেয়ের স্বাস্থ্যের জন্য বড়ো ভাবনা ছিল মায়ের। তাই আমার স্বামীকে লিখলেন— আমাকে তোমরা 'আন্টি' বল— পদ্মজাকে সেইভাবে 'সিস্টার' বলে দেখো।

পদ্মজা এলেন। শ্যামলীতে গুরুদেব থাকেন। আমরা থাকি কোনার্কে। শ্যামলীর ঐ-দিকটায় কোনার্কের 'এল' শেপের ঘরখানা— যে ঘরে গুরুদেব থাকতেন এককালে, যে ঘরে শোবার ঘর, বসবার ঘর, লিখবার ঘর, ড্রেসিংরুম, বাথরুম— সব ছিল একসঙ্গে। সেই ঘরে থাকতে দেওয়া হল পদ্মজাকে।

পদ্মজাকে আমরা 'দিদি' বলে ডাকি, তাঁর দেখাশোনা করি। খাওয়া-দাওয়া দিদি করেন বোঠানের কাছে।

গুরুদেবও সর্বদা পদ্মজার খোঁজ-খবর করেন। পদ্মজাও দিনে বার দুই-তিন গুরুদেবের কাছে গিয়ে বসেন, নানা কথা বলেন। বেশ খুশিতে আছেন পদ্মজা। মায়ের মতো অতটা না হলেও হাসিতে গল্পেতে জমাতে পারেন। কোনার্কের আড্ডা সরগরম হয়ে ওঠে। আমার খুব ভালো লাগে।

একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল এ সময়ে।

আশ্রমে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের আনাগোনার বিরাম নেই। কেউ কিছুকাল থাকে, কেউ অল্পেতেই সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যায়। এই সময়ে একটি বিদেশী মেয়ে এল— কোন্ দেশের মেয়ে, কী তার নাম, না বলাই ভালো। কারণ সে এ দেশেই থেকে গিয়েছিল, এখনো আছে কি নেই জানি না। গল্পটুকু গল্প আকারেই থাকুক, নাম-ধামের কী দরকার? তবে শ্রীভবনের মেয়েরা তার একটা নাম দিয়েছিল।

শ্রীভবনেই সে থাকে। মেয়েরা এর কাছ হতে জানতে পারে যে, সে এ দেশে এসেছে একটি 'স্বামী'র খোঁজে। শ্রীভবনের মেয়েরা, বিশেষ করে এই বয়সের মেয়েরা দুষ্টুমিতে ভরা। তারা একে বোঝালো— পুরাকালে সাবিত্রী বলে এক রাজকন্যা ছিল— সেও এমনি করে স্বামীর খোঁজে বেরিয়েছিল। তুমিও তো তাই। খুব মিল তোমাদের দুজনের! তোমারও নাম রাখলাম আমরা 'সাবিত্রী'। মেয়েটি খুব খুশি হল এ নাম পেয়ে।

এর পর সাবিত্রীকে নিয়ে চলল মেয়েদের নানা রকম দুষ্টুমি নিত্যনতুন। তারা আশ্রম ঘুরে ঘুরে মাস্টারমশায়দের দেখায়— কাকে পছন্দ তার?

একদিন দেখি মেয়েরা সব আমাকে দেখলেই হাসছে। 'রানীদি কেমন আছেন'— কথা শেষ হয় না, খিক্‌খিক্ করে হাসে। ব্যাপার কী? 'এটা' একদিন তার প্রবল হাসি ছড়াতে ছড়াতে এসে বলল, রানী, জানো, সাবিত্রী সবাইকে দেখেশুনে একমাত্র অনিলবাবুকেই পছন্দ করে রেখেছে। এটা-র হাসি থামে না। এটা-ই দিনে দিনে খবর নিয়ে আসে— মেয়েরা সাবিত্রীকে বুঝিয়েছে হিন্দুদের একটি বউ থাকতেও আরো বিবাহে দোষ নেই, এ হয় এদেশে। তবে কিনা বড়ো বউয়ের সঙ্গে ভাব করে নিতে হয় আগে। তাকে খুশি করতে পারলে আর কোনো ভাবনা নেই।

সাবিত্রী কোনার্কে আসতে লাগল। আমি যত্ন করেই তাকে চা কফি খাওয়াই। সাবিত্রী বসে থাকে, আমার স্বামী অফিস থেকে ফিরে এলে তাঁকে দেখে দুটো কথা বলে তবে যায়। প্রথম দিকে একবেলাই আসত, পরে দুবেলাই আসতে লাগল। পদ্মজা তো ঘরের দিদির মতো সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন, আমাদের সংসারের সব খবর জানেন। একদিন হাসতে হাসতে কোনো ফাঁকে গুরুদেবকে গিয়ে বলেছেন ঘটনাটা। সরস করেই বলেছেন।

পরদিন সকালে স্বামী দরকারি কাগজপত্র নিয়ে গুরুদেবের কাছে গেছেন। গুরুদেব কোনোটাতে সই করলেন, কোনোটা লিখে দিলেন, কোনো ড্রাফট্ তাড়াতাড়ি টাইপ করবার জন্য বললেন, কোনো চিঠি আজই পাঠাবার জন্য তাড়া দিলেন। স্বামী সব-কিছু বুঝে নিয়ে হাতে কাগজপত্র তুলে চলে আসবেন— গুরুদেব দেখলেন ঐ দূরে সাবিত্রী ঢুকছে উত্তরায়ণের গেট দিয়ে। বুঝলেন, কোনার্কেই আসছে সে। গুরুদেব টেবিল হতে কয়েকটা বিলিতি ম্যাগাজিন আমার স্বামীর দিকে ঠেলে দিয়ে পাশের মোড়াটা দেখিয়ে বললেন, নে বোস্, এখানে বসে এগুলি দেখ।

যতক্ষণ না সাবিত্রীকে চলে যেতে দেখলেন, গুরুদেব স্বামীকে কাছে বসিয়ে রাখলেন।

কোনার্কে এসে স্বামীর কী উষ্মা। যত তিনি রাগবিরক্তি প্রকাশ করেন— পদ্মজা ততই হাসেন।

এই দিনটিকে আমরা বলি 'গান্ধীপুণ্যাহ'। ছাত্রছাত্রী শিক্ষক আশ্রমবাসী— সকলের সমান উৎসাহ এই দিনে। সকাল হতেই সকলে আশ্রমে ছুটে এসে ছড়িয়ে পড়ি। আগে হতে ঠিক করা থাকে— কোন্ কাজ কারা করবে। কোনো দল যায় রান্নাঘরে, কোনো দল যায় পথ ঝাঁট দিতে, কোনো দল বাগান পরিষ্কার করতে, কোনো-কোনো দল ভাগাভাগি করে যায় 'ভবনগুলি' সাফ করতে। আজ মেথর মজুর পাচক সকলের ছুটি। তারা আজ অতিথি আমাদের।

রান্নাঘরে আজ সকলের খাওয়া দুপুরে। দলে দলে ছেলেমেয়েরা তরকারি কুটছে। বিরাট গামলা ভরতি ডাল চাল ধুচ্ছে। যজ্ঞি রান্নার কড়াই হাঁড়ি উনুনে চড়াচ্ছে নামাচ্ছে— এ-এক ভরাট উল্লাস।

এ দিন রসিক, মধু— সকল মেথর স্নান করে হলুদ রঙে ছোপানো ধুতি পরে সকলের সঙ্গে এক সারিতে বসে খায়, হাসে। না-বলার মধ্যে আশ্রমে আমাদের জাতিভেদ কখন কেমন করে মুছে গেছে— টেরও পাই নি কখনো। অতি সহজ-ভাবে হয়েছে এ-সব।

নন্দদা আজ সব চেয়ে কঠিন কাজে ব্রতী। এ কাজটা প্রতিবারই ইনি আগ্রহ করে নেন, হতে হতে এমন হয়েছে এ কাজটা যেন তাঁরই অধিকারভুক্ত, আর কারো নয়। আশ্রমে তখনো সব জায়গায় স্যানিটারি ল্যাট্রিন হয় নি— কাজ চলেছে। পান্থশালায় ল্যাট্রিন ও আরো দু-একটা জায়গায় এখনো আগের মতো ব্যবস্থা। মাটির বড়ো বড়ো গামলা, চাড়িতে, এক সপ্তাহ দু সপ্তাহের ময়লা। নন্দদা ঝাড়ু বালতি আর কয়েকজন ছাত্র নিয়ে এইগুলি আজ পরিষ্কার করেন। মাথায় বাঁদিপোতার লাল গামছা বাঁধা, হাঁটু অবধি পাজামা তোলা, খালি পা, নন্দদার এই এক মূর্তি। কে একজন কোথা হতে একটি কেয়াফুল এনে দিয়েছে হাতে, নন্দদা হাসতে হাসতে ফুলটি ছেলেদের নাকের কাছে ধরেন, নিজেও একবার ঘ্রাণ নেন। ময়লার গন্ধ ফুলের সৌরভ যেন সমান তাঁর কাছে আজ। আমরা দেখে হাসি।

আফ্রিকা থেকে গান্ধীজী এলেন— যেদিন প্রথম এলেন এখানে, সেই দিনটিকে এখনো পালন করি আমরা এইভাবে।

গান্ধীজী কয়েকবারই এসেছেন আশ্রমে। গুরুদেব থাকতে এসেছেন, গুরুদেব

যাবার পর এসেছেন। গুরুদেব বলেছিলেন তাঁকে, আমি যখন থাকব না— তুমি এদের দেখো।

সেবার দেখতে এলেন আমাদের, সুখদুঃখ জানতে এলেন। অসুবিধে-অনটনের খবর নিলেন। শ্যামলীতেই ছিলেন— এখানেই ডাকলেন এক সন্ধেয় শিক্ষক-অধ্যক্ষদের। মাঝের ঘরখানাতেই বসেছিলেন সবাইকে নিয়ে। দরজার পাশে বাইরের দিকে বসেছিলাম আমি। আমি কোনার্কে থাকি— আমার আসা-যাওয়ায় বাধা ছিল না কিছু। সর্বদাই তাঁর কাছাকাছি ঘোরাফেরা করতাম।

গান্ধীজী বললেন, কার কী অনুযোগ অভিযোগ আছে বলো?

এক-এক করে জিজ্ঞেস করলেন প্রথমে বিভাগীয় কর্তাদের। শিক্ষকদেরও জিজ্ঞেস করলেন। নিখুঁত কাজের মানুষ ছিলেন তিনি। বললেন, মন খুলে বলো সবাই— নির্ভাবনায় বলো।

বলবার আর কী আছে। সেরকম তো ঘটে নি কিছু। একজন শুধু বললেন, আমাদের মনের যোগাযোগ নেই।

তা এরকম তো গুরুদেব থাকতেও ঘটেছে, এ ঘটেই থাকে। সবার সঙ্গে কি আর সবার মনের যোগ ঘটে?

এর পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন কাজকর্মের কথা— অর্থসমস্যার কথা, আলোচনা করলেন আশ্রমের নানা শুভ-সম্ভাবনার।

সেদিনের সন্ধেটা যেন হুবহু দেখতে পাই আজও চোখের সামনে। সেদিন মনে হয়েছিল— কেউ একজন আছেন, যিনি আমাদের নিয়ে ভাবছেন।

এইবারে অনেক কাছের করে পেয়েছিলাম গান্ধীজীকে। সকালবেলা তিনি হাঁটতে বের হতেন, কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম, তিনি একখানা হাত আমার কাঁধে রাখতেন। রাখতেন যে, মনে হত একটা বিরাট থাবা পড়ল কাঁধের উপরে। এই থাবার ওজন পেয়েছিলাম প্রথম দিন সোদপুরে। গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে আসবেন, কলকাতায় সোদপুরে সতীশ দাশগুপ্ত মশায়ের আশ্রমে দুদিন থাকবেন, পরে আসবেন। আমি তখন কলকাতায়, আমার স্বামী জানালেন— রথীদা-বোঠানের ইচ্ছা আমি যেন সোদপুরে গিয়ে ভালো করে দেখে নিই তিনি কখন কী খান, কখন কী করেন। এখানে এলে যেন ত্রুটি না ঘটে কোনো।

সোদপুরে গিয়ে একরাত একদিন ছিলাম। যেদিন বিকেলে গেলাম— সেই-দিনই গান্ধীজী এসে পৌঁছলেন মস্ত দলবল নিয়ে, সময় নষ্ট করেন না গান্ধীজী,

আগে হতেই ঠিক ছিল, সন্ধে-রাত্রে রাজভবনে গেলেন বৃটিশ গভর্নর-এর সঙ্গে দেখা করতে। কলকাতার বাইরে, ঝিঁঝি-ডাকা রাত অল্পেতেই মনে হয় গভীর রাত। আধো অন্ধকার বাগ-বাগিচা। আশ্রম নীরব। আমি বাগানের সরু পথ ধরে বাঁধানো ঘাটের পাশ দিয়ে একপায়ে দুপায়ে ঘুরছি একাকী। একবার সামনেটা পর্যন্ত যাচ্ছি— আবার ভিতরের দিকে চলে আসছি। বড়ো ভালো লাগছে। এমন সময়ে হুস্ করে একটা মোটর এসে থামল ভিতরের বাগানে। ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়েছিলাম আমি। মোটর হতে গান্ধীজী নামলেন, সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও নামলেন। আমি দেখছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। গান্ধীজী দু-পা এগিয়ে আমার কাঁধে ডান হাতখানা রাখলেন। সিংহের থাবা কি রকম জানি না— কিন্তু সেই উপমাটাই মনে এল। মনে হল যেন সিংহের থাবাটা পড়ল কাঁধের উপরে। তাঁর হাত রাখবার ধরনটাই ছিল এমনি।

গান্ধীজী এসেছেন— সমস্ত আশ্রম আলোড়িত। তিনি সব 'ভবনে' যাবেন, সর্বত্র ঘুরবেন। এবারেই এণ্ড্রুজ মেমোরিয়াল হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করবেন। শান্তিনিকেতন হতে সোজা শ্রীনিকেতনের পথে— পথের ধারে হবে এই হাসপাতাল। বেশ-খানিকটা পথ। গান্ধীজী বললেন, হেঁটে যাবেন। স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, ক' মিনিট লাগবে যেতে? স্বামী বললেন, কুড়ি-পঁচিশ মিনিট।

গান্ধীজী বললেন, দুটো সংখ্যা দিলে কেন? সঠিক মিনিট বলতে পারলে না?

গান্ধীজী তাঁর কোমরে ঝোলানো ঘড়ি দেখে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছে আবার ঘড়ি দেখলেন, স্বামীকে আর-একবার তিরস্কার করলেন, তোমার হিসাব কোনোটাই ঠিক হল না। এই দেখো— সতেরো মিনিট লেগেছে আসতে।

এই ব্যাপারের পর হতে আশ্রমের সকলে আরো তটস্থ। দিন ক্ষণ সন তারিখ— টাকাপয়সার কড়াক্রান্তি হিসাব সকলে মুখস্থ করে রাখতে লাগলেন, কখন কোন্টা জিজ্ঞেস করে বসবেন গান্ধীজী— ঠেকতে না হয় কিছুতে।

আমাকে কিন্তু বকুনি দেন নি গান্ধীজী, বকুনি দেবার মতো ঘটেছিল ঘটনা। সকালে বেড়াতে বেরিয়েছেন— আমি আর আভা সঙ্গে, দুজনের কাঁধে দুই হাত। যেতে যেতে লালবাঁধের দিকে নজর পড়ল। আমি সাড়ম্বরে গল্প বলতে লাগলাম লালবাঁধ কি করে হল। গান্ধীজী জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ সালে হল? হেসে ফেললাম, বললাম, বাপুজী— তা আমার মনে থাকে না।

বললেন, কত টাকা খরচ হয়েছে ?

আমি হাসতেই লাগলাম, বললাম, এ তো আমার আরো মনে থাকে না।

গান্ধীজীও হাসলেন। একটুও বকুনি দেন নি আমাকে। রাগও করেন নি।

দলে অনেকে এসেছেন এবারে। সবাইকে গান্ধীজী ভালো করে শান্তিনিকেতন ঘুরে ঘুরে দেখতে বললেন। কিছু যেন বাদ না যায় দেখবার। একদিন সবাইকে শ্রীনিকেতনে পাঠিয়ে দিলেন— সেখানকার কাজকর্ম দেখে আসবার জন্য। কেউ কেউ ইতস্তত করতে লাগলেন— তাঁর খাওয়া ঠিকমত হবে কি না, তাঁর রান্না ঠিক-মত হবে কি না।

গান্ধীজী বললেন, রানী, তুই পারবি না আমার খাবার করে দিতে ?

বললাম, পারব।

তিনি জোর আদেশ দিলেন— কেউ থাকবে না, সবাই একসঙ্গে যাও, ভালো করে সব দেখে এসো। দলে দলে যাওয়া নয়।

তাঁর আদেশে সবাইকে যেতে হল।

আমি এ দুদিন আভার সঙ্গে থেকে থেকে দেখেছিলাম তিনি কী খান, কিভাবে তাঁর খাবার তৈরি হয়। কুকারে সিদ্ধ হয় আট আউন্স তরকারি— সব রকম মিলিয়ে— মায় পালং শাকও। সিদ্ধ হয় বারোটা খেজুর। ষোলো আউন্স ছাগলের দুধ জ্বাল দিয়ে কমাতে হয় চার আউন্সে। আট আউন্স কাঁচা তরকারি লাগে— গাজর মুলো শশা টমাটো। আর থাকে একটু ধনে পাতার চাট্‌নি, আদা আর দুটো পাতি লেবুর রস। নারকেলও একটু।

সবই ঠিক ঠিক করলাম। দুধ জ্বাল দিয়ে কাঁচা তরকারি কেটে পাতিলেবুর রস করে রাখলাম। কুকারে তরকারি খেজুর সিদ্ধ বসিয়ে দিলাম— খাবার সময় হলেই খুলে বের করব।

খাবার সময় হল। একটু তো ঘাবড়েই আছি। ভয়, এক চুল ত্রুটি হলে না-জানি কী হয়।

কুকার খুলতে দেখি— সিদ্ধ তরকারি ঠিকই আছে, খেজুরের বাটিতে কি করে যেন অনেকটা জল ঢুকে গেছে। আভার বেলায় দেখেছি মাখো মাখো জল থাকে খেজুরে। এ খেজুর তো পানসে লাগবে খেতে। তিনি টের পাবেন। কী করি ! সিদ্ধ খেজুরের বাটি হতে গরম বাষ্প ঢেকে দিচ্ছে চোখ। ভাবলাম দৌড়ে গিয়ে

উদয়নের রান্নাঘরের উনুনে বাটিটা বসিয়ে জলটা শুষিয়ে আনি। কিন্তু সময় নেই। বাটির বাড়তি জলটা ঢেলে ফেলে দিলাম।

খাবার সাজিয়ে এনে ধরলাম। শ্যামলীতে আগে যে ঘর গুরুদেবের খাবার ঘর ছিল— একবার বৃষ্টিতে ছাদ ভিজে গেল। ছাদটা তখন ভেঙে ফেলা হল। এখন সে জায়গাটা খোলা চাতালের মতো, হাওয়া আসে রোদ আসে— ছায়াও আসে জাম গাছ হতে। এইখানে তক্তার উপরে বসেছেন গান্ধীজী। সামনে ছোটো একটা টেবিলে খাবার। গান্ধীজী একটা বড়ো বাটিতে খাদ্যবস্তু ঢেলে টেবিল-স্পুনের মতো বড়ো একটা কাঠের চামচে করে সব-কিছু ঘেঁটেঘুঁটে নিলেন। নিয়ে ঐ চামচ দিয়েই পদার্থটা ধীরে ধীরে খেতে লাগলেন। এমন রসিয়ে খেলেন— দেখে মনে হচ্ছিল না-জানি কী একটা সুস্বাদু রান্না খাচ্ছেন। কাঁচা সবজি হাতে করে তুলে তুলে মুখে দিলেন। তাও অনেকক্ষণ ধরে খেলেন। তাঁর খাওয়াটাই ছিল এই রকমের, দেখতে বড়ো সুখকর।

চা তিনি খেতেন না। বিকেলে চায়ের সময়ে একটা বড়ো কাঁসার গ্লাসে একগ্লাস গরম জলে খানিকটা আখের গুড় মিশিয়ে ঐ কাঠের চামচ দিয়ে একটু একটু করে এমন ভাবে খেতেন— দেখে মনে হত আমিও একটু খাই। কিন্তু কী আর তেমন স্বাদের হবে বস্তুটা। ঠাণ্ডা জলে লেবুপাতা চটকে গুড়ের শরবত খাই গরমকালে, সে স্বাদ কি আর আছে এতে? তবে কে কিভাবে খায়— ঐ ভাবটা নিয়েই জিনিসের ভালোমন্দ। গুরুদেব নিমপাতার রস খেতেন, মনে হত পেস্তাবাটা শরবত খাচ্ছেন।

সেবারে সোদপুরেই দেখেছিলাম ঘটনাটা, বড়ো ভালো লেগেছিল— না বলে পারছি না। গান্ধীজী রোজ মালিশ নেন দেহে। বাগানে বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে খানিকটা জায়গা, ভিতরে উঁচু লম্বা চৌকি— ছয় ফুট লম্বা, তিন ফুট উঁচু, দু ফুট চওড়া। মাথার দিকে একটা ইট দিয়ে চৌকিটা তোলা। এতে শুয়ে মালিশ নেবেন। গান্ধীজী এসেছেন— তাঁর জন্য বিধিব্যবস্থা করা। দলের লোক কেউ বলেন এটা করো, কেউ বলেন ওটা চাই। সোদপুর আশ্রমে লোকজনের হন্তদন্ত অবস্থা। একজন মালিশের জায়গা দেখে বললেন, বাপুজীর মুখে রোদ লাগবে, উপরে একটা চাদোয়া টানিয়ে দাও।

আবার ছুটোছুটি— দড়াদড়ি, চাদর, হৈ-চৈ। সময় হয়ে গেছে। মালিশের চাদর টানাতে গিয়ে গাছের এ ডালে ও ডালে দড়ি বেঁধে তাড়াহুড়োয় টানাটানি

শান্তিনিকেতনে গান্ধীজিকে আহার পরিবেশন

করতে গিয়ে একটা মোটা ডাল মটমট করে ভেঙে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একজন ছুটল— পুকুর থেকে খাব্‌লা ভরে পাঁক মাটি নিয়ে এল। পাট এল, চট এল। ভাঙা ডালটি তুলে নিয়ে ক্ষতস্থানে জুড়ে পাঁক মাটির প্রলেপ দিয়ে পাট চট জড়িয়ে মুহূর্তে ডালে অতি সুন্দর করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল। পাঁক মাটির প্রলেপ যখন দিচ্ছিল— মনে হচ্ছিল যেন মলম লাগাচ্ছে ডাক্তার— এমনই ছিল লোকটির দরদী হাতের আঙুলগুলি। বড়ো ভালো লেগেছিল ব্যাপারটা। পরে অনেকবার ভেবেছি— নিশ্চয়ই জোড়া লেগে গিয়েছিল ভাঙা ডালটি।

আমাদের এখানে কিন্তু গান্ধীজীর কোনো কাজ নিয়ে কোনো হৈ-হল্লা ছিল না। সবই শান্তভাবে হয়ে চলছিল। আভার কাছে শুনেছি— এখানে আসবার পূর্বে তিনি দলের সবাইকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যেন কোনোরূপ অসুবিধার সৃষ্টি না করে কেউ এখানে।

দুপুরে খাওয়ার পর গান্ধীজী এই চৌকিতেই শুয়ে পড়লেন। অল্প অল্প রোদ আসছিল পায়ের কাছে। তিনি আরামই পাচ্ছিলেন। এ সময়ে কেউ-না-কেউ ওঁর পা দুটি টিপে দেয়। দেখেছি, যেবার কস্তুরবা এসেছিলেন সঙ্গে, শ্যামলীতেই ছিলেন, শ্যামলীর বাঁ দিকের ছোটো ঘরখানায় মাটিতে ফরাশ পাতা। গান্ধীজী খাবার পরে শুয়ে পড়লেন সেখানে, কস্তুরবা বসে বসে টিপে দিতে লাগলেন পা দুখানি। মনে হচ্ছিল কস্তুরবারও যেন চোখে ঘুম নেমে আসছে, বয়স হয়েছে তাঁরও। কিন্তু স্বামীসেবা আগে।

এবারে গান্ধীজী রাত্রে শুতেন মৃন্ময়ীর চাতালে, খোলা আকাশের নীচে। একটা সাদা চাদর মাথা কান ঢেকে কাঁধ বুক পিঠ ঘিরে এমনভাবে জড়ানো হত যে, কোনো দিক দিয়ে হাওয়া ঢুকতে পেত না। এই চাদর জড়ানোতেও খুঁত-অখুঁত ছিল। আমি দেখে দেখে শিখে নিয়েছিলাম। সেদিন রাত্রে আমিই জড়িয়ে দিলাম চাদরখানা— ঠিক ঠিক তেমনি করে। গান্ধীজী হাসলেন।

গান্ধীজী শুয়ে পড়লে এ সময়ে আমি কিছুক্ষণ পাশে বসে থাকি। এই সময়টুকু আমার বড়ো ভালো লাগে। আশ্রমের হালকা খবর এটা-ওটা যা জিজ্ঞেস করেন বলি, আমার আপন মনের দ্বন্দ্ব সমস্যার কথা বলি। একটা কথা কাঁটা হয়ে লেগে আছে মনে, একবার অন্নদা চৌধুরী মশায় বলরামপুরে তাঁদের একটা গঠনমূলক কাজের সেণ্টারে নিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে। দু রাত ছিলাম আমি। সেখানকার কয়েক জন তীব্র অনুযোগ করেছিলেন আন্দোলনে শান্তিনিকেতন নেই কেন?

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়, আন্দোলনে যোগ আমরা দিয়েছিলাম অবশ্য, তবে শান্তিনিকেতনের কিছু ভাঙচুর না হয় সেদিকে যত্ন ছিল— লক্ষ্যও ছিল। গুরুদেব নেই, শান্তিনিকেতন একবার ভাঙলে আবার তাকে গড়ে তুলবে কে সে-জন?

সেই কথাই বললাম এ দিন। বললাম, তা হলে কী করা উচিত আমাদের?

গান্ধীজী বললেন, দেখ্— শিক্ষা আর রাজনীতি চলতে পারে না একসঙ্গে। আমার বিদ্যাপীঠ তো ভেঙে গেল সেইজন্যই।

১৮

উদয়নের পশ্চিমের বারান্দা— একটা প্রবল আকর্ষণের স্থান আমাদের। রোজ সন্ধেবেলা কিছু-না-কিছু একটা হত এই বারান্দায়। নাচ গান রিহার্সাল আবৃত্তি পাঠ পার্টি ভোজ সংবর্ধনা হয়েই চলত। আর যখন যা হত সবই যেন এই বারান্দায় মানিয়ে যেত। এ বারান্দার রূপই ছিল আলাদা। পশ্চিম দিগন্ত খোলা। আকাশ তারা ভূমি বৃক্ষ কিছুই আড়াল করে নি বারান্দাকে। সূর্যাস্তের আলোর ছটা, চাঁদের আলোর বন্যা সব এসে দাঁড়ায় গা ঘেঁষে। সুরেনদার নকশায় দেশী ধরনের মোটা-সোটা থাম ধরে আছে বারান্দার ছাদ। বাগানের দিকে বারান্দার ধার ধরে বসবার বাঁধানো 'সিট'— সেই 'সিটে'র উপরে বসে যখন মেয়েরা এপাশে ওপাশে দুটি-চারটি, রাতের আকাশের গায়ে সে যেন ছবি এক-একটি। পুব উত্তর দক্ষিণের দেয়ালে পাটি মোড়া। পুবের দিকে সামনের বসবার ঘর হতে বারান্দায় আসবার বড়ো দরজা। দরজার দু পাশে দেয়াল-লাগা কাঠের তৈরি লম্বা বসবার জায়গা। সবই যেন সুন্দর সুরুচিতে মাখা।

যখন কোনো পার্টি হয়— বিশেষভাবে ভোজের আয়োজন হয়— দেশবিদেশের মান্যগণ্যজন আসেন— এই বারান্দাতেই হয় সব-কিছুর আয়োজন। বোঠানের তত্ত্বাবধানে সাজানো হয় স্থান— আলপনা এঁকে দক্ষিণী দীপাধার মাঝখানে রেখে সাজানো হয় ফুলেমালায় সুশোভিত ক'রে।

কখনো মেঝেতে পড়ে কচি কলাপাতার পাত, কখনো নিচু আকারের টেবিলে রাখা হয় কালো-সাদা পাথরের থালা। ফুল, ফুলের মালা সুবাস ছড়ায় জায়গাটি ঘিরে। অতিথি যাঁরা আসেন— খানিক দাঁড়িয়ে দেখেন, পরে বসেন, আপন-আপন আসনে।

পুবদিকের দ্বারদেশে দুই দিকে দুই থামের মাঝখানে কাঠের ছোটো একটি ফরাশ পাতা— মোটা গদি তাকিয়া দেওয়া। তার সামনে একটি কৌচ— গুরুদেব বসেন এই কৌচে। গুরুদেবের পাশে আরো দুখানা কৌচে বসেন অতিথি অভ্যাগতজনেরা এলে।

আমরা দুমদাম এসে বসি লাল রঙের মেঝের উপরে, কোনো দড়ি-শতরঞ্চির অপেক্ষা না রেখে।

একবার এলেন উদয়শঙ্করের গুরু শঙ্করণ নাম্বুদ্রি। কথাকলি নাচ শিক্ষা করে-ছিলেন এঁর কাছে শঙ্কর। সন্ধেবেলা পশ্চিমের বারান্দায় জড়ো হলাম সবাই। গুরুদেব বসেছেন তাঁর কৌচে, আমরা বসেছি চার দিক ঘিরে, মাঝখানে লাল সিমেন্টের ফাঁকা জায়গা খানিকটা ছেড়ে। দক্ষিণদেশীয় গুরু এসে দাঁড়ালেন সেখানে। হৃষ্টপুষ্ট প্রৌঢ় ভদ্রলোক, শিথিল মাংসপেশী, স্ফীত-উদর, অনাবৃত অঙ্গ। পরিধানে একটি সাদা লুঙ্গি মাত্র, আর কোনো সাজ নেই। বাজনদার বোধ হয় কেউ-ই ছিলেন না সঙ্গে— ঠিক মনে করতে পারছি না। মনে আছে শুধু ঐ বয়সেরই একজন মাটিতে বসে ভুঁড়িতে মাটির হাঁড়ির মুখ চেপে ধরে তাতে তবলার মতো আঙুল ঠুকছিলেন।

আমরা একটু হতভম্বই। ভাবছি, এ কেমনতরো নাচ হবে ? সাজ নেই সজ্জা নেই। তা ছাড়া এইভাবে খালি গায়ে গুরুদেবের সামনে এসে দাঁড়াতে দেখি নি আগে কাউকে। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর বোধ হয়।

হাঁড়ির গায়ে তাল উঠল। গুরু নাম্বুদ্রি নাচ শুরু করলেন। কৈলাসে শিব-পার্বতী আছেন— তাঁদের ঘরকন্না দিয়ে শুরু করলেন। শিব তো কথায় কথায় ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকেন, সংসার সম্বন্ধে উদাসীন। যত দায় পার্বতীরই। এটা নেই ওটা নেই, এটা সামলান কি ওটা সামলান— পার্বতী ভাবিত ব্যতিব্যস্ত। কলসী ভরে জল আনতে যেতে হবে ঝরনার ধারে। কার্তিক গণেশ ছোটো— তাদের সামলায় কে ? তা ছাড়া শিবকেও তো বিশ্বাস নেই— চোখের আড়াল করতে ভয়। কী করেন পার্বতী ! কার্তিক-গণেশকে এনে শিবের দুদিকে বসিয়ে দিলেন, ধমকালেন। যেন এ জায়গা ছেড়ে উঠে না যায়। শিবকে শাসন করলেন— কার্তিক-গণেশকে দেখতে। পার্বতী চললেন কলসী কাঁখে নিয়ে জল আনতে।

দু'পা যান আর পার্বতী ফিরে ফিরে তাকান শিব কী করছেন। আর পার্বতী গেলেন তো শিব চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছেন— সে কতদূর গেল ?

এদিকে গণেশ-কার্তিক উধাও দুপাশ হতে। ছোটো ছেলে— তারা কি পারে বসে থাকতে? পার্বতীও গেলেন পর্বতের আড়ালে। এই ফাঁকে শিব জটার ভিতর থেকে গঙ্গাকে বের করে আনলেন। শিব গঙ্গা-প্রেমে মত্ত হয়ে উঠলেন।

পার্বতী জল নিয়ে এলেন। শিব দেখতে পেয়েই ত্বরিতে গঙ্গাকে জটার মধ্যে লুকিয়ে পদ্মাসনে দু চোখ বুজে ধ্যানী হয়ে রইলেন। কিন্তু সদাসতর্ক মন পার্বতীর— মাটির কলসীটা দুম্ করে নামিয়ে কোমরে দু হাত রেখে রুখে উঠলেন। সতীনকে সয় কি সতীন কোনোদিন? শেষে অনেক কষ্টে শিব সে যাত্রা রক্ষা পান— পার্বতীকে সামলান।

ঘটনাটা এই। একা গুরু নাম্বুদ্রি নেচে গেলেন সকলের হয়ে। শিব ধ্যানে বসেছেন— ধ্যান জমে উঠল, শিবকে বসিয়ে রেখে নাম্বুদ্রি পার্বতী হয়ে গেলেন। ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত পার্বতী, ঘড়াটায় আবার জল নেই— জল শেষ হয়ে গেছে— কত ঝঞ্ঝাট পার্বতীর। ওদিকে আবার কার্তিক-গণেশ মারামারি শুরু করেছে, গুরু নাম্বুদ্রি একাই কার্তিক-গণেশ হয়ে গেলেন। অত্যাশ্চর্য নাচ। পলকে পলকে বদলে যাচ্ছেন। ঐ বিপুল দেহ নিয়েই শিশু হয়ে গেলেন, শিশুর খেলা দেখিয়ে সবাইকে ভোলালেন। আবার কাঁখে কলসী নিয়ে ডান বাহুখানা দোলাতে দোলাতে কোমর বেঁকিয়ে মেয়েলি ঢঙে পা ফেলে ফেলে যখন চলতে লাগলেন কে না বলবে যে কমল-কোমল এক কামিনী চলেছে পাহাড়িয়া পথ ধরে। যতক্ষণ নাচ হল শ্বাস রুদ্ধ সবার। গঙ্গার সঙ্গে প্রণয়লীলা করছেন তখন শিব প্রেমিক শিব। পার্বতীর কাছে যখন ধরা পড়েছেন তখন শিব বেকুব অপরাধী। সমস্ত-কিছুর রূপ ফুটিয়ে-তুললেন সকলের চোখের সামনে একা গুরু। এরকমটি আর কখনো দেখি নি। গুরুদেবকে সত্যিই নাচ দেখালেন তিনি। আজও যেন দেখতে পাই সেদিনকার নাচের সকল মুদ্রা— সকল অঙ্গভঙ্গি।

রুক্মিণী দেবী ভরতনাট্যম্ পুনরুদ্ধার করলেন। এলেন গুরুদেবকে দেখাতে। তখন তিনি মিসেস এন্ডুওয়াল। শ্রীএন্ডুওয়ালও এলেন এইসঙ্গে। এই পশ্চিমের বারান্দায় নাচ দেখালেন রুক্মিণী দেবী সোনার রঙের শাড়ি পরা অল্পবয়সের রূপসী— রুক্মিণী একটা-একটা করে নাচের ভঙ্গি দেখালেন যেন ব্রোঞ্জে ঢালা মূর্তি এক-একটি।

প্রৌঢ় এন্ডুওয়াল সাহেব সারাদিন আশ্রম ঘুরে দেখেছেন— পুবের দেয়াল ঘেঁষা যে লম্বা কাঠের সিট উপরে গদি তাকিয়া দেওয়া— আরাম করে এলিয়ে বসবার

জন্য, সেখানে তিনি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। বললেন, বড়ো ক্লান্ত। আমি তাঁর কাছে বসে বসেই নাচ দেখলাম রুক্মিণী দেবীর, আর কথা শুনলাম এন্ড্রুজ সাহেবের। কোথায় কোথায় ঘুরে এলেন, কেন এত ক্লান্তি বোধ করছেন, এর পর আবার কোথায় কোথায় যাবেন— এই-সব কথা বলছেন আর মাঝে মাঝে মাথা তুলে স্ত্রীর নাচের দিকে তাকাচ্ছেন। স্নেহমমতায় ভরা সে দৃষ্টি। এ দেখেছি আমি। বড়ো ভালো লাগছিল তাঁর কাছে বসে থাকতে।

রাধাকৃষ্ণণ এলেন। এই বারান্দায় গুরুদেবের পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন। ঋজু দেহ, পরনে ধুতি, গায়ে আচকান, মাথায় পাগড়ি, সোজা দাঁড়িয়ে আছেন। সেই দাঁড়াবার ভঙ্গিই তাঁকে উন্নততর করে তুলেছে। বললেন যতক্ষণ এতটুকু নড়ল না তাঁর দেহ, নড়ল না তাঁর সাজ। স্ফটিকের মতো পরিষ্কার তাঁর উচ্চারণ— সে উচ্চারণ শুনতেই মনে মোহ জাগে। কোনো উত্তেজনা নেই বলার ভঙ্গিতে বা ভাবে। দু হাত তাঁর পিঠের দিকে মোড়া— হাতে হাত রাখা, সেই হাতের আঙুলগুলিতে চাপ পড়ছে বলার মাঝে মাঝে। সেই চাপটুকুতেই তাঁর তেজপূর্ণ কথার আলোড়ন উঠছে। আমি পিছন দিকে বসেছিলাম, তাই দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখছিলাম আর মুগ্ধ হচ্ছিলাম।

কত বলব। কত দেখেছি এই বারান্দাটিতেই। গুরুদেবকে ঘিরেই সব দেখেছি।

যখন যা দেখতাম— তাও গুরুদেবের মুখ দেখতে দেখতে দেখতাম। দেখতাম তাঁর মুখে কী ভাব ফুটল। খুশির ভাব দেখলে আমাদের খুশি যেন আরো বেড়ে যেত।

কত গুণীজ্ঞানী দেশ-বিদেশের এসেছেন এখানে। কত সান্ধ্য আসর বসেছে এই বারান্দায়। আজ সব স্বপ্ন মনে হয় পর্দায় ঢাকা আধো অন্ধকার বারান্দার দিকে তাকিয়ে। দিনেও এই বারান্দায় আমাদের আনাগোনার শেষ ছিল না। কিছু না থাকলেও থেকে থেকে এসে ঘুরঘুর করতাম, দেয়ালে টাঙানো গুরুদেবের আঁকা ছবি দেখতাম, বাগানে নামতাম, সিঁড়ি বেয়ে উদয়নের ছাদে উঠতাম। দূর কতদূর দেখা যায়, দূরের যেন আড়াল ছিল না কিছু।

দারুণ গ্রীষ্মে রথীদা একবার পশ্চিমের বারান্দা খসখসের ঝাঁপ দিয়ে ঘিরলেন, জলের একটু ছিটেও দেওয়ালেন। তপ্ত দ্বিপ্রহরে বারান্দা শীতল হল অনেকটা। বৌঠান রথীদা আমরা আরো অনেকে এখানে এসে দুপুরটা কাটাতাম। অভিজিৎ

তখন শিশু, তার বিছানা বালিশ নিয়ে এসে তাকে শুইয়ে রাখতাম। ঠাণ্ডা জায়গায় তার আরামের ঘুম দেখে সবাই হাসতেন।

এক-দুদিন গুরুদেবও এসে রইলেন দুপুরে। তখন অবশ্যি আমরা কেউ থাকতাম না সেখানে। গুরুদেবের ভালো লাগল না ঘেরাটোপ জায়গায় সময় কাটাতে। শ্যামলীতেই রইলেন। উত্তর মাঠের খোলা গনগনে হাওয়া— তাই তাঁকে তৃপ্তি দিত বেশি।

পশ্চিমের বারান্দায় বিবিদি আসতেন নিয়ম করে নিয়মিত দিনে, এক পাশে রাখা পিয়ানোটি বাজাতেন। এ পিয়ানো অনেকদিন পড়ে ছিল এমনিই। বিবিদি এসে নতুন করে তাতে সুর জাগালেন।

জীবনের শেষ দিকে 'বীরবল'কে নিয়ে বিবিদি শান্তিনিকেতনেই এসে রইলেন। কলকাতার বাস তুলে দিলেন। আগে মাঝে মাঝেই আসতেন, এবারে থাকতেই এলেন। বীরবলকে নিয়ে 'পুনশ্চ'তে সংসার পাতলেন। কোনার্ক পুনশ্চ— মাত্র হাত-কয়েকের ব্যবধান।

কোনার্ক থেকে সারাদিনই যেমন দেখতে পেতাম বিবিদিকে, তিনিও দেখতেন আমাদের। ঘড়ির কাঁটা ধরে চলতেন বিবিদি। শীতের দুপুরে তিনকোনা করে শালখানি পিঠের উপরে ফেলে যখন এসে দাঁড়াতেন সিঁড়ির কাছে— বুঝতাম এখন তিনটে বেজেছে। সিঁড়ির দু পাশে ছিল দুটি আকন্দ ফুলের গাছ— বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে তারা। বিবিদি একটি একটি করে তার পাকা পাতাগুলি তুলে আলগা করে মাটিতে ফেলে দিতেন। এটি তাঁর নিত্যকার নিয়ম-করা কাজের মধ্যে ছিল একটি। তিনটে বাজবার সময় হলেই জানতাম এখুনি বিবিদি এসে দাঁড়াবেন সিঁড়ির কাছে। এই সময়ে চুল থাকে খোলা— পিঠের উপর ছড়ানো। বিবিদির সামনের একগোছা সাদা চুল বাদে সব চুলই ছিল কালো কুচ্‌কুচে। জানি আকন্দ পাতা ছেঁড়া হয়ে গেলে বিবিদি এবারে চুল বাঁধবেন। এ-সব নিয়মের একটুও এদিক ওদিক হত না। পরিপাটি করে বিনুনি করে মাথা জুড়ে 'চালি' খোঁপা বাঁধতেন। কারো চুল বাঁধা হয় নি বিকেলবেলা— এ বিবিদি দেখতে ভালোবাসতেন না। আমি বেশির ভাগ দিনই, বেশির ভাগ কেন, ধরতে গেলে কোনো দিনই চুল বাঁধতাম না। কুঁড়েমি লাগত। হাতে জড়িয়ে খোঁপা করে রাখতাম। কয় দিন দেখে দেখে বিবিদি আর থাকতে পারেন নি— একদিন নিজের চুল বাঁধা হয়ে গেলে চিরুনি কাঁটা ফিতে সব হাতে নিয়ে এলেন কোনার্কে।

আমাকে বসিয়ে বিনুনি করে খোঁপা বেঁধে দিলেন। পর পর কয়দিনই এসে খোঁপা বেঁধে দিতে লাগলেন। ভাবলাম বিবিদিকে হয়তো কষ্টই দিচ্ছি। একদিন বিবিদি আসবার আগেই কোনোরকমে তিনগুছির একটা মোটা বিনুনি করে খোঁপা বেঁধে রাখলাম। 'পুনশ্চ'তে গিয়ে মাথা ঘুরিয়ে খোঁপা দেখিয়ে বললাম— আজ খোঁপা বেঁধে ফেলেছি বিবিদি। বিবিদি হাসলেন। হাসিটি ছিল অতি সুন্দর। বয়েস হয়েছে বিবিদির, বার্ধক্য এসেছে, কিন্তু হাসিটি ছিল সরল সুন্দর কিশোরীর হাসি। সহজ সরল বিশ্বাস ছিল তাঁর সবেতে।

আমার স্বামী নানা কথায় গল্পে তাঁকে কত উৎপাত করতেন, বিবিদি হাসতেন। আশ্রমে আমরা ঘরসংসারের কাজ সবই প্রায় নিজেরাই করি। বিবিদি একদিন দেখলেন— আমি ঘর মুছছি। ব্যাপারটা তাঁর প্রাণে বাজল। আমার স্বামী যাচ্ছিলেন পুনশ্চর পাশ দিয়ে, ডেকে বললেন, আচ্ছা অনিল, এ কী কথা। রানীকে দেখলাম ঘর মুছছে। একটা কাজের লোক কি রেখে দিতে পার না।

স্বামী বললেন, বিবিদি, সেই যে আমাদের শাস্ত্রে আছে 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে', ঘর মোছে বলেই তো তার নাম 'গৃহিণী' হয়েছে।

বিবিদি বললেন. তা নয় অনিল, এর মানে এ নয়, মানে হচ্ছে—। বিবিদি তাকিয়ে দেখেন আমার স্বামী তখন উধাও সে-স্থান হতে। এইবারে বিবিদি বুঝলেন— অনিল রসিকতা করেই বলেছে কথাটা। বিবিদি সেই মধুর হাসি হাসলেন আমার স্বামীর গমন-পথের দিকে তাকিয়ে।

বীরবলকে নিয়ে যখন এখানে থাকতে এলেন বিবিদি, বীরবল তখন বার্ধক্যে ভেঙে পড়েছেন। দেখতাম, বিবিদি কোথাও যেতেন না তাঁকে ছেড়ে। গভীর মমতা ঢেলে বীরবলকে জড়িয়ে রাখতেন। সারাদিন বীরবল বসে কাটান, একটু হাঁটলে ভালো তাঁর পক্ষে, বিবিদি একরকম জোর করেই বীরবলকে নিয়ে বিকেলবেলা উদয়নে যেতেন। একহাতে বীরবলকে ধরতেন, আর-হাতে থাকত একটি বাঁশের মোড়া। দু-পা চলেই মোড়া পেতে বীরবলকে বসিয়ে দিতেন। পুনশ্চ থেকে উদয়ন হাত-মাপা পথ— এইটুকু যেতেই তাঁদের অনেকক্ষণ লাগত। উদয়নে গিয়ে সামনের বারান্দায় বিবিদি বীরবলকে নিয়ে বসতেন, আবার ফিরে আসতেন। এটাও ছিল তাঁর ঘড়ি-ধরা কাজের মধ্যে।

দেখতাম, বিবিদিকে ছাড়া যেন এক মুহূর্তও চলত না বীরবলের। ঢাকা-বারান্দায় একটা কৌচে বসে থাকতেন তিনি, মুখে ডাক লেগে থাকত 'বিবি'

'বিবি'। পুনশ্চর সামনের পথ দিয়ে যেতে-আসতে শুনতে পেতাম 'বিবি বিবি'। আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন বিবিদি বারান্দায় একপাশে বসে, বীরবল ডেকে চলেছেন বিবি বিবি। এই ডাকার বিরাম ছিল না।

সে-বছর কলকাতায় গেলেন বিবিদি বীরবলকে নিয়ে। বীরবল অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একদিন খবরও পেলাম— সব শেষ।

পরে বুবুদির কাছে শুনেছি বৃত্তান্ত। তখন কলকাতায় 'ব্ল্যাক আউট।' সন্ধের পরে বাইরে বের হতে পারে না কেউ। পরদিন ভোর না হলে সৎকারের ব্যবস্থা করা যাবে না। রাত্রি গভীর হয়ে এল, বিবিদি বাড়ির লোকদের শুয়ে পড়তে বললেন। বুবুদিরা বিবিদিকে ন'মা বলতেন। বললেন, আমরা সবাই ন'মার ঘর হতে এক এক করে বেরিয়ে এলাম, যে যার শোবার ঘরে চলে গেলাম। বুবুদির স্বামী সুধীরবাবুর উল্লেখ করে বললেন উনি ঘরের বাইরে এসে ন'মার জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন। দেখলেন ন'মা চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, ধীরে ধীরে মশারির চার কোনা টানালেন— চার দিক পরিপাটি করে গুঁজে দিলেন। দিয়ে মশারির ভিতরে ঢুকে একহাতে বীরবলকে জড়িয়ে ধরে পাশে শুয়ে রইলেন।

কিছুদিন পর বিবিদি ফিরে এলেন আশ্রমে। পুনশ্চ থেকে গিয়েছিলেন তাঁরা দুজনে কলকাতায়— এখন একা এসে ঢুকবেন সে বাড়িতে— কত স্মৃতি জড়িয়ে ধরবে তাঁকে। কিছুদিনের জন্য উদীচীতে বিবিদির থাকবার ব্যবস্থা করা হল। বিবিদি এলেন। চুলগুলি কেটে ফেলেছেন। আর কোনোদিন 'চালি' খোঁপা বাঁধা হবে না সে চুলে।

বিবিদিকে নিয়ে আমরা উদীচীর নীচে এলাম। ঘরে ঢুকবার মুখে বারান্দায় চেয়ার ছিল একটা, বিবিদি চেয়ারে বসে ভাঁজ করা রুমাল দিয়ে দু চোখের জল চেপে ধরলেন।

এর পর থেকে বিবিদি একটানা আশ্রমেই থেকে গেলেন। বুবুদিরাও তখন এখানে, বুবুদির সংসারে বিবিদি মিশে রইলেন।

পুনশ্চতেই থাকতেন বিবিদি। উত্তর দিকের ঘরখানাতেই প্রায় সারাদিন কাটাতেন— একটার পর একটা গানের ক্লাস নিতেন। সংগীতভবনের সিনিয়ার ছাত্রদেরই শুধু গান শেখাতেন না, যে আসত গান শিখতে তাকেই গান শেখাতেন। গিন্নিরা আসতেন, শিক্ষকরা আসতেন— পুরানো দিনের গান শিখতে শৈলজাবাবু দিনের পর দিন এসে বসে বসে গান শিখতেন। গান শেখাতে বিবিদির আলস্য বা

অনুৎসাহ দেখি নি কখনো। গলা ছিল মাজা তারের মতো— কোনো মরচে পড়ে নি কোনোদিন।

ঘরের এক কোনায় একটা চেয়ারে বসতেন, কোলে থাকত একটা শৌখিন ঝুড়ি— সেলাইয়ের সরঞ্জাম— ছুঁচ সুতো ইত্যাদিতে ভরা। বিবিদি গান শেখাতে শেখাতে সর্বদা একটা-না-একটা কিছু রিফু করে চলতেন। শাড়ি মশারি বিছানার চাদর ওয়াড় জামা, কিছু-একটা থাকতই হাতের কাছে।

সময় ধরে গান শেখাতেন না বিবিদি। যতক্ষণ না গাইয়েদের গলায় সুরটি ঠিকমত উঠেছে ততক্ষণ অবধি সমানে গেয়ে যেতেন। খালি গলায়ই গাইতেন, কোনো বাজনা থাকত না ক্লাসে। সজাগ কান ছিল তাঁর— সুরের সূক্ষ্ম খাঁজ-খোঁজটুকুও এদিক ওদিক হতে পারত না। কোনো-কোনোদিন গান শেখাতে শেখাতে বেলা বেড়ে যেত, বলতেন, আমি স্নানটা সেরে আসি, তোমরা ততক্ষণ এই জায়গাটা গাইতে থাকো।

ছাত্ররা এ ঘরে গাইছে, বিবিদি স্নানের ঘরে স্নান করছেন— কান আছে এই দিকে। মগ-ভরা জল গায়ে ঢালতে ঢালতে বলে উঠছেন— উ-হুঁ— হল না— এইরকম হবে, বলে স্নানঘর থেকে সুর ধরে দিতেন। কতদিন আমরা এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মজা পেয়েছি।

বিবিদির তুলনা নেই। রাজেন্দ্রাণী ছিলেন বিবিদি সকল দিক দিয়ে, তবু অবস্থা যখন শেষের দিকে পড়ে এল— বিবিদি রোজ স্নানের পরে নিজের শাড়িখানা ধুয়ে জল নিংড়ে রেখে দিতেন। বলতেন, অভ্যেস থাকাটা ভালো। কোনোদিন এর ব্যতিক্রম হত না— তাঁর নিজের কাজ করবার একটি মেয়েলোক থাকা সত্ত্বেও।

উৎসাহ ছিল সমান সকল দিকে। 'কালমৃগয়া'র গান বিবিদিই এসে শেখালেন, ছোটোদের দিয়ে অভিনয়ও করালেন। পিয়ানো বাজিয়ে সমানে গান গেয়ে যেতেন— 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদু বায়'। কতকাল আগের নৃত্যনাট্য— আমরা এর আগে দেখিই নি কালমৃগয়া। বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে ফুলের বালা মালায় সেজে ছোটো ছোটো মেয়েদের সহজ খুশির নাচ— আমাদের মধ্যেও খুশি ছড়িয়ে পড়ত।

রথীদাকে বিবিদি আপন ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন— রথীদাও তাঁকে দিদির সম্মান দিতেন। বিবিদির স্নেহ যখন যেভাবে ব্যক্ত হত— রথীদা-বোঠানকে

তা সইতেও হত। হাসিমুখে সইতেন তাঁরা, এ দেখেছি। একবার বিবিদির মাথায় এল এই তো সামনেই রথীর বিয়ের দিন, তাঁদের বিবাহবার্ষিকীতে আনন্দ করতে হবে। আশ্রমে অনেক দিন আগে একটি মহিলা সমিতি ছিল। নাম ছিল 'আলাপিনী'। বিবিদি এসে এই আলাপিনীকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। বিবিদি ডাক দিলেন আলাপিনীকে— প্রস্তাব রাখলেন তাঁর। এখানে অনেক রকমেরই ঘরোয়া আয়োজন হয়েছে কিন্তু রথীদা-বোঠানের বিবাহবার্ষিকী তো কখনো হয়েছে দেখি নি। বিবিদির উৎসাহে ভাঁটা বলে কোনো কথা ছিল না। বিবিদি বললেন, এবারে ওদের পাশাপাশি বসিয়ে একটু আনন্দের ব্যবস্থা করতে হবে!

পাশাপাশি বসবেন রথীদা-বোঠান? দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু বিবিদির ইচ্ছের কাছে হার মানতে হল। রথীদা বললেন, চুপচাপ করেই হবে তো— শুধু আলাপিনীর কয়জনকে নিয়ে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—আর-কেউ জানবে না তো?

—না, না।

রথীদা-বোঠানকে রাজি করান বিবিদি। আলাপিনীকে বললেন, নতুন একটা কিছু করো। বিবিদিরই শখ। বললেন, আমেদাবাদে থাকতে সেই ছোটোবেলায় দেখেছি কয়েকটা রঙিন শাড়ি উপর থেকে ঝুলিয়ে মেয়েরা এক-একটা শাড়ি ধরে গোল হয়ে নাচত— নাচের কায়দায় উপর দিকে বিনুনির মতো বোনা হয়ে নীচে পর্যন্ত আসত। আবার উল্টো দিকে নাচের সময়ে বিনুনি খুলে যেতে থাকত। সেই নাচটা তোমরা কম বয়সের বউ-মেয়েরা করো।

সে নাচ তো এখানে কখনো দেখি নি— কি করে হবে?

বিবিদি রঙিন কাপড়ের টুকরো নিয়ে কয়দিন বসে বসে খুব নাড়াচাড়া করলেন। শেষে এক রকম করে বিনুনি-বোনার কায়দাটা এনে ফেললেন, কয়েকটি মেয়েকে দিয়ে নাচও তৈরি হল।

কোনার্কের সামনের লাল বারান্দায় দুটো ধাপ। উপরের ধাপে দুটি চেয়ারে রথীদা-বোঠানকে পাশাপাশি বসানো হল— মালা-চন্দন পরানো হল। অপ্রতিভ লজ্জিত রথীদাকে বসে থাকতেই হল— দেখে আমাদের খুব মজাই লাগল।

নীচের বারান্দায় ছাদের আংটা থেকে ঝোলানো ছয়টা ছয় রঙের শাড়ি ধরে ছয়জন মেয়ে নাচল, বিনুনি হল, বিনুনি খুলল। গান হল— নোনতা মিষ্টি নানা

রকমের খাবার খাওয়া হল। আনন্দই পেলাম আমরা। রথীদা উঠে বাঁচলেন। বোঠানের তখনো লজ্জারক্ত মুখ— ফিসফিসিয়ে বললেন, বিবিদির যত কাণ্ড।

একবার এক ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন বিবিদির ইচ্ছা হল রথীকে ভাইফোঁটা দেবেন। এ পাড়ায় আমরা যারা ভগ্নী-স্থানীয়া ছিলাম তাদের জড়ো করলেন। প্রতিদিন সন্ধেবেলা উদয়নের বসবার ঘরে রথীদারা মিলে তাস খেলেন। এখানে সবাই আমাদের দাদা, সবাই বিবিদির ভাই। বিবিদি চললেন, সঙ্গে আমরা। হাতে মিষ্টির থালা, চন্দনের রেকাবি।

খবর আগেই পেয়েছিলেন রথীদারা— সারি বেঁধে বসে আছেন দাদা-ভাইরা ; সুবোধ বালকের মতো। পুরোভাগে রথীদা, বিবিদি রথীদাকে ফোঁটা দিলেন, সব ভাইরাও বিবিদির হাতে ফোঁটা নিলেন। অন্যরা এক-এক করে ফোঁটা দিলেন। আমার পালা। আমার স্বামীও বসে আছেন সারিতে— তিনি উঠে যাবার জন্য যত চেষ্টা করছেন, এক দিকে সুধাকান্তদা এক দিকে সুরেনদা তাঁকে চেপে ধরে বসিয়ে রাখছেন। সবাই হাসছেন। রানী সবাইকে ফোঁটা দিতে দিতে মাঝখানে একজনকে বাদ দেয় কেমন করে দেখবেন। কৌতুকে কৌতূহলী দাদারা।

রথীদাকে ফোঁটা দিয়ে প্রণাম করলাম। পর পর ফোঁটা দিয়ে চললাম, প্রণাম করলাম। আমার স্বামীর কাছে যখন এসেছি, হাসাহাসির একটা ধুম পড়ে গেল। ফোঁটা দিতেই হবে। সবার জুলুম।

ভাইফোঁটা দিতে কড়ে আঙুলে চন্দন তুলে নিতে হয়— নিয়ম। আমি মধ্যম আঙুলে চন্দন তুলে নিলাম, স্বামীর কপালে ফোঁটা দিলাম— বললাম, তোমাকে সাজালাম।

শেষ দিনটিতে যখন নিজের হাতে স্বামীকে সাজিয়ে কপালে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা এঁকে দিলাম— এই দিনটির কথা মনে পড়ছিল, সেদিন মনে মনে বললাম, তোমাকে সাজালাম।

বিবিদির হাসিটি ছিল বড়ো মধুর— বলেছি আগে। কিশোরীর মুখের হাসি, সারল্যে ভরা! রাগতে দেখি নি কখনো, বা কারো উপরে অভিমান করতে দেখি নি। পরবর্তী যুগে নানা ভাবমিশ্রণ দিনে কারো কোনো ব্যবহারে যদি কোনো অসৌজন্য প্রকাশ পেয়েছে, আমরা দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছি। বিবিদি বলতেন, না, না, তার কোনো দোষ নেই, আমিই বোধ হয় তাকে বুঝতে ভুল করেছি।

বিবিদির সঙ্গে গল্প করা ছিল বড়ো আমোদের ব্যাপার। বিবিদি যেন চলন্ত

ছবির মতো প্রসঙ্গ পাল্টে পাল্টে গল্প বলে যেতেন। কারো বিয়ের গল্প বলছেন, বলতে বলতে কে কোন্ শাড়ি পরে এসেছিল ; কোথায় যেন এই রকম নক্‌শা দেখেছিলেন, তখন সে দেশের আবহাওয়া ছিল রুক্ষ— তরকারি মিলতই না, তরকারির কথায় চলে আসতেন কলকাতার বাজারে। বাজার থেকে বাজারের দর, দেশ-বিদেশের রান্নার তালিকা— পাহাড় ভ্রমণ, গোলাপবাগান, কমলা লেবুর মধু কিছুই বাদ পড়ত না। গল্পের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যেন চলতে থাকতাম, দেখতে থাকতাম। জানতামও কত।

সরোজিনী নাইডু— বহুকালের বন্ধু বিবিদির। যখনই আসতেন বিবিদির সঙ্গে বসে গল্প করতেন। বিবিদিই বলতেন— তিনি শুনতেন। অনেকক্ষণ পর যখন উঠতেন, গা মোড়ামুড়ি দিতে দিতে বলতেন আমাদের, 'ও ডিয়ার ডিয়ার, বিবি গোজ টু ক্যালকাটা তায়া বোম্বে।'

বিবিদির মুখে সেই কুমারী কিশোরীর মধুর হাসিটি ফুটে উঠত।

১৯

রথীদা বোঠান— এঁদের নিবিড় স্নেহচ্ছায়া আমাদের ঢেকে রেখেছে, কোনো তাপ লাগতে দেয় নি কখনো। ছোটো ভাইয়ের মতো দেখতেন রথীদা আমার স্বামীকে, তাঁর দৌরাত্ম্য সহ্য করতেন হাসিমুখে। আবদারগুলি মেনে নিতেন অম্লানবদনে।

রথীদা-বোঠানের নিজের বলে ছিল না কিছু। বাবামশায়কে কেন্দ্র করেই ছিল তাঁদের জীবন। তাঁদের কর্মক্ষেত্র ছিল শান্তিনিকেতন। আমাদের সবাইকে নিয়ে ছিল তাঁদের সংসার।

বোঠান-রথীদাকে মনে পড়লেই একটা সুন্দর দৃশ্য চোখে ভাসে আমার। উদয়নে তাঁদের শোবার ঘরে মস্ত একটা নিচু খাট— খাট জুড়ে টানটান বিছানা— বিছানায় ছোটো-বড়ো তাকিয়া কয়েকটা, মাথার কাছে বালিশ কতকগুলি উঁচু-করা। রথীদার অভ্যেস ছিল, বিছানায় আধশোয়া হয়ে লিখতেন— হাঁটুর উপরে থাকত বোর্ড কাগজ। যত প্রয়োজনীয় লেখা, যত চিঠিপত্র লেখা— বিছানায় শুয়ে করতেন। বেশির ভাগ সময়ে রাত্রিবেলাতেই করতেন। আমরাও অনেক সময়ে আসতাম, রথীদা বোঠান দুজনকেই পাওয়া যায় একসঙ্গে এই সময়ে। খানিক গল্প করে আড্ডা দিয়ে যেতাম।

আমার স্বামী যখন কর্ম উপলক্ষে বাইরে কোথাও যেতেন, গুরুদেবের ব্যবস্থায় আমি উদয়নে গিয়ে ঘুমোতাম, অভিজিৎ হবার পরও। খালি বাড়িতে একা থাকব রাত্রে— যদি ভয় পাই, গুরুদেবের এ ছিল ভাবনা। কখনো পুবের পাশের ঘরে আমাদের শোবার ব্যবস্থা হত, কখনো-বা তেতলার ঘরে। সে সময়ে দেখেছি বোঠান-রথীদার শোবার ঘরের পাশ দিয়েই যেতে হত আমাকে, তাঁদের ঘরের বড়ো বড়ো দরজা-জানালা থাকত খোলা— দেখতাম রথীদা বিছানায় শুয়ে শুয়ে লিখছেন, আর বোঠান পাশে বসে, একটা তাকিয়া কোলে নিয়ে কথা বলছেন— বলেই চলেছেন। কী যে এত বলতেন বোঠান— রথীদা লিখতে লিখতে কতটুকু শুনতেন তার কি জানি। মাঝে মাঝে একটু হুঁ হাঁ করতেন কি করতেন না, এর বেশি নয়। তাতে বোঠানের বলা থেমে থাকত না। এ দৃশ্য দেখতে দেখতে যেতাম শুতে, আবার খুব ভোরে যখন নেমে আসতাম দেখতাম বোঠান সেইভাবেই বসে বসে কথা বলে চলেছেন, আর রথীদা শিয়রের কাছে বাতি জেলে সেই রকম শোওয়া অবস্থায়ই বই পড়ছেন। খুব ভোরেই জাগতেন তাঁরা— হয়তো অন্ধকার থাকতেই। বিছানা ছাড়তে এইটুকু বিলম্ব করতেন। রথীদা-বোঠানের শয্যার এই দৃশ্যটি আমার বড়ো মধুর লাগত, এখনো লাগে যখন ভাবি তাঁদের কথা।

বোঠান-রথীদাকে আলাদা করে ভাবতে পারি না। দুজনেই যেন এক। তাঁদের কাজ পৃথক আকারের হলেও সুর ছিল এক তারে বাঁধা।

আশ্রমে এখন আর জলের সমস্যা নেই। বোঠান বাগান করতে শুরু করলেন। উদয়নের জাপানি ঘরের সামনে দক্ষিণ দিকে বোঠানের বাগান ধীরে ধীরে রূপ নিতে লাগল। বাগানের চার দিকে লাগালেন জুঁই বেলি দোলনচাঁপার সারি। রথীদার কারখানা ঘর ঢেকে দিলেন বসন্তমালতী ঝুমকোলতায়। উড়িষ্যার একটা মূর্তি ছিল— অর্ডার দিয়ে করিয়েছিলেন, বেশ বড়ো একটি নারীমূর্তি। সাদা পাথরে খোদাই-করা। প্রোপোরশনটায় খুঁত ছিল— কোমরের দিকটা বেঁটে হয়ে গিয়েছিল। সেই মূর্তিটি বসিয়ে দিলেন ক্রিসমাস ট্রির আড়ালে। সেখানে দাঁড়িয়ে তার অঙ্গের খুঁত গেল ঢেকে, মাথাভরা খোঁপা নিয়ে তরুণী গ্রীবাভঙ্গি করে রইল হাসি-হাসি মুখে।

গুরুদেব পারস্যে গিয়েছিলেন যেবার, বোঠানও গিয়েছিলেন সঙ্গে। সেখানকার প্রসিদ্ধ ব্লু-পটারি এনেছিলেন অনেক। এখানে এসে প্যাকিং বাক্স খুলে দেখা গেল বেশির ভাগ পটারিই ভেঙেচুরে একাকার। তখনকার দিনে এতখানি

পথ আসা— কত ধাক্কা খেয়েছে বাক্সগুলি। বোঠান সিমেন্টের বড়ো বড়ো টব, জালা তৈরি করিয়ে তার গায়ে ব্লু-পটারির টুকরোগুলি বসিয়ে দেওয়ালেন। নরম সিমেন্টের উপর সেগুলি গেঁথে গেল। পারস্যদেশের নীল রঙ অম্লান হয়ে রইল। সেই টব সেই জালাগুলি বাগানের এখানে ওখানে বসিয়ে দিলেন বোঠান। তাতে ফুলগাছ লাগালেন। বাগানের ঠিক মধ্যিখানে জাপানি বাগানের নক্শায় একটা আর্কিটেকচার তুললেন। তার সামনে সিমেন্টের বাঁধানো মিনিয়েচার সরোবর, জলে ছাড়লেন কুমুদ কমল। সরোবরের ঘাটে ছোটো দুটি শ্বেত পাথরের সিঁড়ি। যেন বহুদূর থেকে আর্কিটেকচারের আর্চের ভিতর দিয়ে কোনো রূপসী এসে জলে পা ডুবিয়ে এই বসবে বুঝি-বা। বোঠান বললেন, তোমরাই বা কম কি? এবারে তোমরা জলের ধারে বসে সিঁড়িতে পা রেখে আলতা পরো— তবে তো? বলি, ও বাবাঃ, এখানে বসে আলতা পরবার মতো এমন চরণপদ্ম কার এখানে?

বাগানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কয়েকটা থামের উপরে ঘর তুললেন বোঠান। সবটাই প্রায় কাঁচে ঘেরা, সুস্পষ্ট দেখা যায় চারি দিক। চন্দ্র-সূর্য— উদয়-অস্ত— কোনোটা দেখতে পথ আটকায় না। গুরুদেব এর নাম দিলেন 'চন্দ্রভানু'। বোঠানের স্টুডিয়ো হবে এইজন্যই বানিয়েছিলেন এটি, কিন্তু তা হয় নি। বোঠান এসে থাকেন নি চন্দ্রভানুতে। গুরুদেব এসে থেকেছিলেন এখানে। খুব খুশি মনে ছিলেন কিছুদিন চারি দিক দেখতে পাচ্ছেন বলে। এখানে থাকবার কালেই গল্পের পর গল্পের শুরু হয়। একদিন ডেকে পাঠালেন আমাকে, এলাম। বললেন, কলমটা পাওয়া যাচ্ছে না।

সেকি কথা? ঘাবড়ে গেলাম।

বললেন, খোঁজ পড়ে গেল মশারির চাল পর্যন্ত।

ভয়ে ভাবনায় আমি তখন নিথর।

বললেন, আচ্ছা, আমার কলমটাই নাও। নিলাম।

গুরুদেব বললেন, দেখছ কি? লিখে ফেলো, নীলুবাবুর কলমটা পাওয়া যাচ্ছে না, খোঁজ পড়ে গেল মশারির চাল পর্যন্ত।

রথীদাও বাগান শুরু করে দিলেন পশ্চিম-বারান্দার পশ্চিম দিকে। আমরা ছুটোছুটি করি, কার বাগান বেশি সুন্দর। রথীদা মিটিমিটি হাসেন, বোঠান হাসেন খুকখুক করে।

রথীদার বাগান হল জিওমেট্রিক ধরনের, নানা আকারে নিখুঁত মাপের কেয়ারি। কোনোটা ছোটো কোনোটা লম্বা, কোনোটা বড়ো কোনোটা চওড়া। খাঁজকাটা টালি ইটের গাঁথনি দিয়ে কেয়ারি-ঘেরা। বাগানের মাঝখানে 'ভোয়াফ' জারুল, ছোটো গাছটিতে বেগুনি রঙের ফুল ভরে উঠল সে বছর। বাগানে ঢুকবার ছোটো গেটটির মাথায় আঙুরলতা ছাপিয়ে উঠল, আঙুরও ফলল। কী টক! তবু তো আঙুর হল। কে জানত এই মাটিতে আঙুর হতে পারে। কেয়ারিগুলি নানা রঙের ফুলে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চন্দ্রভানুর নীচে থামগুলির ফাঁকে ফাঁকে ফাঁকা জায়গাটা পড়েছিল এমনিই, রথীদা থাম-ক'টা ঘিরে গাঁথনি তুলে ঘর বানিয়ে ফেললেন। সেই ঘরের একধারে তিনকোনা ছয়কোনা দেয়ালের সঙ্গে ফিট করে মাচার মতো কাঠের তক্তার ফরাশ করলেন। এইটুকু ঘরের এখানে ওখানে দেরাজ গা-আলমারি বসিয়ে তাঁর নিজের থাকার মতো প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র এনে এমন করে গোছালেন, যে, দেখে মনেই হয় না ঘরে এত কিছু আছে, আর কোথায় কী আছে। এই ঘরে প্রায়ই রথীদা সারাদিন কাটাতেন। এই ঘরে বসেই বিশ্বভারতীর যাবতীয় লেখালেখির কাজ করতেন, ছোটোখাটো আলাপ-আলোচনাও এই ঘরে বসেই হত। এই ঘরের নাম, মুখে মুখে চলতি নাম, আমরা বলতাম 'গুহাঘর', সেই গুহাঘরই নাম হয়ে রইল। গুহাঘরের বাইরেটা সিমেণ্ট এব্ড়ো থেব্ড়ো করে এমনভাবে তৈরি হল— দেখে মনে হল পাথরের তৈরি ঘর। বাইরের দেয়ালে হাতিশুঁড় লতা ঢাল ঢাল পাতা নিয়ে বেয়ে উঠল।

গুহাঘরের পশ্চিম দিকে বাগানে সিমেণ্টের বেশ বড়ো একটা হ্রদ বানিয়ে তাতে জল ভরে দিলেন রথীদা, নাম দিলেন পম্পা সরোবর। পম্পা সরোবরের মাঝখানে ছোটো একটি দ্বীপ, দ্বীপের ধারে ধারে উইপিং-উইলো, বট্‌ল্ ব্রাশ গাছ। দিনে দিনে তারা বড়ো হয়ে উঠেছে। এতদিনের সেই উইপিং-উইলো এখন নুয়ে পড়েছে জলে, ঝরে পড়া পাতাগুলি ভাসে পম্পা সরোবরে।

রথীদার বাগানের নেশা বাড়তে বাড়তে চলল। পশ্চিম দিকের ফুল বাগানের পরে আরো খানিকটা জায়গাজমি নিয়ে আরো খানিকটা উঁচু করে টেরাস গার্ডেন বানালেন। এর ওধারেও কত জমি। রথীদার বাগানের শখ বরাবরের, আশ্রমে ঘুরে ঘুরে জায়গা বেছে কত গাছ লাগাতেন রথীদা। উত্তরায়ণ ঘিরেও কত ফল-ফুল গাছ এনে বসালেন। তখন এর অনেক ফুলগাছই আমাদের কাছে অপরিচিত ছিল, এখন তারা বাড়িতে বাড়িতে ঘরোয়া রূপ নিয়ে ঘরের আঙিনায় ফুটে থাকছে।

কেউ যত্ন করুক চাই না-করুক, ফুল তারা ফুটিয়েই চলেছে। বেগুনি রঙের এক রকম গাছ এনে লাগালেন রথীদা, হলুদ ফুল ফোটে। আর-একরকম গাছ লাগালেন, ঝোপের মতো ডালপাতা মেলে থোকা-থোকা সাদা ফুল ডাল-ভরে ফুটে থাকে ফোয়ারার মতো, সুরভিতে ভরপুর— আমরা তখন জানতাম এই ফুলের নাম 'পার্শিয়ান জুঁই।' এখন শুনি নাম হ্যামিলটনিয়া। কত যে এই ফুলগাছ এখন আশ্রমে, ডাল কেটে কলম করে নিলেই হয়। শীতের শেষ হতে সন্ধ্যায় হাওয়া ভারী করে তোলে এই সৌরভ। কাঞ্চন ফুলের গাছই কত রকমের রথীদার বাগানে। ইট-লাল টুকটুকে কাঞ্চন ফুটে থাকত ঝোপের মাথার উপরে। ঝোপ আকারেই হয় এই গাছ।

এ ছাড়াও কত জায়গা হতে কত জাতের গাছের চারা এনে লাগালেন রথীদা। এক-একবার করে কয়েকটা গাছ আসে, আর আমরা তাদের সঙ্গে পরিচয় করতে ছুটি। ধীরে ধীরে গাছগুলি বেড়ে ওঠে। ফুলে-ফলে রঙে-বাহারে ভরে ওঠে। তেজপাতা দারুচিনি হিং— কিছুই প্রায় বাদ ছিল না। হিং গাছটি ছিল দেখতে ঠিক গন্ধরাজ ফুলগাছের মতো। তেমনিই গাছের আকার। ফুলের গড়ন সুগন্ধও তেমনিই। শুধু গন্ধরাজের মতো ভারী পাপড়ির ফুল নয়, হালকা একসারি শুভ্র পাপড়ি ঘেরা ফুল। গাছের কষে হিং বের হয়। আমরা ফুলও তুলতাম পাতাও ছিঁড়তাম কয়েকটা। পরদিন গিয়ে দেখতাম সেই-সব ক্ষতস্থানে দুধের রঙে বিন্দু বিন্দু ফোঁটা জমে আছে। খুঁটে খুঁটে সংগ্রহ করে আনতাম, লুকিয়েই করতাম এই কাজটা।

বাগানে বড়ো বড়ো গাছেও ফুল ধরল কত। একটা গাছ ছিল, বুনো, ছোটো ছোটো তার ফুল। ফুলের সৌষ্ঠব নেই কিছু কিন্তু ফুলগুলি যখন শুকিয়ে যেত— তখন থেকেই গাছে শব্দ জাগত— পুট্‌পুট্‌। বীজগুলি ফেটে ছড়িয়ে পড়ত। বনের রীতি। ছিটকে ছড়িয়ে বীজ ছড়ায় গাছ। এই বীজ ফাটার শব্দটুকু শুনবার জন্য কত সময়ে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। ঝিরঝিরে পাতায় ভরা গাছ— ছোটো ছোটো চ্যাপটা শুকনো ফলগুলি— রোদ উঠলে ফাটতে শুরু করত— যেন দরজায় টোকা মারত। আর কাঞ্চন ফুলের বীজভরা ফলগুলি যখন ফাটে— যেন পটকা ফোটায়।

'আমাদের শান্তিনিকেতন' কথাটা আমাদের রক্তে এমনভাবে মিশে আছে আশ্রমে যা-কিছু সবই দেখি আমাদের বলে। পথের ধারের একটা গাছকেও বলি,

আহা, আমাদের মোড়ের মাথার জামগাছটার ডাল কেটে ফেলল ইলেক্ট্রিকের লোকেরা ?

এমনিতরো একদিন কথা বলতে বলতে বলছিলাম এক অধ্যাপককে যে, আমাদের একটা ভূর্জপত্রের গাছ ছিল। শুনে তিনি আমাদের বাড়ির চার দিকে তাকাতে লাগলেন। খেয়াল হল, বললাম, এখানে নয়— ছিল রথীদার বাগানে।

পাহাড়ী গাছ তাও এনে লাগিয়েছিলেন। এই মাটিতে বাড়ে না সহজে। টিনটিনে গাছ আর মোটা হতে পারে না আমাদের জ্বালায়। সবাই গিয়ে দেখি আর গা হতে বাকল টেনে ছিঁড়ি— সুতোর নালের মতো বাকল ছিঁড়ে আসে হাতে। ভাবি পুরাকালে এই বাকলেই পুঁথিপত্র লেখা হত— তা হত কেমন করে ? এমন সরু সরু চিলতে বাকলে ? পরে দেখেছি কেদারবদরী যেতে ভূর্জপত্রের গাছ। তখনকার দিনে পায়ে হেঁটে চলেছি, যেতে যেতে দেখেছি পথে কত ভূর্জপত্রের গাছ, কত মোটা, আর কত পুরু তার বাকল— পরতে পরতে তা হতে কাগজের মতো পাতলা বাকল বের করে নেওয়া যায়। পাহাড়ীরা গাছের গা কেটে কেটে মোটা মোটা বাকল নিয়ে যায়, খণ্ড খণ্ড করে টালির মতো তা দিয়ে ঘরের চাল ছায়। অবশ্য কয়েক বছর বাদে বাদেই এগুলি তাদের বদল করতে হয়। যারা পাথরের স্লেট দিয়ে না-ছাইতে পারে চাল— তারা এই দিয়েই কাজ চালায়।

লতা-গাছের খুবই শখ ছিল রথীদার। আম জাম জামরুল পেয়ারার লতা তুলে দিলেন নানান কায়দায় তারের জালির উপরে। বোঠানের বাগানের পিছন দিক দিয়ে নানা গাছের লতাচ্ছন্ন ছায়া-সুশীতল পথ বানালেন একটা লম্বা লম্বা লোহার খুঁটি ঘিরে। একে তো গাছ লতার আকার নিল, মহাবিস্ময় আমাদের, তার পরে যখন ফল ধরল তাতে অতিথি যাঁরা আসতেন তাঁরাও বিস্ময়াভিভূত হতেন।

রথীদা-বোঠানের বাগানে উত্তরায়ণ আলোকিত হয়ে উঠল। আশ্রমের বাগানও কত বেড়ে উঠল— কত ঘন ছায়া ফেলল। শ্যামলে শ্যামলে আমাদের চোখ জুড়োল, আশ্রমের রাঙামাটি দিকে দিকে ঢাকা পড়ল।

বোঠান ছিলেন শিল্পী, জন্মগত এই সম্পদ ছিল তাঁর। অবনীন্দ্রনাথের আদরের ভাগ্নী তিনি। জোড়াসাঁকোয় 'বিচিত্রা' যখন শুরু হয়, বোঠানও ছবি আঁকতেন সেই শিল্পীদলে। তখনকার দিনের একটি প্রকাণ্ড ছবি ছিল অর্ধসমাপ্ত, একদিন দেখি বোঠান উত্তরায়ণের একটা কোণের ঘরে সেই ছবি বের করে বড়ো বড়ো তুলি দিয়ে রঙ বোলাচ্ছেন আপন মনে। ওয়াশের ছবি— সাবজেক্ট 'দুর্যোধন'। মনে

পড়ে যমের মতো রঙ ছিল সেই দুর্যোধনের। উত্তরায়ণে কোথাও আছে হয়তো ছবিখানা এখনো। সে ছবি কিন্তু সেবারেও হল না শেষ। বোঠানের নিজের বলে কোনো সময় ছিল না সারা দিনমানে। গুরুদেব আছেন, সংসার আছে, আছে আশ্রম। কত ছিল তাঁর সে-সবের দায়িত্ব। হাসিমুখে বোঠান সকল দিক সামলে চলতেন।

বোঠানকে না হলে গুরুদেবের যে চলত না। গান তৈরি করে দিলেন, সেই গানের সঙ্গে নাচ হবে। বোঠান তার কাঠামোটা তৈরি করে দেন। নৃত্য, নৃত্য-নাট্য— সব বোঠানের হাতে তৈরি, এমন-কি অভিনয় পর্যন্ত। খানিকটা গড়ে উঠবার পর গুরুদেবকে দেখানো হত, তার পর চলত তার রিহার্সাল দিনের পর দিন। বোঠানের কথা ভাবতে গেলেই যেন মনে হয় আশ্রমের কেন্দ্রস্থলে এক অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এমনই শুচিশুভ্রতা ছিল তাঁকে ঘিরে।

গুরুদেবের কাছে, আশেপাশে বোঠানকেই দেখতাম আমরা, রথীদা থাকতেন আড়ালে। আশ্রমের কাজে প্রয়োজনে যদি কখনো গুরুদেব রথীদা ও অন্যদের ডেকে পাঠাতেন, রথীদা আগে অন্যদের এগিয়ে দিতেন গুরুদেবের কাছে, নিজে আসতেন পিছনে। পিছনে আসতেন, পিছনেই বসতেন, কি দাঁড়িয়ে থাকতেন। কখনো দেখি নি রথীদা গুরুদেবের সামনাসামনি হয়ে কথা বলছেন। স্বভাবেও ছিলেন তিনি লাজুক প্রকৃতির। কত যে গুণ ছিল তাঁর, শিল্পপ্রতিভাই ছিল কত। গুরুদেবের আঁকা ছবি নানা রঙের কাঠ দিয়ে এমন 'ইনলেড ওয়ার্ক' করতেন যে, ওরিজিনালের কাছাকাছি যেত। কারুকার্যেও ছিলেন দক্ষ রথীদা। নানা রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে নতুন কিছু বের করাতে ছিল তাঁর নেশা। গুরুদেব একবার দুঃখ করে বললেন রথীর দুর্ভাগ্য, সে আমার পুত্র। তাই রথীর গুণগুলি ধরা পড়ল না কারো চোখে, আমার আড়ালেই সব চাপা পড়ে রইল।

সেবার রথীদার পঞ্চাশ বছরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমার স্বামী, সুরেনদা ওঁরা ঠিক করলেন রথীদার এবারের জন্মোৎসবটি বিশেষভাবে পালন করা হবে। বন্ধু ও স্নেহাস্পদদের উৎসাহ থামাতে পারেন না রথীদা। কাতর হয়ে বললেন, তবে আশ্রমে কিছু কোরো না, বাবামশায় আছেন, তাঁর সামনে আমাকে লজ্জা দিয়ো না।

ঠিক হল আশ্রমের বাইরে কোপাই নদীর ধারে সবাই মিলে ঐদিন একটু হৈ-চৈ করবেন।

আমি আছি কাছাকাছি, সব খবরই শুনছি— দেখছি। অভ্যেস ছিল সু-খবর কিছু থাকলেই দৌড়ে গিয়ে গুরুদেবকে বলা। তাঁকে না-বলা থাকতে পারত না এ-সব কথা। যথারীতি গিয়ে বললাম সংবাদ গুরুদেবকে। গুরুদেব শুনলেন। স্বামীকে সুরেনদাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, তোরা ভালো করে আয়োজন কর, আমিও যোগ দেব রথীর জন্মোৎসবে।

খবরটা পেয়ে রথীদার সে এক মর্মান্তিক অবস্থা। বললেন, এখানে কত জ্ঞানী-গুণীজনের সংবর্ধনা হয়— কত অনুষ্ঠান-আয়োজন হয়, না, না, আশ্রমে তো সম্ভবই নয়। রথীদা বেঁকে বসলেন। শেষে ঠিক হল শ্রীনিকেতন তুলনামূলকভাবে অনেক নিরিবিলি স্থান— সেখানে অনুষ্ঠানটি হবে।

এখনো স্পষ্ট মনে আছে— চোখের সামনে ছবি হয়ে আছে, শ্রীনিকেতনের উৎসব-চাতালের নীচেই আমগাছের ছায়ায় বেদীতে বসেছেন গুরুদেব, পাশে রথীদা, উৎসব-রঙের হলুদ চাদর গায়ে। ক্ষিতিমোহন সেন মশায়, হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীজী মন্ত্র পড়লেন এক ধারে বসে। গুরুদেব আশীর্বাদী কবিতা লিখে এনেছেন এই উপলক্ষে, পড়লেন, বড়ো মর্মস্পর্শী কবিতা— চোখে জল এসে গিয়েছিল। হয়তো রথীদারও।

গুরুদেব পড়ছিলেন—

মধ্যপথে জীবনের মধ্যদিনে
উত্তরিলে আজি, এই পথ নিয়েছিলে চিনে,
সাড়া পেয়েছিলে তব প্রাণে
দূরগামী দুর্গমের স্পর্ধিত আহ্বানে,
ছিল যবে প্রথম যৌবন।
সেদিন ভোজের পাত্রে রাখ নি ভোগের আয়োজন।
ধনের প্রশ্রয় হতে আপনারে করেছ বঞ্চিত।
অন্তরেতে দিনে দিনে হয়েছে সঞ্চিত
পূজার নৈবেদ্য অবশেষ,
যে পূজায় তব দেশ
তোমারে দিয়েছে দেখা দরিদ্রদেবতারূপে
আসীন ধূলির স্তূপে
অসম্মানে অবজ্ঞায়।

সঁপেছ জীবন তব অর্ঘ্য তাঁর পায়ের তলায়।
তপস্যার ফল তব প্রতিদিন ছিলে সমর্পিতে
আমারি খ্যাতিতে।...

শেষ ক' লাইন—

অন্তর আকাশ তব ভরুক আপনি
ঊর্ধ্ব হতে
আনন্দের স্রোতে।
সম্পূর্ণ করিবে তারে বন্ধুদের বাহিরের দান
স্নেহের সম্মান।
বিদায়প্রহরে রবি দিনান্তের অস্তনত করে
রেখে যাবে আশীর্বাদ তোমার ত্যাগের ক্ষেত্র-'পরে॥

গান হল। রথীদা নতমস্তকে বসে রইলেন। পিতাপুত্র বসে আছেন পাশাপাশি—অপূর্ব এক দৃশ্য। শুধু একবারই আমরা দেখেছি এ ছবি।

রথীদা ছিলেন গুরুদেবের ডান হাত। গুরুদেবের মুখেই শুনেছি— বলতেন, দেখ, আমি রথীর উপরে জোর করি নি। রথী আমেরিকা থেকে ফিরে এল, নিজেই একদিন আমার কাজে সে নিজেকে উৎসর্গ করল।

বোঠান-রথীদা যে আশ্রমের কাজে নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের দেখে ছেলেমানুষ আমাদেরও তা মনে হত। এতে ভুল ছিল না কিছু।

এই রথীদার বড়ো এক করুণ মুখের ভাব দেখতাম দিনের পর দিন, গুরুদেব যখন রোগশয্যায় ছিলেন।

জোড়াসাঁকোয় গুরুদেবের পাশের ঘরে থাকতেন রথীদা, মাঝখানে একটি দেয়ালের ব্যবধান। সেই দেয়ালের গা-লাগা রথীদার খাট। রথীদার শরীর ভালো থাকত না মোটেই। রথীদা-বোঠান— সুস্থ ছিলেন না কেউ-ই। বোঠানের ছিল হাঁপানি, যখন সেই সাংঘাতিক টান উঠত সামনে দাঁড়িয়ে দেখা দুঃসহ ছিল!। রাতের পর রাত, দিনের পর দিন একটানা বোঠান কষ্ট পেয়ে যেতেন। আর রথীদার ছিল পেটে কি একটা গোলমাল, সর্বদাই অসুস্থবোধ করতেন। খাওয়া-দাওয়াও ছিল ঠিক রোগীর পথ্য, আমাদের কালে দেখেছি বরাবর।

গুরুদেব অনেক সময়ে এ নিয়ে ভাবতেন, বলতেন, রথী না জানি আমার আগেই যায়।

গুরুদেবের ঘরের পুবে পশ্চিমে লম্বা বারান্দা— এই বারান্দার মাঝখানে পর পর কয়েকখানাই ঘর, এর একটাতে থাকতেন বোঠান। আমরা গুরুদেবের ঘরে যেতে-আসতে বোঠান-রথীদার ঘরের দিকে তাকাতে তাকাতে চলতাম। দেখতাম রথীদার ঘরে রথীদা শুয়ে আছেন, কি আধশোওয়া হয়ে আছেন বিছানায়; ডাক্তারদের ভিড় খাট ঘিরে, তাঁরাই কথাবার্তা বলছেন অর্থাৎ গুরুদেবের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করছেন, আর রথীদা যেন অবশ মন নিয়ে সব শুনে যাচ্ছেন। কী করবেন কী বলবেন— নিজে হতে যেন বুঝতে পারছেন না কিছু। ডাক্তাররা যা বলছেন বোঝাচ্ছেন— তাই শুধু শুনে চলেছেন।

তার পর একদিন সব যখন শেষ হয়ে গেল— গুরুদেবের শেষ নিশ্বাস পড়ল, পাশের ঘরে খবর গেল— রথীদা এসে দাঁড়ালেন ঘরে। সে এক করুণ দৃশ্য। বিশাল এক পুরুষ— অবুঝ অসহায় শিশুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। কী ঘটেছে যেন বুঝতে পারছেন না। গুরুদেবকে দেখছেন আর ঘরের চারি দিকে চেয়ে চেয়ে সকলের মুখে দৃষ্টি ফেরাচ্ছেন। মর্মান্তিক সে-ভাব। আমার স্বামী, সুরেনদা তাঁকে আগলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

গুরুদেবকে সাজানো হল।

খবর রটে গেল দিকে দিকে। কলকাতার নাগরিক ছুটে এল শেষ দেখা দেখতে। জোড়াসাঁকোর সরু গলি। যে ঢুকছে সে চাপে চাপে চাপ খাচ্ছে, নড়বার উপায় নেই। গলির মুখে ভিড়ের চাপ আরো চেপে আসছে। লোকেরা সে চাপে দেয়ালে দরজায় গেটে কি করে যেন উঠে পড়ছে। যেন নিজেরা কেউ উঠছে না— ভিড় উঠিয়ে দিচ্ছে। পরে শুনেছি এ-সব বর্ণনা। বিচিত্রা হল ও ছয় নম্বর বাড়ির মাঝখানে যে লোহার কোলাপসিব্‌ল্ গেটটা ছিল— ভিড়ের চাপে ভেঙে গিয়েছিল তা।

ভিড় দেখে কারা কারা যেন তাড়াতাড়ি গুরুদেবকে নীচের উঠোনে নিয়ে এলেন। সেখানে নন্দদা সকাল হতে পালঙ্ক তৈরি করিয়ে রেখে সুরেনদাকে বলেছিলেন, রাজার রাজা আজ যাবেন, রাজসমারোহে সাজিয়ে দিতে হবে। আজ জমকালো বেনারসী চাদর নিয়ে এসো।

সুরেনদা সোনার-বুটি-তোলা লালরঙের বেনারসী চাদর নিয়ে এসেছেন। পালঙ্কে গুরুদেবকে শুইয়ে সেই বেনারসী চাদর গায়ে ঢাকা দিয়ে দিলেন নন্দদা সুরেনদা। রজনীগন্ধা, বেল-জুঁইয়ের গোড়ে মালাতে ঢাকা পড়ল পালঙ্ক। সে

দৃশ্য আর কতটুকু সময় দেখতে পেলাম পুবের বারান্দা হতে। বাইরে জনতার কোলাহল। নিমেষে পালঙ্ক লোকে ঘাড়ে তুলে নিল— নীচের গেট দিয়ে বাইরে বের হল। গুরুদেবের ঘর ডিঙিয়ে পুব বারান্দা হতে পশ্চিম বারান্দায় ছুটে এলাম। জনসমুদ্রের মাথার উপর দিয়ে পলকে একখানি ফুলের নৌকো ভেসে অদৃশ্যে চলে গেল।

শুনেছি, লোকে লোকারণ্য সেদিন নিমতলায় যাবার সকল পথ, পথের ধারের বাড়ি বারান্দা ছাদ। শুনেছি একই কথা অনেকেরই মুখে যে, বিশেষ কেউ বা কারা বহন করে নিয়ে যায় নি সেই পালঙ্ক। বিস্ময়ে সবাই দেখেছে— নৌকো যেন আপনিই তরতর করে এগিয়ে চলেছে লোকের মাথার উপর দিয়ে।

এত জমাট সে ভিড় ছিল যে, পায়ে পায়ে এগিয়ে যাবার উপায় ছিল না কারোর ভিড় ঠেলে। ভিড়ের হাতে হাতে মাথায় মাথায় চলে গেলেন গুরুদেব।

পশ্চিমের বারান্দায় লোহার রেলিঙে ঠেস দিয়ে ঐ-মুখী হয়ে বসেছিলাম কি-জানি কতক্ষণ। এক সময়ে আমার স্বামী এসে দাঁড়ালেন কাছে, ধীরে ধীরে বললেন, গুরুদেব ঘাটে পৌঁছে গেছেন। খবর এসেছে। রথীদা যাচ্ছেন। 'মুখাগ্নি' কথাটা উচ্চারণ করতে আর পারলেন না। বললেন, আমি যাচ্ছি— তুমিও চলো।

উঠে দাঁড়ালাম। একটা মোটরে, বাড়ির মোটরই হবে, রথীদার সঙ্গে আমরাও উঠলাম। ডাক্তার রাম অধিকারীও আছেন সঙ্গে। আর কে কে আছেন খেয়াল রাখি নি।

অনেকক্ষণ হয়ে গেছে গুরুদেব এই পথ দিয়ে চলে গেছেন। কিন্তু পথ তখনো লোকাকীর্ণ, তারই ভিতর দিয়ে আমাদের মোটর একটু একটু করে এগোতে লাগল। মোটর থামে এগোয়— আবার থামে, এই করে করে আমরা নিমতলা ঘাটের অনেকখানি কাছাকাছি এলাম, ঘাটের আরো কাছে এলাম, ভিড়ের চাপে মোটর চলে না— আমরা নেমে পড়লাম।

নিশ্ছিদ্র ভিড় নিমতলা ঘাটের পথে। রাম অধিকারী মশায় দু হাতে রথীদাকে আগলে ধরে ভিড় ঠেলে এগোবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমরা তাঁদের পিছনে একে অন্যকে শক্ত করে ধরে রইলাম। ঐ-তো দেখা যায় নিমতলা ঘাটের লোহার গেট। ভিড়ের ভয়ে সেটা বন্ধ করে দিয়েছে ভিতর দিক হতে। বাইরে যত ভিড়— ভিতরে তত ভিড়। ভিড়ের ভয়ে আতঙ্কিত ঘাটরক্ষীরা। কিন্তু যেতে যে হবে

ঘাটে— গেটের উঁচু লোহার পাল্লা দুটো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, আর একটুখানি পথ, এটুকু পেরোতে পারলেই ঘাটে পৌঁছতে পারি। রাম অধিকারী মশায়ের দেহে যেমন গলায়ও তেমনি জোর। তিনি চীৎকার করে ভিড়ের উদ্দেশে বলতে লাগলেন, আপনারা একটু পথ ছেড়ে দিন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র রথীন্দ্রনাথ এসেছেন পিতার শেষ কাজ করতে— আপনারা একটু পথ দিন।

রাম অধিকারী যতই চেঁচাচ্ছেন ভিড় ততই চঞ্চল হয়ে উঠছে— কোথায় রবীন্দ্রনাথের পুত্র— তাঁকে দেখবে তারা। মুহূর্তে ভিড়ে যেন উত্তাল তরঙ্গ জাগল। আর উপায় নেই ঘাটে যাবার। রথীদা শোকে অসুখে কাহিল ছিলেন, এবারে যেন সম্বিৎ হারিয়ে পড়ে যাবার মতো অবস্থা হল। রাম অধিকারী রথীদাকে জাপটে ধরে বিপরীতমুখী এগিয়ে মোটরে তুললেন। আমরাও উঠলাম। জোড়াসাঁকোয় ফিরে এলাম।

পরে শুনলাম বীরেনদা সুবীরবাবুকে নিয়ে গঙ্গাপথে গেলেন ঘাটে। শেষ কাজ যা করবার বংশের পৌত্র সুবীরবাবুই করলেন।

রথীদা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

গুরুদেব চলে গেলেন। জোড়াসাঁকো খালি হয়ে গেল। শান্তিনিকেতন হতে যাঁরা এসেছিলেন যে যা ট্রেন ধরতে পারলেন চলে গেলেন। বোঠানকেও পাঠিয়ে দেওয়া হল। রইলাম শুধু আমরা কয়জন।

পরদিন রওনা হলাম আমরা। লম্বা একটা ইণ্টারক্লাসে সুরেনদা, আমার স্বামী ও আমি, অন্যরা অন্যান্য কামরায়। সুরেনদা বড়ো ভারী একটা কাঁসার কলসী বাঙ্কের উপর রাখলেন, আর সেইমুখী হয়ে বসে রইলেন। ট্রেন স্টেশনে স্টেশনে থামছে, ছাড়ছে, সেই সময়ে ট্রেনে একটু ধাক্কা লাগছে— সুরেনদা আগে হতে উঠে কলসীটি ধরে থাকছেন, কলসীটি কাত হয়ে পড়ে যদি এই ভয়।

সন্ধে হয়-হয়— এসে পৌঁছলাম বোলপুর স্টেশনে। বিশ্বভারতীর বাস ছিল অপেক্ষায়, সেই বাসে উঠলাম। কারো মুখে কোনো কথা নেই। ভুবনডাঙার বাঁধের ধারে বাস থামল। আমরা রাস্তায় নেমে হাঁটতে লাগলাম। সেখান হতে পথের প্রথম গেট দিয়ে চীনভবন বাঁয়ে রেখে রান্নাঘর পেরিয়ে আশ্রমের ভিতর দিয়ে যে পথ সোজা উত্তরায়ণে এসে ঢুকছে সেই পুরো পথের দু ধারে আশ্রমের ছাত্রছাত্রী, সকল আশ্রমবাসী নীরবে লাইন করে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। স্তব্ধ সকলে। আমরা ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম। সকলের পুরোভাগে সুরেনদা— দু হাতে

বক্ষের কাছে ধরা কাঁসার কলসীটি। দু চোখ ভারী হয়ে আছে। পথ, পথের সারি— সব ঝাপসা হয়ে গেল।

কাঁকরের উপরে পা ফেলে চলেছি। আজ কাঁকরে পা ফেলার শব্দটুকুও ওঠে না। চার বছরের অভিজিৎ আমার হাত-ধরা— সেও চলেছে খালি পায়ে, আমার পায়ে পায়ে। মুখে তার আজ কথা নেই— কী বুঝেছে সে, সে-ই কি জানে!

উত্তরায়ণে এলাম। উদয়নের সামনের বারান্দায় প্রদীপের আলো ধূপের ধোঁয়ার মাঝখানে শ্বেতপদ্ম ঘিরে শ্বেতপাথরের চৌকির উপরে আসনখানি পাতা। সুরেনদা কলসীটি রাখলেন আসনের উপরে। বোঠান প্রণাম করলেন লুটিয়ে। আশ্রমবাসীরা এক এক করে প্রণাম করতে লাগল। আমরাও আর-একবার প্রণাম করলাম।

মাত্র কয়দিন আগে যে-গুরুদেবকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এই বারান্দা দিয়ে, আজ তাঁকে ফিরিয়ে আনা হল এক ঘড়া চিতাভস্মাবশেষ রূপে।

অনেকক্ষণ অবধি দূরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলাম। প্রদীপের আলোয় কাঁসার ঘড়াটি ঝিক্‌মিক্ করতে লাগল।

ধীরে ধীরে কোনার্কের দিকে পা বাড়ালাম। ঘরে ঢুকব, পারলাম না। সেই শিমুল গাছের তলায় লাল বারান্দার সিঁড়ির ধাপে বসে পড়লাম। একটি পাতাও নড়ছে না গাছে। আকাশ বাতাস সব থেমে আছে।

পরদিন।

মনে হল ভোরের আলোর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

নেই কোনো কাজের তাগিদ।

নেই ভাব-ভাবনার আসা-যাওয়া।

নেই চলার জোয়ার-ভাঁটা।

সব-কিছু যেন এক সীমাহীন শূন্যতায় ভরা।

সন্ধেবেলা— মন্দির হবে। থেমে থেমে ঘণ্টা পড়ছে এক দুই তিন। কেমন যেন আজ ঘণ্টার শব্দটা, যেন কান্নায় ভরা।

এতবার এত 'মন্দির' হয়েছে। উৎসবে আনন্দে শোকে মৃত্যুতে কতবার এসে মন্দিরে জড়ো হয়েছি, বসেছি, শুনেছি— বাধা লাগে নি কোথাও। আজ পদে পদে বাধা ঠেকছে, পা চলতে চায় না। টলতে টলতে এসে ঢুকি মন্দিরে। মন্দির ঘিরে কয়েক ধাপ খোলা সিঁড়ি, বরাবরই যেমন সিঁড়িতে বসি তেমনি বসলাম।

অবনীন্দ্রনাথ ও শ্রীমতী রানী চন্দ

মন্দিরের ভিতরে যতজন, বাইরে তার বেশি লোক। আজ মন্দিরে কে মন্ত্রপাঠ করবে? কে গুরুদেবের কথা বলবে? সকলের কণ্ঠ আজ রুদ্ধ। শেষ সংগীত— সেই গানটি হল: সমুখে শান্তি পারাবার ভাসাও তরণী হে কর্ণধার। এ গান তিনি রেখে গিয়েছিলেন আজকের দিনের জন্য। এই প্রথম গাওয়া হল। এক লাইন করে গান হয় আর থেমে থেমে যায়। চোখের জল বারে বারে কণ্ঠ চেপে ধরে— যারা গাইছে তাদেরও, যারা শুনছে তাদেরও।

এই গানটি যখন হচ্ছিল মন্দিরের ভিতরে, বাইরে সিঁড়ির উপরে বসে ছিলাম পশ্চিমমুখী হয়ে— চোখ ছিল ছাতিমতলার বৃক্ষরাজির মাথার উপরে। তার উপরে আকাশ। আকাশ-ভরা তারা। হঠাৎ চারি দিক আলোয় আলোময় করে বেশ বড়ো একটা নীলাভ আলোর খণ্ড তীব্র বেগে ছুটে এসে পড়ল উপর হতে। পড়ল ছাতিমতলার গাছটির উপরেই যেন। সে আলোয় চকিতের জন্য আলোকিত হল স্থান।

ঐ-মুখী হয়ে যারাই বসেছিলাম তারাই দেখেছি এ দৃশ্য। আর অনেকে দেখেছে আলোর ছটাটুকু।

এ ঘটনা সেদিন ঘটেছিল পরিষ্কার দেখেছি।

২০

গুরুদেব চলে গেলেন— আশ্রম যেন হা হা করতে লাগল। সব কাজ যেন ফুরিয়ে গেল। খালি হয়ে গেল চারি দিক। এই যখন অবস্থা এদিকে, অবনীন্দ্রনাথ এসে ভার নিলেন আশ্রমের। বুকভরা স্নেহমমতা ঢেলে সবাইকে ডাক দিলেন— জড়ো করলেন। উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরে দিয়ে আবার কাজে লাগালেন। বললেন, ওঠো তোমরা, মনে আনন্দ ফিরিয়ে আনো, তাঁর কাজে হাত লাগাও। তাঁর কাজ ফেলে রেখো না। এই দেখো আমাকে— আমি পেরেছি, আর তোমরা পারবে না?

গুরুদেবের পরে অবনীন্দ্রনাথকে না পেলে আমরা বোধ হয় উঠে দাঁড়াতে পারতাম না। তাঁর অভাব এক অবনীন্দ্রনাথই পেরেছিলেন ভালোবাসা দিয়ে ভরে দিতে। তিনি যেন নিজের হাতে আপন দ্বারের বন্ধ আগল খুলে দিলেন এতদিনে। বললেন, আয় তোরা আয়, কাছে আয়। বললেন, আর কাউকে ঠেকিয়ে রাখব

না। চলে আসুক সবাই।

অবনীন্দ্রনাথ ছোটোদের কাছে যান, তাদের গল্প শোনান। তারা এসে ডাক দেয় 'অবুদাদু'। অবুদাদু হেসে সভ্যগড়া 'কুটুম-কাটাম' দেখান তাদের। বয়স ভুলে মিলেমিশে এক হয়ে যান।

কলাভবনে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বসেন— ছাত্রছাত্রীদের বলেন, নিয়ে আয় তোদের ছবি, কে কী আঁকলি দেখি। তাদের ছবির গূঢ়তত্ত্ব বোঝান, ছবির সঙ্গে ভাব জমাবার রহস্যটি বলে দেন। শিক্ষকদের উপদেশ দেন কী করে ছাত্রদের আপন আপন পথে চলতে দিতে হয়।

শিক্ষাভবনে পাঠভবনে কলাভবনে শিশুবিভাগে সংগীতভবনে— সকল ভবনে সকল বিভাগে সাড়া পড়ে যায়— 'অবুদাদু' 'অবুদাদু'। শালফুলের ঝরে-পড়া পাপড়ির ঝরনার মতো হাসি ঝরে সকলের মুখে।

রবিকা নেই, সবার মুখে হাসি ফোটাবার দায় যে এখন তাঁর। তিনি উজাড় করে দিতে লাগলেন নিজেকে। যে-মানুষ আপনাকে বরাবর আড়াল করে রেখেছিলেন রবিকার ছায়ার অন্তরালে, আজ এক সকল-আবরণ-খসে-পড়া রূপ তাঁর।

আশ্রম নড়েচড়ে উঠল। আমাদের দৈনন্দিন কাজ মহা উদ্যমে শুরু হল। অবনীন্দ্রনাথও খুশি মনে এবারে ছবি আঁকা শুরু করলেন কাঁচের ঘরে বসে। উদয়নের সামনের বারান্দার কোণে ছোটো একটি ঘর, অতি ছোটো পরিসর — তিন দিক কাঁচ দিয়ে ঘেরা। এটিই তাঁর পছন্দ। সকালে এসে বসেন এখানে। স্বামী আর্জি পেশ করে রেখেছিলেন সেক্রেটারির কাজে তাঁকেই বহাল রাখতে। তিনি মঞ্জুর করেছিলেন প্রার্থনা। ডাক পড়লেই খাসনবিস 'হুজুর' বলে এসে সামনে দাঁড়ান, জরুরি চিঠিপত্রে সই নিয়ে যান। নন্দদা আসেন, চৌকাঠের ধুলো মাথায় নিয়ে একপাশে এসে বসেন। আশ্রমবাসীরা আসেন, ক্ষিতিমোহন সেন মশায় আসেন, কবীর দাদূর দোঁহার পুনরাবৃত্তি হয়। বোঠান বিবিদি এসে বসেন দুটি বালিকার মতো। গভীর সুন্দর এক ঘরোয়া পরিবেশ। কঠিন কিছুকে মনে হয় না কঠিন বলে। কোনো গুরুভার নেই কিছুতে, সহজ খুশির তরঙ্গ খেলে বেড়ায় সবেতে।

আমরা বেঁচে উঠলাম।

অবনীন্দ্রনাথ এখানে 'অবুদাদু'। ছোটো-বড়ো সকলের ভিড় তাঁকে ঘিরে।

দোল উৎসবে আমরা গুরুদেবের পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করতাম, অবুদাদুকে ছেলেমেয়েরা পা থেকে মাথা অবধি আবীরে মাখামাখি করে দিত। আবীর-রাঙা অবুদাদু লাল-টুকটুক জবাফুলের মতো বসে বসে সেই স্নেহের উৎপাত সহ্য করতেন।

অবনীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে কিছুকাল— কিছুকাল কলকাতায়, এই করে থাকতে লাগলেন। শান্তিনিকেতনে সবাইকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে নাড়া দিয়ে সব-কিছুকে যেন জাগিয়ে দিয়ে যেতেন।

অবনীন্দ্রনাথের কথা যতই বলি-না কেন, মনে হয় কিছুই বলা হল না। তাঁর কথা যে ভাবেই বলি-না কেন, মনে হয় কিছুই তাঁকে ফোটাতে পারলাম না। তাঁর ছবি— তাঁর ছবি আঁকার জগৎ আলাদা, ছবি দিয়ে তিনি ধরা আছেন লোকের কাছে। কিন্তু মানুষ-অবনীন্দ্রনাথ চিরকাল লুকিয়ে ছিলেন আড়ালে। আপনাকে আপনি ঢেকে রেখেছিলেন অতিশয় যত্নে। কী বিরাট— কী মহৎ মানুষ ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। তাঁকে ধরি আমরা কোন্ শক্তিবলে ?

আমি অবনীন্দ্রনাথের কাছে এসেছিলাম যখন, তখন তিনি খেলার জগতে। এ কথা লিখেছি আমার 'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ' বইটিতে। সে সময়ে অবনীন্দ্রনাথ শুধুই খেলা করছিলেন। ছবি আঁকা বন্ধ। বসে বসে যাত্রা লিখলেন খাতার পর খাতায়। লম্বা লম্বা খাতা, মোটা পেস্ট-বোর্ডের মলাট। খাতাগুলি থাকত পাঁচ নম্বর জোড়াসাঁকোর বাড়ির বিখ্যাত দক্ষিণের বারান্দায় তাঁর বসবার চেয়ারের বাঁ দিকে একটা উঁচু টেবিলে। ধুলো জমত খাতার উপরে কিন্তু ছুঁতে দিতেন না কাউকে। শুনতাম তাতে তিনি ইলাসট্রেশনও করতেন লেখার ফাঁকে ফাঁকে। এই ইলাসট্রেশনের কথা শুনতাম নন্দদার কাছে। এঁকে নয়, হাতের কাছে খবরের কাগজ মাসিক পত্রিকা যা এসে পড়ত তা থেকে কেটে কেটে রঙিন, একরঙা— হরেক রকম ইলাসট্রেশনে ভর্তি করে ফেলতেন যাত্রার খাতাগুলি। নন্দদার কাছে শুনতাম, দেশলাই বাক্সের উপরে ছাপা মেয়ের মুখ পেলেন— সেইটি কেটে খাতার পাতায় আঠা দিয়ে সেঁটে অশোকবনে সীতাকে বসিয়ে দিলেন।

. নন্দদার মনে অভিমান জমত। একদিন জিজ্ঞেস করলেন অবনীন্দ্রনাথকে— এই যদি হয়, এত সহজেই যদি ছবির আবশ্যক মিটে যায়, তবে এত কষ্ট করে আমাদের ছবি আঁকা শেখালেন কেন ? নন্দদা কিন্তু সেদিন এর কোনো জবাব পান নি অবনীন্দ্রনাথের কাছ হতে।

এমনি হরেক রকমের রঙ-বেরঙের নানা ছবি কাগজের টুকরো কেটে কেটে এটার কিছুটা ওটার কিছুটা জুড়ে জুড়ে আঠা দিয়ে আটকে দিতেন 'যাত্রা'র খাতার পাতায় পাতায়। নন্দদা বলতেন 'আধুনিক ছবি' বলতে যা বলা হয় এখন, তার চূড়ান্ত এ-সব ইলাসট্রেশনে।

যাত্রা লেখা বন্ধ হল— এল কুটুম-কাটামরা ভিড় করে। সেই যুগেই আমি এসেছি তাঁর কাছে। অবনীন্দ্রনাথ পোকায় খাওয়া ছোটো একটি কাঠের টুকরো বা মরা ডালের একটুখানি নিয়ে তন্ময় হয়ে আছেন। কত রূপ-রেখা ভেসে উঠছে তাতে। আনন্দে ভরে উঠছে অবনীন্দ্রনাথের মুখ। এই কুটুম-কাটামরা ঠাঁই পায় তাঁর চারি ধারে। কত কথা হয় তাদের সঙ্গে নিরিবিলিতে। এক-একটি বস্তু এক-এক ভাবে প্রাণ পায় তাঁর হাতে।

শান্তিনিকেতনেও এই-সব কুটুম-কাটাম নিয়ে তাঁর খেলা দিনে দিনে বেড়ে চলছিল। ছেলেরা যেখানে যা পেত শুকনো ডাল— তালের আঁটি সব এনে জড়ো করত অবুদাদুর ঘরে। ঘরের কোনায় স্তূপ জমত।

কত সময় দিতেন তিনি তাঁর কুটুম-কাটামদের। জিরাফ গড়ছেন— গলা বাড়িয়ে আছে জিরাফ। ঘর থেকে লম্বা গলা সমেত মুখটা তার অনেকখানি উপর দিকে তুলে ধরা। জিরাফের গলা নড়া চাই একটু। কিন্তু কিছুতেই বাগ মানানো যাচ্ছে না। গলায় ফুটো করে সুতো ঢুকিয়ে পিছন দিক হতে কত টানাটানি। গলা নড়ে না। অবনীন্দ্রনাথ বললেন, এ হল না, মানে প্রাণ পেল না। তাই নড়ছে না। একে অন্যভাবে দেখতে হবে, আজ রেখে দাও।

একটি সামান্য কাঠের টুকরো— তাঁর একান্ত আপন জন— কুটুম-কাটাম, তাঁকে গড়তে কতভাবে ভাবেন। 'প্রাণ পেল না'— এই প্রাণ তিনি কুটুম-কাটামের ভিতর সত্যিকারের অনুভব করেন।

একদিন দেখি সকাল হতে অবনীন্দ্রনাথ 'ভূতের বউ' হাতে নিয়ে বসে আছেন। লাল শাড়িপরা, তালের আঁটির মুখ, ভূতের বউ ঝুলছিল দেয়ালের গায়ে। তাকে নেড়েচেড়ে তাতে মুভমেন্ট আনলেন। বললেন, দেখ দেখ, কেমন নাচছে এবারে। অল্প একটু মুভমেন্ট, তাতেই কতখানি বোঝা যায়।

নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে,
নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো জেগে উঠেছে।

বললেন, নেড়েচেড়ে দেখতে হয়, তবেই দেখবে সব বেঁচে উঠেছে। এবারে

এর একটি বাক্স করতে হবে। কিরকম বাক্স হবে তাই ভাবছি। দিব্যি খাটে শুয়ে আছে এ হলেও মন্দ হয় না, মশারি-টশারি টানিয়ে দেওয়া যাবে— কি বল?

বললেন, আচ্ছা একটু কাগজ আনো তো, আগে এর একটা ছবি এঁকে ফেলা যাক।

কাগজ রঙ এনে দিলাম। তিনি ভূতের বউ আঁকলেন। বললেন, রাত-দুপুরে দোল খেলতে বেরিয়েছে বউ ছাঁচতলায়। বেশ হচ্ছে। না, থাক্, দোল খেলা নয়, দেওয়া যাক একে ছাদে ঝুলিয়ে। কেমন? গয়না কিছু দিতে হবে তো? হাতের শাঁখা নাচের চোটে খুলে খুলে পড়ছে, বাঃ— বাঃ, ঠিক হয়েছে এবারে।

সবাই বলে, অবনীন্দ্রনাথ পুতুল গড়ছেন, অবনীন্দ্রনাথ খেলছেন। কিন্তু এ কি শুধুই খেলা? এই খেলার জগতের সন্ধান পায় কয়জনা?

এই খেলা করতে করতে অবনীন্দ্রনাথ আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিতেন, দেখতে শেখাতেন, অজানা এক রাজ্যের রূপ-রসের আস্বাদ এনে দিতেন। এই কুটুম-কাটাম দিয়েই কত ভাবে কত শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এ জিনিস দেখবার চোখ ছিল না কারো— এ সন্ধান তিনিই মিলিয়ে দিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, এরা যে সব জীবন্ত, এদের ধরতে চেষ্টা করো। দেখে-শুনে ফেলে রেখে দেবে, খেলা করে ভাঙবে, এরা সে জিনিস নয়। এদের একটা আলাদা ভাব আছে, ধরতে যখন পারবে তখন দেখবে যে, এরা এ জগতেরই মানুষ। প্রকৃতির ছেলেমেয়ে এরা। সাধে কি কুটুম-কাটাম নাম দিয়েছি? তুমি আঁকো দেখি নি কয়েকখানা? ব'লে নিজেই একটি কুটুম-কাটাম হাতে নিয়ে আঁকতে লাগলেন। ছোটো একটি ডাল ইউক্যালিপটাসের, বাকল উঠে ডালটুকু সাদা হয়ে আছে। অবনীন্দ্রনাথ বললেন, এ কি শুকনো গাছের ডাল? এ যে নটরাজ। ছাই-মাখা শিব নাচছে কেমন দেখো।

পরে তাঁর কাছে বসে কয়েকখানা ছবি আঁকলাম কুটুম-কাটামের। আঁকতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। দেখি শুকনো কাঠের টুকরোটিতে কত রঙ— ঠিক যেখানে যেমনটি থাকা দরকার সব আছে তাতে। কাঠের চিলতে একটি— দেখি, চিলতে তো নয়, এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন ছাদে আলসের ধারে। তার গায়ের জোব্বা, মুখের গড়ন, শুভ্র গুম্ফ, মাথার টুপি— সব-কিছু এই চিলতেটুকুর মধ্যেই সূক্ষ্ম রঙে রেখায় সুসম্পূর্ণ। দেখতে গিয়ে যেন দেখার দৃষ্টি ফিরে পেলাম।

কিছু আঁকলেই যে তা ছবি হল— এ কথা মানতেন না অবনীন্দ্রনাথ। দেখেছি

তিনি যখন ছবি আঁকতেন আমাদের শেখাবার জন্যই, যেন চোখ খুলে দেখবার জন্যই আঁকতে আঁকতে বলতেন, হল না, এখনো এ ছবির কোঠায় আসে নি। একে বলব 'নক্‌শা'। তার পর রঙ-তুলি বুলোতে বুলোতে এক সময়ে বলে উঠতেন, এবারে এ 'ছবির কোঠায়' এল। এখন একটু ফিনিশ করলেই হয়ে যায় ছবি একখানা।

এই 'ছবির কোঠায়' ছবির আসা চাই। বসে বসে দেখতাম। সব কি আর বুঝতে পারতাম?

আঁকতে আঁকতে আবার কত সময়ে কত মজাই না হত। কাছে বসে তাঁর ছবি আঁকা দেখতে দেখতে সে-মজা দেখতে পেতাম। একদিন অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকছেন, খুব সুন্দর ছবিখানা শুরু হল। প্রথমে কাগজের মাঝামাঝি একটা সরু গাছ আঁকলেন, তার পাশে আরো কয়েকটা গাছ। গাছের নীচে একটি 'ফিগার' বসিয়ে দিলেন, বললেন, বুদ্ধদেব বসেছেন।

ছবিতে রঙ চলতে লাগল— কাজ হতে লাগল। রঙ দিতে দিতে কাজ হতে হতে এক সময়ে বললেন, এখানে এতবড়ো একটা লোক কী করছে বসে? ব'লে মুখটা তার ঘষে তুলে দিলেন। তার পর আরো খানিক বাদে সেখানে তুলি ঘষতে ঘষতে বললেন, বসেছে যে, আর উঠতে চাইছে না দেখি।

শেষে হতে হতে দেখা গেল পট পরিবর্তন হয়ে গেছে। আকাশের গায়ে প্রকাণ্ড এক গাছের কোটরে— ছবির যেখানে আগে মাটি ছিল— যে মাটিতে বুদ্ধদেব বসে ছিলেন সেখানে দুটি ময়ূর-ময়ূরী বসে আছে। আকাশে অকালে বিদ্যুৎ দেখে তারা চমকে উঠছে।

আমাদের আমলে পোস্টকার্ডে ছবি আঁকার খুব চলন ছিল। বরাবর দেখেছি নন্দদা তাঁর ছাত্রছাত্রীদের নববর্ষে, বিজয়ায়, ও বিশেষ বিশেষ দিনে বা কারণে পোস্টকার্ডে ছবি এঁকে পাঠাতেন। আমরাও পাঠাতাম। এই পোস্টকার্ডের ছবির মাধ্যমে কত প্রশ্ন-উত্তর, কত উপদেশ-নির্দেশ থাকত। আমাদের নিজেদের মধ্যেও একে অন্যকে পোস্টকার্ড এঁকে পাঠাতাম। চিঠির চেয়ে এই রকম আঁকা পোস্ট-কার্ডেরই চল ছিল বেশি আমাদের।

নন্দদার কাছে শুনেছি গল্প— গগনেন্দ্রনাথকে নন্দদা ওঁরা 'বড়োবাবু' বলে বলতেন; নন্দদা বলছিলেন, বড়োবাবু একবার দার্জিলিঙে গেলেন। সেখান থেকে কলকাতায় টাইকানকে একটা ছবি এঁকে পোস্টকার্ড পাঠালেন। টাইকান আবার পোস্টকার্ডে এঁকে তার উত্তর পাঠালেন। দেখাদেখি আমরাও ওঁকে (অর্থাৎ

অবনীন্দ্রনাথকে) এঁকে কার্ড পাঠালাম। উনিও আমাদের কার্ড পাঠাতে লাগলেন। এই করে সেই থেকে পোস্টকার্ড আঁকা চল হয়ে গেল।

সেই গল্পই ফিরে হচ্ছিল একদিন। নন্দদাও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। অবনীন্দ্রনাথ বললেন, তখনকার সেই-সব পোস্টকার্ডও ছিল কী এক-একখানা, 'ফিনিশ্‌ড্‌' ছবি। নন্দলালের 'দীক্ষা' ছবিখানা, ও তো এমনি এক পোস্টকার্ডে আঁকা। আর-একখানা পোস্টকার্ড ছিল— একটি ছোটো মেয়ে গোরুর সেবা করছে। কী রঙ দিয়েছিল মেয়েটির গায়ে, আহা! তখন ঐ পোস্টকার্ডই ছিল তখনকার চলতি আর্ট। যার যা ইচ্ছে আঁকত, এঁকে পাঠাত। ঐ পোস্টকার্ডে ছিল সকল স্বাধীনতা। ঐগুলিই ছিল তখনকার দলিল যে, হ্যাঁ, শুধু ছবিই নয়, ছবি তো অন্য ধরনের হত। কিন্তু এই চলতি আর্টও ছিল। সে-একটা ইতিহাস চাপা পড়েই রইল নন্দলাল। আমাদের সেই বিজয়যাত্রার ইতিহাস। কী ভাবে চলতে শুরু করে-ছিলেম, কী ভাবে চলেছিলেম, সে আর বলা হল না। কেউ আর তা জানল না।

নন্দদার কাছাকাছি বসেছিলাম আমি। নন্দদা ইশারায় অবনীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, 'দীক্ষা'র ছবিখানা যে করেছিলাম— ওঁর এখনকার চেহারার সঙ্গে একেবারে মিলে যায়।

অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন বেদে-পুরাণে যে গুরুর কথা শুনি— সেই 'গুরু'। তিনি আপন শক্তি দান করতেন। শিষ্যের দৃষ্টি খুলে দিতেন। অন্ধকার সরিয়ে দিতেন। সহজ ভাবেই করতেন।

অবনীন্দ্রনাথের কথায় নন্দদা বলতেন, ছাত্রদের যেন দুই ডানা মেলে আগলে রাখতেন, সকল ঝড়ঝঞ্ঝা— সকল দুর্বিপাক থেকে। ছবি আঁকা শেখা হয়ে গেল। ছেড়ে দিলেন ছাত্রকে, এ ছিল না তাঁর কাছে। শিষ্যের সারাজীবনের ভার তাঁর উপরে, এইভাবে দেখতেন আমাদের।

অপূর্ব এক সম্বন্ধ ছিল অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালে। অবনীন্দ্রনাথ বলতেন, অনেকে আমায় জিজ্ঞেস করেছিল— আপনি আর্ট স্কুলে থেকে গেলেন কেন? থেকে গিয়েছিলাম দেখতে যে, আর-একটি নন্দলাল আসে কি না। এল না।

এবারে নিজের কথা একটু বলি। আর হয়তো সময় পাব না। আমাকে এনে সামনে ধরবার জন্য বলছি না, ধুলো-মুঠোকেও যে তিনি অবজ্ঞা করেন নি— সেই কথা বলতেই বলছি।

অবনীন্দ্রনাথের কাছে আসার যোগ্যতা ছিল না আমার, অবোধ অজ্ঞান

নারী আমি। সেই আমাকে খেলা দিয়েই কাছে টেনে নিলেন। খেলাচ্ছলেই একদিন তিনি আমাকে ফিরে ছবি আঁকার মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন। তাঁর দান ছিল খেলার আকারে। গ্রহীতা যে, সে বুঝতেও পারত না কী পেল, কতখানি পেল। দু হাত ঢেলে দেওয়া দানের ঐশ্বর্যে সে ডুবে থাকত। সময় লাগত তা থেকে উঠে মুখ বাড়িয়ে দেখতে। ততক্ষণে দাতা হতেন অদৃশ্য। সবই ছিল খেলা।

অপার ছিল তাঁর স্নেহ, অতল ছিল তাঁর মমতায় ভরা প্রাণ! তখন সবে 'ঘরোয়া' লেখা হচ্ছে, আরো-কিছু গল্পের জন্য জোড়াসাঁকোতে আছি। অবনীন্দ্রনাথ খুব খুশি, তিনি ঝরনার মতো গল্প ঢেলে দিচ্ছেন। বললেন, স্মৃতির ভাণ্ডার থাকা চাই, তবে না স্মৃতি-চিত্র লেখা যায়। আমি বলে যাব সব— যা আছে আমার স্মৃতি-ভাণ্ডারে। কত যে আছে, অগাধ। সব নিয়ে নাও তুমি এই বেলা, তোমাকেই দিয়ে যাব। আমার শরীরও খারাপ হয়ে এসেছে, আর দেরি কোরো না। তোমার হাত দিয়েই আমার গল্প বেশ ফুটে ওঠে, ও সবাই পারে না। সেদিন অঘোর ঘটক এসেছিল সেকালের অভিনয়ের গল্প নিতে। বললুম, ও-সব রানীর জন্য জমা আছে, আর কেউ পাবে না। তবুও দিলুম একটুখানি ছোটো একটা গল্প। বললুম, এইটুকু নিয়েই খুশি হও গিয়ে। সে যে ঐ গেল— আর এ-মুখো হল না। আমি তো সেদিন মোহনলাল-শোভনলালদের তাই বললুম, তোরা তো কেউ নিলি নে গল্প, ভাগ্যিস রানী নিল, তাই আমার গল্পগুলি রইল। নিজে লিখলেও অমন হত না। শুনছি বিশ্বভারতী বই বের করবে। শোভনলালদের বললুম, তোমরা কেউ হাত দেবে না ঐ বইতে। ও আমি রানীকে দিয়েছি— সব স্বত্ব রানীর প্রাপ্য। তা ওরাও বললে, সে কী কথা, আমরা কেন হাত দিতে যাব, ওঁরই থাকবে সব। হ্যাঁ, তোমার সব অধিকার, আমি তোমাকেই দিয়েছি, আরো দেব। তুমি সব বুঝে নিয়ো, ছেড়ো না কিছু। এইবারে সময় হাতে নিয়ে এসেছ তো? বেশ। শোনা-গল্প থেকে আরম্ভ করে দেখা-গল্পেতে এসে থামা যাবে। ও অনেক আছে।

১৯৪২ সালের আন্দোলনে জেলে গিয়ে ঢুকলাম। পরে শুনেছি অবনীন্দ্রনাথ দুঃখ পেয়েছিলেন এ নিয়ে। বেরিয়ে এলাম যখন অবনীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। মনে হল যেন আমারই জন্য অপেক্ষা করছেন। লুটিয়ে প্রণাম করলাম তাঁকে। এমন আশ্রয়ে যেন সকল ভার নেমে গেল, হালকা বোধ করলাম। মনে একটা ভয় জেগে রয়েছিল যে অবনীন্দ্রনাথ অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন আমার

প্রতি। কিন্তু আমাকে তিনি কিছুটি বললেন না। আম্বালাল সারাভাই-এর মেয়ে গীরা আন্দোলনের সময়ে কয়েক মাস এসে এখানে ছিল— অবনীন্দ্রনাথের কাছে ছবি আঁকা শিখছিল। অবনীন্দ্রনাথ সেই গীরার কথাই উল্লেখ করে যেন প্রকারান্তরে বললেন ছবি আর রাজনীতি একসঙ্গে চলে না।

ছবি আঁকি না, আমার স্বামীর মনে এ নিয়ে বিশেষ একটা বেদনা।

একদিন অবনীন্দ্রনাথ বললেন, দেখো— প্রতিমা একটা ড্রইং এনে ধরেছিল আমার কাছে, রবিকার একটা পোর্ট্রেট ড্রইং। বললে, এটা কার আঁকা জানি না, এটাতে একটু রঙ দিয়ে দাও। মনে হল ওটা তোমার আঁকা। রঙ দিয়ে দিলাম— নিয়ে গেল। বোধ হয় রবীন্দ্রভবনে দিয়ে থাকবে। রবিকার ঘর নাড়াচাড়া করতে গিয়ে স্কেচটা পেয়েছিল প্রতিমা। ওটা তুমি এনে একটা কপি করে রাখো নিজের কাছে।

মনে পড়ল— অসুস্থ গুরুদেব উদয়নের দোতলার ঘরে আছেন। সেদিন একটু ভালো বোধ করছেন। গুরুদেব দূর দেখতে ভালোবাসেন। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের খোলা জানালার ধারে তাঁকে একটা কোচে বসিয়ে দিলাম, স্থির দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এখন কিছুক্ষণ কিছু করবার নেই, ওষুধপথ্য খাওয়ানো হয়ে গেছে। আধ-ঘণ্টাটাক সময় আছে হাতে। শুধু শুধু বসে না থেকে কিছু একটা করলে খুশি হন তিনি। আমি গুরুদেবের একটা স্কেচ-প্যাড নিয়ে কালো ক্রেয়ন পেন্সিলে তাঁরই একটা পোর্ট্রেট ড্রইং করলাম। শুধু বাইরের লাইন কয়টা দিয়ে প্যাডটি শেল্‌ফের উপরেই রেখে দিলাম। ভাবলাম পরে আবার সুবিধে পেলেই ভালো করে ড্রইংটি ফিনিশ করে ফেলব। কিন্তু পরে আর খুঁজে পেলাম না।

রবীন্দ্রভবন থেকে ছবিটি চেয়ে আনলাম। হ্যাঁ, সেদিনের সেই ড্রইংই এটি। কপিও করলাম। তাঁর দেওয়া রঙের টাচ কি আমি পারি টানতে? শুধু একটু আভাস মতো করা রইল। আমার অপটু হাতের ড্রইং, অবনীন্দ্রনাথের হাতের রঙ— তাঁর সই ছবির পাশে, এ ছবিতে আমার সই-ও রাখতে হল।

হয়ে গেল ছবি আঁকা। অবনীন্দ্রনাথ উদয়নে কাঁচের ঘরে এসে বসেন রোজ সকালে। কোনোদিন কুটুম-কাটাম গড়েন, কোনোদিন শুধুই বসে থাকেন। মুখে থাকে বর্মা চুরুট— কখনো জ্বলন্ত কখনো নিবন্ত।

আমিও রোজ সকালে এসে তাঁকে প্রণাম করি। তাঁর ডান দিকে সামান্য একটু পিছনে জানালার খাঁজটাতে গিয়ে বসি— বসেই থাকি। চুপচাপ সময় কাটে।

এই বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করি না। আমার ছবি আঁকার মনটাই কেমন উধাও হয়ে আছে। ছবি আঁকার কথা মনেও আসে না।

দিন যায়।

তখন বুঝি নি — এখন বুঝছি। অবনীন্দ্রনাথ দেখলেন এতে তো হবে না। খেলা দিতে হবে। তাই একদিন যেন আপন মনেই বললেন, চুপচাপ বসে আছি, একটু ছবি-টবি আঁকলে হয়।

অনেক কাল ছবি আঁকেন নি। যেন তাঁর নিজেরই ইচ্ছে জাগছে ছবি আঁকতে— এই রকম একটা ভাব।

বললেন, কী আঁকা যায় বলো দেখি-নি? আচ্ছা, এই উদয়নই আঁকি। সকালবেলার রোদ্দুর এসে পড়ে, সে যে কী সুন্দর লাগে দেখতে!

কয়দিন এই রকম বলতে বলতে একদিন সকালে প্রণাম করে নিত্যদিনের মতো আমার নির্ধারিত স্থানে বসতে গেছি, অবনীন্দ্রনাথ বললেন, আনো তো একখানা কাগজ। আজ মন হয়েছে ছবি আঁকি।

কাগজ বের করলাম, রঙ তুলি সাজালাম। ছবি আঁকবার জল বোর্ড সব ঠিক করে দিলাম।

তিনি বললেন, বাড়িটার একটা স্কেচ চাই। বাইরে দাঁড়িয়ে ওটা তো আমি করতে পারব না। তুমি বাড়ির স্কেচটা করে নিয়ে এসো।

আমি বাইরে এসে উদয়নের একটা স্কেচ করলাম কাগজটার উপরে। নিয়ে এলাম তাঁর কাছে। তিনি তাতে রঙ দিলেন, ওয়াশ দিলেন। স্নানাহারের সময় হল। তিনি উঠলেন। বললেন, বিকেলে আবার বসা যাবে।

বিকেল তিনটে থেকে আবার ছবি নিয়ে বসলেন। ছবি শেষ হল— কোনায় নিজের নাম সই করলেন, আমার নামও লিখে দিলেন। বললেন, থাক্ তোমার নামও এতে, তুমিও তো করেছ কাজ।

পরদিন বললেন, ঐ মাপের আর-একখানা কাগজ নাও। আজ কী করা যায়? আজ শ্যামলীটা এঁকে আনো দেখি।

শ্যামলী এঁকে আনলাম। তিনি তাতে রঙ দিলেন, ওয়াশ দিলেন, ধরে ধরে ফিনিশ করলেন। শ্যামলীর ছবি হল একটি।

তার পর দিন আম্রকুঞ্জ। বললেন, যাও-না, ভয় কি? যেমন তোমার ইচ্ছে পেন্সিলে এঁকে নিয়ে এসো।

এঁকে আনলাম। তিনি রঙ দিলেন, ওয়াশ দিলেন। বললেন, দাঁড়াও, একটু চুরুট খেয়ে নিই। তুমি ততক্ষণ গাছগুলিতে একটু রঙ দাও, ডাল-ক'টা ফুটিয়ে তোলো।

একবার ছবিতে আমাকে দিয়ে কিছু করান, একবার নিজের কোলে তুলে নেন বোর্ড। ছবিতে রঙ দেন— ওয়াশ দেন। হয়ে গেল আম্রকুঞ্জের ছবি একটি।

এখন আর অবনীন্দ্রনাথকে বলতে হয় না। নিজেই জিজ্ঞেস করি, আজ ?

—আজ সিংহসদন।

—আজ ?

—আজ দিনান্তিকা।

এইভাবেই আঁকা হল বকুলবীথি, ঘণ্টাতলা।

আশ্রমে বটগাছের নীচে আমাদের পুরাতন ঘণ্টা বাঁধানো বেদীর উপরে দুই থামের মাথায় ঝোলে। ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে। আশ্রমের ওঠা বসা শোওয়া চলে এই আওয়াজ শুনে। অবনীন্দ্রনাথ একটি বুড়োকে বসিয়ে দিলেন থামের গায়ে ঠেসান দিয়ে। বললেন, থাক্ এ এখানে। আদ্যিকালের বুড়ো, বসে বসে সে ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে— এক দুই তিন, এক দুই তিন।

এমনি রোজ ছুটে যাই, এক-এক জায়গার স্কেচ করে নিয়ে আবার ছুটে আসি। অবনীন্দ্রনাথ ছবিতে কিছু বাদ দেন, কিছু-বা জুড়ে দেন। পেন্সিলের স্কেচ ছবি হয়ে ওঠে। দুজনেই খুশি হয়ে উঠি।

এ যেন এক খেলা আমাদের।

দেখতে দেখতে এমনি করে আশ্রমের নানাস্থানের এক সেট ছবি হয়ে গেল। দুজনের নামসই তিনিই করতেন ছবিতে। একটু শিউরে উঠতাম, কিন্তু তা নিয়ে মাথাও ঘামাতাম না। দিনান্তিকার ছবিতে কেবল অবনীন্দ্রনাথের সই রইল, আমাকে বললেন তোমার নামটা লিখে ফেলো। আমি তেমনি রেখে দিলাম।

শান্তিনিকেতনের ছবি হয়ে গেল।

—এবার ?

খেলার নেশায় পেয়ে গেছে আমাকে।

—এবারে কী এঁকে আনি ?

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, এবারে তোমার যা মন চায় তাই আঁকো। কাছের সাবজেক্টটাই আঁকো। বলতে-বলতে জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন এক বৌদ্ধ

ভিক্ষু— চীনভবনের এক ছাত্র, টকটকে কমলারঙের বস্ত্রে আবৃত দেহ, চলেছেন উত্তরায়ণের আঙিনা দিয়ে শ্যামলীর অভিমুখে। বললেন, ঐ তো বৌদ্ধ ভিক্ষু চলেছে মেহেদীবেড়ার পাশ দিয়ে। আঁকো ঐ ছবি একখানা।

—এবার ?

—কোনার্কের গা বেয়ে উঠেছে নীলমণি লতা, এর ছবি আঁকো। রবিকার প্রিয় লতা— নীলমণি লতা, শখ করে নাম রেখেছিলেন তিনি। আঁকো দেখি-নি।

—এবার ?

—ঐ কুয়োর ছবি একখানা এঁকে রাখো। তৃষ্ণার জল দেয়— কবে শুকিয়ে যাবে।

—ঐ দেখো, তিনটি মেয়ে কেমন চলেছে। তিন সখী। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে চলেছে— নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছে। এই তো কত সুন্দর ছবি একটি। আঁকো আঁকো।

পাশে বসে একের পর এক ছবি আঁকি। তিনি সেই-সব ছবির উপর ওয়াশ দেন, রঙের খেলা খেলেন। বিস্ময়ে আনন্দে ভরে উঠি।

একদিন বললেন, তুমি তো আঁকছ। আমাকেও একখানা কাগজ দাও, আমিও কিছু আঁকি।

আলাদা করে অবনীন্দ্রনাথও আঁকতে শুরু করলেন। ছবির পর ছবি হতে লাগল। রোজ ভোরে উঠে কাঁচের ঘরে তিনি এসে বসে থাকেন, আমি এসে প্রণাম করতেই বলেন, দাও কাগজ একখানা, দুর্গানাম জপ করি।

এই 'দুর্গানাম জপ করা' আমাদের একটা ভাষা হয়ে গিয়েছিল। পরে আর 'কাগজ দাও' বলতেন না। বলতেন, দাও দেখি, আগে দুর্গানাম জপ করে নিই।

সাইজ করা কাগজ কাটা থাকত— তা হতে একখানা কাগজ এনে বোর্ডের উপরে দিই। তিনি বোর্ডখানা কোলের উপরে তুলে ছবি আঁকেন। তাঁর আঁকা শেষ হলে বলেন, নাও, দুর্গানাম জপ হল। এবারে আনো তোমার ছবি, দেখি।

এই করে অনেক ছবি আঁকা হয়ে গেল। আঁকা তো নয়— খেলা। হাসিতে গল্পেতে নানা মজা পেয়ে প্রাণের আনন্দে খেলা করে চলেছি। খেলতে খেলতে খেলায় ভুলিয়ে আবার তিনি আমাকে ছবির সঙ্গে বেঁধে দিলেন কোন্ এক ফাঁকে জানতেও পারি নি।

বেশ-কিছুকাল আশ্রমে কাটিয়ে এবারে কলকাতায় ফিরে যাবেন অবনীন্দ্রনাথ।

স্টেশনে এসেছি তাঁকে ট্রেনে তুলে দিতে। মন খারাপ, চোখ ছলছল করছে। ট্রেন এল। দাঁড়িয়ে আছি ট্রেনের দরজার গা ঘেঁষে। অবনীন্দ্রনাথ ট্রেনে উঠবেন— পাদানিতে পা তুলতে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন, ডান হাতে আমার মুখখানা নিয়ে বললেন, এবার হতে আমার হয়ে তুমিই দুর্গানাম জপ করো— কেমন? ব'লে ট্রেনের কামরায় উঠে গেলেন।

এতকাল ধরে আমার বড়ো শখ ছিল— আমার এই শেষ বইখানিতে শান্তিনিকেতনের সেই ছবিগুলি ছাপাব। তা আর হল না। ছবিগুলি জিৎভূমেই ছিল, এখন দেখি নেই। জানি না কোথায়? আর কি তাদের পাব ফিরে? তবে লিখে রাখলাম— যদি কোনোদিন এর হদিশ মেলে— এই ছবিগুলির ইতিহাসটা রইল ধরা এই লেখাতে।

২১

অলস সময় বেঁধে রাখছিল আমাকে আমার মনকে।

হীরেনবাবু প্রমুখ হিতৈষীরা বলেন, আপনি লিখুন, শান্তিনিকেতনের স্মৃতিকথা লিখতে শুরু করুন। অমিতাভ অরুণ অভিজিৎ তাগিদ দেয়। আমার অজানা অদেখা বান্ধব 'পাঠক' অলক্ষ্যে থেকে উৎসাহ দেন। কিন্তু কী লিখি— কী ভাবে লিখি? ভূদেব বলে, আপনি বিচরণ করুন, বিচরণ করতে করতে যা মনে আসে— লিখে যান।

সেই বিচরণই করে চলছি। যেতে যেতে ডাইনে বাঁয়ে ডাক শুনি, ঝোপঝাড় হতে বনজুঁই বনপুলক আঁচল ধরে টানে। কেউ দেখা দেয়, কেউ ডেকে কথা কয়, কেউ কৌতুক করে তার সুবাস ঢালে। আবার ফিরে আসি, আবার একটু গল্প করি তাদের সঙ্গে।

জুঁই চামেলির বিতান আর নেই এখানে ওখানে। নেই মধুমালতী হাস্নুহানা। মেয়েরা বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে তার তলায় বসে মালা গেঁথে জড়ায় না খোঁপায়। এখন থাবা থাবা গাঁদা ফুল গলা ছেড়ে হাঁকডাক করে। দুদিনের মরসুমি ফুলে ভীরু সৌন্দর্য হাওয়ায় কাঁপে। আপনি ফুটে থাকে যে নয়নতারা আনাচে কানাচে অজস্র বেড়ে উঠে— এখন আর তার স্থান নেই এখানে। এই তো বসন্তকালে বাতাবি লেবুর গাছ, কচি পাতার স্নিগ্ধ উজ্জ্বল সাজ তার। যেন পান্নাগলা সাগরের জলে ডুব দিয়ে এল সে। পাতায় পাতায় রোদের আলো হীরে ফুটিয়ে তোলে। আর

বাতাবি লেবুর ফুল, সে মুঠো মুঠো সৌরভ ছিটিয়ে চমকে দেয় ভোলা পথিককে, বলে, আমরা এসে গেছি, এসে গেছি, একবার তাকিয়ে দেখো এদিকে।

শালগাছে নতুন পাতার লালচে সবুজ রঙ, যেন সোনার অলংকারে ঝলমল করা— ঢাকাই শাড়িতে গা ঢাকা কিশোরী কন্যা এক-একটি। দিকে দিকে রসের রূপের সম্ভার। শেষ নেই এর।

বাগানে একটা গাছ উঠেছিল আপনা হতে। কী গাছ জানি না— কেউ বলতে পারে নি। দিনে দিনে গাছটি বেড়ে উঠতে লাগল— তিনটি ডাল নিয়ে ত্রিশূল আকারে। সকলের মধ্যে ঠাঁই করে সে আপনিই নিল। আরো বড়ো হল, আরো মাথা ছাপিয়ে উঠল। দু দিকে দুই শাখা মেলে ধরল, মাঝখানে শির উন্নত করে রইল তৃতীয় শাখাটি। এখন তাকে দাবায় কে? প্রতি বসন্তে নব কিশলয়ে শাখা-প্রশাখা ভরিয়ে তোলে। প্রদীপশিখার মতো ঊর্ধ্বমুখী ছোটো ছোটো লাল রঙের পাতাগুলি নিয়ে সহস্র আলোকস্তম্ভের রূপ ধরে। বসে বসে শুধু দেখি।

কত হোলি খেলা চলে গাছে গাছে। পাতার ঘন সবুজ যেন কিছু দিনের জন্য কোথায় চলে যায়। লালচে হলদে সোনালি গোলাপি— নানা রঙের মেলামেলি পাতার সবুজে। ফুল আর কত শোভা ধরে— পাতার রূপের এই বন্যার কাছে? নাগকেশর ফুলের গাছ— টুকটুকে লাল পাতার স্তবকে স্তবকে কত অঢেল হাসি। ফুল কি পারে তাকে ঢাকা দিতে? সে মন কাড়ে শুধু সৌরভটুকু ছড়িয়ে দিয়ে।

কার কথা বলব? কত আছে এরা। কত আছে কথা আশ্রমের মাটিতে ঘাসে। এত কালের এত কথা— কত তার বলা যায়? কতবার করে কত ঘটনা ঘটেছে এক-একটি স্থানে, কত কাহিনী— কত ছবি। একবার এসেই কি শেষ হয়ে যায় সব কথা বলা? বারে বারে আসতে হবে, ঘুরে ফিরে বলতে হবে।

জগৎ জায়গার মাপ জানে না। 'নন্দন'কে ঘিরে ছিল সেই জগৎ— ছিল মুক্তির জগৎ। সেই নন্দনের জগৎ আজ বিলুপ্ত।

অনেক গেল, অনেক এল। অনেক আছে, অনেক নেই।

সেই শিউলি গাছটি নেই। আদি গেস্ট হাউসের ভিতর দিয়ে সোজা এসে মাধবীবিতানের তলা দিয়ে এগিয়ে বাঁ দিকে শিশু-বিভাগে যেতে পথের ধারে ছিল গাছটি। শরতে তখনো লাল মাটি ঢেকে আছে বর্ষার সবুজ ঘাস, সেই ঘাসের উপরে গাছের তলা ছেয়ে পড়ে থাকত শিউলি ফুলগুলি অপার্থিব এক পবিত্রতা নিয়ে। সেখান দিয়ে যেতে প্রতিবার দাঁড়িয়ে পড়তাম। কী নিঃশেষ-নিবেদন।

দেখে দেখে চোখ জলে ভরে উঠত। মনে মনে ঘাসের উপরে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করতাম।

অনেক দিন পর— বহু বছর পর এলাম কোনার্কের পিছনে পশ্চিম দিকটায়। তখন থাকি মৃন্ময়ীতে, গুরুদেব কোনার্কে। রোজ বিকেলে একটু একটু হেঁটে বেড়ান গুরুদেব। কোনার্কের পিছনে এক সময়ে রথীদা মাটি কাটাচ্ছিলেন একটি পুকুরের আশায়। গর্ত হল গভীর, কিন্তু নাগাল পাওয়া গেল না জলের। সেই কাটা মাটি এ পারটা রেখেছে অনেকখানি উঁচু করে। গুরুদেব একদিন হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়ালেন সেখানে। শেষবেলার আলো ছড়িয়ে আছে পশ্চিম আকাশে। মৃন্ময়ীর বারান্দা হতে দেখছি— গুরুদেব দাঁড়িয়ে আছেন, অস্তরবির মুখোমুখি, পায়ের কাছে উন্মুক্ত দিগন্তের কালো রেখা। মনে হল যেন এক মহামানব দাঁড়িয়ে আছেন আশ্রমের ভূমিতে পা রেখে।

চলতে চলতে অনেকখানি চলে এসেছি। আর যাব না ফিরে। গেলেই তো আরো কত কথা জাগবে মনে।

জানি— সব কি আর এক রকম থাকে? থাকে না। কত নূতন আসে, কত পুরাতন চলে যায়। সবই মানি। তবু মনে হয়, শান্তিনিকেতন শান্তিনিকেতনই থাকবে— চিরকাল ধরে।

জীবনভর যে ভিড় ছিল সরে গেছে। আজ একা আমি জিৎভূমে। রাত্রিকাল। ঝড় উঠল। শুয়ে আছি। শুয়ে শুয়ে শুনছি হাওয়া ছুটল। এখানকার ঝড়ের ভাষা জানি। শুকনো হিজল পাতাগুলি থরথর করে উড়ে চলল। গলগলির সরু ডালগুলি ছিটকে পড়ল। শিমুলের কচি ডালটা ভাঙল বোধ হয়— হালকা গাছ। না, এ ঝড় থাকবে না বেশিক্ষণ। বৃষ্টি নামল। এবারে শুকনো পাতাগুলি ভিজে উঠল। ভিজেপাতা সাড়া তোলে না। চুপ হয়ে যায়।

—